বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাঙালি মুসলমান সংখ্যা: দুই

১২তম বর্ষ ২য় ও ৩য় যৌথ সংখ্যা এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশকাল
২০.০৯.২০১৮

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
কক্ষ: ৬০৪, ৬ষ্ঠ তলা, রোজভিউ প্লাজা, হাতিরপুল কাঁচাবাজার, ঢাকা ১২০৫ ।
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

কম্পোজ
সম্প্রাট খান লিয়ন

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৬ $ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এ ক

বাঙালি মুসলমান বলতে প্রধান বাংলাদেশের মুসলমানকে বোঝানো হয়ে থাকে। যদিও এই বাঙালি মুসলমানকে সংজ্ঞায়িত করা খুব সহজ কাজ নয়। ঐতিহাসিকদের গবেষণায় দেখা গেছে, বহিরাগত মুসলমান ও ধর্মান্তরিত বাঙালি– এই দুটি শ্রেণির সমন্বয়ে বাঙালি মুসলমান নামক জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদে বিচিত্র জাতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধশীল বর্ণবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা ছিল। হযরত মোহাম্মদ (স.) তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পরে আরবে প্রথম ইসলামের প্রচারকাজ শুরু করেন। এর পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তির বার্তা নিয়ে ইসলাম ধর্ম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগে থেকে বাংলাদেশে সভ্যতা ছিল এবং বিশেষ করে বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে সংঘাত বিদ্যমান ছিল। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য হিন্দু'র জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা। বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু দ্বারা নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা শোষণ-নির্যাতনের শিকার হত।

অষ্টম শতকে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের প্রথম যুগে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও তার আশপাশ এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আরবের বণিকেরা আসেন। এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময় তারা ব্যবসার পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজটিও করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে অনেক সুফ-সাধক যেমন শাহ সুলতান বলখী, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রূমী, মখদুম শাহদৌলা শহীদ, বাবা আদম শহীদ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রশত দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি রাজধানী লখনৌতে অধিকার করেন এবং তার সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময় বাঙালির মধ্যে ইসলাম ধর্ম সর্বপ্রথমে রাজনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ভিক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। তখন অগণিত মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

এভাবেই বাঙালি মুসলমানের যাত্রাকাল শুরু হয়েছিল। সেই শুরু থেকে আজ অব্দি এই জনগোষ্ঠীর নানা দিক তুলে ধরার জন্য 'হালখাতা' এ-সংখ্যার আয়োজন করল। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে 'হালখাতা'র উদ্যোগে 'বাঙালি মুসলমান' বিষয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় চলতি সংখ্যাটি 'বাঙালি মুসলমান: দুই' শিরোনামে প্রকাশিত হলো।

শ্রমলব্ধ এ-সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শারমীন নিশাত
সম্পাদক, হালখাতা
২০.০৯.২০১৮

সম্পাদকীয়: দুই

বর্তমান বিশ্বে 'মুসলমান' শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে সাদ্দাম হোসেন, বিন লাদেন প্রমুখ নামের পাশাপাশি একদল হিংস্র মানুষের প্রসঙ্গ সামনে এসে যায়। এ-অবস্থায় 'মুসলমান' শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। আজ বিশ্বমুসলমানের সামনে 'জঙ্গি' প্রসঙ্গ একটি বড় প্রশ্ন। যে প্রশ্নের মুখোমুখি বাঙালি মুসলমানেরাও।

এই প্রেক্ষিতে একদিকে 'জঙ্গি' খেতাব গায়ে যাতে না-লাগে, সেই সতর্কতা–অন্যদিকে এককেন্দ্রিক বিশ্ব ক্ষমতা-কাঠামোর দাদা ও বস্ সামলিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা– এই দ্বন্দ্ব দেশের শাসক-শ্রেণির সামনে এনে দিয়েছে বড় চ্যালেঞ্জ। একই চ্যালেঞ্জ এখানকার সাধারণ মানুষের সামনেও।

মানুষের মধ্যে ধর্মের শেকড় এত গভীরে প্রথিত যে, ধর্মের পরিচয়ে কোনো জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হওয়ার ঝুঁকি এড়ানোর কঠিন ব্যাপার। এরকম ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেও– 'হালখাতা'র এবারের সংখ্যাটি 'বাঙালি মুসলমান' বিষয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গবেষণার গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে, 'বাঙালি মুসলমান' ঠিক বাঙালি হিন্দুর মতো নয়। কেননা ইতিহাস লিখিত দলিলাদি প্রমাণ দেয়, কিছু কাল আগেও 'বাঙালি' আর 'হিন্দু' বলতে একই জনগোষ্ঠীকে বোঝাত; পক্ষান্তরে আজ

অব্দি প্রতিষ্ঠিত কোনো বাঙালি মুসলমানকে 'বাঙালি' হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। এরা বাঙালি বলতে প্রধানত উচ্চ বর্গের হিন্দুদেরই বুঝিয়েছেন। যদিও বাঙালি মুসলমান বাস্তবে বাঙালি বলতে প্রধানত উচ্চ বর্গের হিন্দুদেরই বুঝিয়েছেন। যদিও বাঙালি মুসলমান বাস্তবে 'বাঙালি' বিষয়টিকে ধারণ করে নিয়েছিল শুরু থেকেই।

সপ্তম শতকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর পর অষ্টম শতকে আরব বিশ্ব থেকে ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারক সূফিদের বাংলায় আগমন ঘটে। তাদের মাধ্যমে এ-অঞ্চলে প্রথম ইসলামের প্রচার-কাজ শুরু হয়। তখন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারাই বাঙালি মুসলমানের প্রথম পূর্বসূরি।

ইসলামের ওই প্রচার-প্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবে সর্বপ্রথম ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া থেকে লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করে নদীয়া দখল করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে। এরপর তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী লখনৌতি অধিকার করে।

এরপরই বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের প্রবর্তন ঘটে ফখরদ্দীন মোবারক শাহের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই স্বাধীন সুলতানী আমল স্থায়ী হয়েছিল প্রায় দুই শ বছর (১৩২৫-১৩৫০)। এরপর মুসলিম পাঠান রাজবংশ বাংলা শাসন করে আরও একশ বছর (১৫৩০-১৬২৫)। মোগল শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে। সে-শাসনব্যবস্থা অটুট ছিল একশ বছরের উপরে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর বাংলা ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে যায় দুইশ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) জন্য। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা হয় ১৯৪৭-এ। এরপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে এ-অঞ্চলে পুনরায় মুসলমানের শাসন ফিরে আসে। এ অধ্যায় অব্যাহত থাকে ১৯৭১ পর্যন্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ পর্যন্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১-এ জন্ম হয় বাংলাদেশের। বাঙালি মুসলমানের এটি একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র।

এই রাষ্টের জন্মের পেছনে রয়েছে সংগ্রামমুখর এক অতীত। ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধের অর্জন সেই বিশাল অতীতের বিশ্বস্ত শেরপা। মানবসম্পদ, সমুদ্রসম্পদ, কৃষি আর শিল্পে– সামনে অপেক্ষ করে আছে ভরপুর এক সম্ভাবনা। এতদসত্ত্বেও সার্বিক বিচারে বাঙালি মুসলমান শ্রেণি প্রশ্নে আজও সাধারণ হিন্দু-বৌদ্ধ'র কাতারেই। যে-শ্রেণিকরণ যে-পথ শোষণের সূতিকাগার– সে-পথ রহিত হবে এই সাধারণের পদভারেই!

উল্লেখ্য ইতোপূর্বে ‘হালখাতা’র উদ্যোগে ‘বাঙালি মুসলমান’ বিষয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় চলতি সংখ্যাটি ‘বাঙালি মুসলমান: দুই’ শিরোনামে প্রকাশিত হলো। সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শওকত হোসেন

প্রধান সম্পাদক, হালখাতা

৩০.০৯.২০১৮

সূচি

প্রবন্ধ

শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য

কাজী মোতাহার হোসেন ০৮

বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ১৬

প্রবন্ধ

বাঙালি মুসলমানের পরিচয় অন্বেষণ:
ইতিহাস-রচনার (পরি) প্রেক্ষিতে

অসীম রায় ২৫

প্রবন্ধ

বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ৮২

বাঙালি মুসলমান: ইতিবৃত্তের উত্তর প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ৮৭

বাঙালি মুসলমান: পর্যাবৃত্তের ইতিবৃত্ত
মো হা ম্ম দ সি দ্দি কু র র হ মা ন ৯০
বাঙালি মুসলমান: আত্মপরিচয়ের সন্ধানে
হো সে ন আ লী (মা ও লা না) ১০২

প্র ব ন্ধ
বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উৎস ও ক্রমবিকাশ (প্রাথমিক পর্ব)
গৌ ত ম রা য় ১২০
বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উৎস ও ক্রমবিকাশ (উত্তরপর্বের খ-চিত্র)
গৌ ত ম রা য় ১৪১

প্র ব ন্ধ
মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
ব দ রু দ্দী ন উ ম র ১৭১

প্র ব ন্ধ
উনিশ শতকের মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধারা
সা লা হ্ উ দ্দী ন আ হ্ ম দ ১৭৪
বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ
আ বু ম হা মে দ হ বি বু ল্লা হ ১৮৯

ব ক্তৃ তা
ঢাকা মুসলিম হলে অভিভাষণ
র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র ১৯৭
মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা
র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র ২০১

প্র ব ন্ধ
বাঙালী মুসলমান: শ্রেণীসমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতা
নূ র মো হা ম্ম দ ২০৪

প্র ব ন্ধ
বাঙালি মুসলমানের ফাঁড়া
স লি মু ল্লা হ খা ন ২৩৪

প্র ব ন্ধ
বাংলার মুসলমান
এ. এফ. এম. আ ব্দু ল জ লি ল ২৪৮

নি ব ন্ধ
বাঙালি মুসলমানের নামায়ন
ই ক বা ল কা গ জী ২৭০
বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ
সৈ য় দ আ বু ল ম ক সু দ ২৮৫

নি ব ন্ধ
বাঙালি মুসলমান: কিছু কথা
আ ব দু ল আ উ য়া ল ২৯২
তৎকালীন পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের রোকেয়া
আজকের নারী-আদর্শের সৈনিক
ফে র দৌ সী সু ল তা না ২৯৬

ক বি তা
বেগম রোকেয়া
কা ম রু ল হা সা ন সো হা গ ৩১০

শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য

কাজী মোতাহার হোসেন

প্রত্যেক সমাজে শিক্ষিতেরা চালক, অশিক্ষিতেরা চালিত। এজন্য শিক্ষিতদের দায়িত্ব অপরিসীম। বর্তমানকে সম্যকরূপে বুঝিয়া লইয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কর্ম ও চিন্তাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা তাঁহাদেরই কাজ।

কিন্তু বর্তমানে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝায়, বাঙালি সমাজের উপর তাহাদের প্রভাব কতটুকু, ভাবিয়া দেখা দরকার। শিক্ষিত লোক বলিতে প্রধানত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা তদপেক্ষা অধিক শিক্ষিত লোককেই লক্ষ করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ রাজপুরুষ, কেহ কাউন্সিলের মেম্বর, কেহ শিক্ষক, কেহ ছাত্র এবং কেহ ব্যবসায়ী।

রাজপুরুষের প্রভাব প্রায় সর্বশ্রেণির উপর। ইহারা ইচ্ছা করিলে অনেক হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ইহারা অর্থবল ও ক্ষমতাবলে সাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইয়া থাকেন। এই সম্মানের মূলে হয়তো সম্মানকারীর কিছু ভয়ের ভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে; কিন্তু সে যাহাই হোক, অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেও দেশের ও সমাজের অনেক কাজ হয়। স্কুল, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, সমাজ-হিতকর কার্যে সহানুভূতি ও উৎসাহদান– এই সমস্ত কাজ প্রাণের সহিত করিতে পারিলে গভর্নমেন্টের প্রতি লোকের আস্থা ও কৃতজ্ঞতা অধিক হয়। রাজপুরুষগণ যদি নিজেদিগকে জনসাধারণের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র জীব বলিয়া মনে না করিয়া বরং সকলের সুখ-দুঃখের অংশভাগী বলিয়া মনে করেন, তবেই প্রকৃত কার্য হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, জনসাধারণের সুখ-দুঃখে রাজপুরুষের কী আসিয়া যায়? কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার উপর তাহাদের রাজস্বপ্রদানের ক্ষমতা নির্ভর করে, ইহার উপর রাজপুরুষদের বেতনও নির্ভর করে; তাহা ছাড়া দুর্বলের সুখ-দুঃখের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পদদলিত ও শোষণ করিয়া কিছু দিন

চালানো যাইতে পারে, কিন্তু চিরকাল চলে না– তাহাতে ক্রমশ এরূপ অশান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহার সমাধান করা পরে মুশকিল হইয়া দাঁড়ায়।

কাউন্সিলের মেম্বরদের উপর আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রনীতি কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। দেশের সাধারণ লোকে এ সমস্তের অধিক খবর রাখে না। কিন্তু সাধারণের অলক্ষিতে হইলেও অতি নিশ্চিতরূপে দেশের ধনাগম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ইহার ক্রিয়া হয়। ইহাদের প্রতিনিধি হইয়া মেম্বরগণ কাউন্সিলে প্রবেশ করেন, তাহাদের প্রকৃত মতামত জ্ঞাপন করা বা সর্বদা তাহাদের সুবিধার দিকে লক্ষ রাখিয়া কাজ করা উচিত। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এ যাবৎ অধিকাংশ নির্বাচিত মেম্বরই ক্ষুদ্র গ-স্বার্থ ও আত্মস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করিতেছেন। আর একটি কথা মনে হয়– সচরাচর দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলেরা কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে আগ্রহ দেখান না; বরং মধ্যমরকম জ্ঞান-বুদ্ধিবিশিষ্ট ধনী, জমিদার বা উৎসাহী আইনজীবীরাই আপন আপন প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিলের পদপ্রার্থী হন। দেশের লোকের জ্ঞান ও চরিত্রবল বৃদ্ধি না হইলে যোগ্যতর লোকের পক্ষে ভোটে জিতিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করা এবং দেশের আইন-প্রণয়ন ও রাষ্ট্র-বাণিজ্যনীতি পরিচালনে অংশগ্রহণ করা সুকঠিন হইবে বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর দেশের জ্ঞানচর্চা নির্ভর করে। পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় ভাবজগৎ ও বস্তুজগতের কতক কতক সমস্যা অবশ্যই মনে উদিত হয়। কিন্তু তাহার বাহিরেও যাহাতে অত্যন্ত নিকটের জিনিস অর্থাৎ আপন পরিবেষ্টনের প্রতি মুক্তদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবার এবং যুগোপযোগী সমস্যা সমাধানের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা জন্মে, ছাত্রদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। এজন্য কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া মতামত প্রকাশ করিবার এবং অন্যের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ থাকা আবশ্যক। সকল সমাজই স্বভাবতই পরিবর্তন-বিরোধী। এজন্য মতামত আলোচনা করিবার সময় বাধাবিপত্তি আসিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া অসহিষ্ণু হইলে, বা অধিকাংশকে এড়াইয়া স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিলে যে খুব বেশি লাভ হইবে এরূপ মনে হয় না। নূতন বা উন্নত আদর্শ প্রচার করা বহু লোকের প্রচুর পরিশ্রমসাপেক্ষ। সমাজকে বুঝিতে দিতে হইবে যে সংস্কারক সমাজের শত্রু নহে, বরং হিতৈষী বন্ধু; আরও বুঝিতে দিতে হইবে যে গণহৃদয়ের অন্তস্তলের কোনো গভীর চিরন্তন সত্য আদর্শের বিরোধী কোনো কথাই বলা হইতেছে না। যে-আদর্শের মূল সুদূর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত, সেইরূপ কোনো আদর্শকেই যুগোপযোগী ভাষায় তর্জমা করিয়া লইতে বলা হইতেছে; তাই উহা নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সাধারণ লোক আদর্শকে যতটা ভয় করে ততটা ভয় বোধ হয় অত্যাচারকেও করে না। তাহার কারণ, অত্যাচারের ফলাফল শীঘ্র চোখে পড়ে; কিন্তু বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, যে-সব আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া লোকে নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতেছে,

হঠাৎ সেখানে নাড়া খাইলে তাহার ফলাফল কোথায়া গিয়া দাঁড়াইবে, লোকে সহসা ধারণা করিতে পারে না বলিয়া অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হয়। তাই প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং সহানুভূতি-সম্পন্ন ভাবে দরদি বন্ধুর মতো সাধারণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে। অত্যন্ত মহৎ হইয়া অবুঝের অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া দীনভাবে আদর্শের সেবা করিতে হইবে। যত বড় বড় মহাপুরুষ পৃথিবীর নূতন আদর্শের প্রবর্তন করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই নির্বিঘ্নে উহা করিতে পারেন নাই। কেহ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছেন, কেহ লোষ্ট্রাঘাতে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, কেহ স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, কেহ কারাবরণ করিয়াছেন, কেহ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইরূপে কত ভাবে যে তাঁহারা নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান যুগেও এই নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থানে আর এক শ্রেণির শিক্ষিত মুসলমানের কথা উল্লেখ করিয়া রাখি। ইঁহারা ধর্ম-ভাষায় শিক্ষিত মোল্লা-মৌলভি ও প্রচারক সম্প্রদায়। ধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে এখনও জনসাধারণের চিত্তে ইংরাজি-শিক্ষিতদের অপেক্ষা ইঁহাদের প্রভাব অধিক। যাঁহাদের প্রভাব অধিক তাঁহাদের অবশ্য দায়িত্বও অধিক। তাঁহারা নায়েবে রসুল বা প্রেরিত পুরুষের প্রতিনিধি হিশাবে সাধারণ লোকের শিক্ষক। জীবনের উদ্দেশ্য কী, জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় কী, আল্লার সহিত আমাদের কী সম্পর্ক, ধর্মবিধির তাৎপর্য কী, এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা লোকের প্রশ্ন ও সন্দেহের মীমাংসা করিবেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিতে যে মুক্তবুদ্ধি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বর্তমান জগতের সংঘটন সমূহের কার্যকারণ সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক, তাহা অনেকেরই নাই। যে সব ব্যাপার হুবহু কেতাবের সঙ্গে মেলে না তাহা লইয়া কারবার করিতে হইলে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আবশ্যক, চিরন্তন সত্য ও আদর্শ হইতে নূতন তথ্য বাহির করিয়া বর্তমান সমস্যায় তাহার প্রয়োগ করিতে হইলে যে মৌলিকতার আবশ্যক, সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিকতার খুবই অভাব দেখা যাইতেছে। পুরাতন মাদ্রাসা-পদ্ধতির শিক্ষা অপেক্ষা বর্তমান ইংরাজি-পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ অধিক হয়। এজন্য কালের ভাবধারার গতি উপলব্ধি করিয়া যাহাতে কোরান- হাদিসের অমূল্য সম্পদ বর্তমানের প্রত্যেক সমস্যায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে চিন্তা করা শিক্ষিত প্রচারক ও মৌলভি সাহেবদের উচিত। এজন্য যদি ইংরাজি-পদ্ধতিতে শিক্ষিত যোগ্য লোকের সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহাও অকুণ্ঠিতভাবে করিতে হইবে।

বর্তমান মুসলমান-সমাজ অধঃপতনের চরম সীমা হইতে ফিরিয়া সবেমাত্র উন্নতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ করিতেছে। এই যুগসন্ধির সময় উন্নতমনা, চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্থিরলক্ষ্য লোকের আবির্ভাব হওয়া চাই।

নতুবা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভপর নহে। প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজে যখন প্রথম শিক্ষার আলো প্রবেশ করিয়াছিল, তখন উক্ত সমাজ আপন মূলধন খতাইয়া জগতের সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করিয়া লইতে ব্যগ্র হইয়াছিল। সেই উৎসাহের স্রোতে ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক প্রথার সম্বন্ধে প্রশ্নমূলক বিবিধ আন্দোলন উপস্থিত হইয়া সমাজের বুদ্ধিকে অনেকটা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। আজ পর্যন্ত সেই আন্দোলনই বোধ হয় বর্তমান হিন্দু-সমাজের সর্বাপেক্ষা শুভকর আন্দোলন হইয়া রহিয়াছে। বর্তমানে মুসলমান-সমাজে প্রায় সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে শুভ সম্ভাবনাই সূচিত হইতেছে। এসময় তরুণ সম্প্রদায়ই সমাজের আশা-ভরসার স্থল। ইহাদিগকে পর্বতের মতো উচ্চভাবাপন্ন, সহনশীল ও ক্ষমতাশীল হইতে হইবে।

এক প্রকার মত আছে, 'সকলেই আপন আপন অবস্থাকে যথাসম্ভব উন্নত করিলে আর পৃথক করিয়া সমাজের ভাবনা ভাবিতে হইবে না—আপনা হইতেই সমাজের উন্নতি হইবে।' এ কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু কার্যত ও আদর্শগতভাবে ইহা অতিশয় ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, সমাজে ১০/১২ হাজার স্বার্থপর ধনীলোকের সৃষ্টি হইলেই যে সমাজের উন্নতি হইবে, ইহা কোনো কথাই নয়। নিজের স্বার্থ দেখিতে হইবে বইকি, কিন্তু তাহা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন তাহাতে সমগ্র সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়। নানা বৈষম্য ও বিরোধের ভিতরেও সমাজের গতির মধ্যে কিছু একাভিমুখিত্ব থাকা চাই; নতুবা এলোমেলো স্বার্থের সংঘাতে সমাজের অগ্রগমন আর হইয়া উঠিবে না। অতএব বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আত্ম-স্বার্থত্যাগের শিক্ষা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সেবাবৃত্তিই মহানুভবতা ও আদর্শ চরিত্রের নিদান।

আজকাল সমাজের আর্থিক ও মানসিক দৈন্য এত অধিক, যে এক এক করিয়া নামোল্লেখ করাই অসম্ভব। অন্ততপক্ষে যে সমস্ত জিনিস না থাকিলে জীবন-ধারণ করা যায় না, সমাজের অধিকাংশ লোকের, বিশেষত কৃষক সমাজের তাহারই অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিকার করিতে হইলে, কৃষকদের ক্ষমতা কোথায়, এবং তাহাদের অধিকারের কতটুকু তাহারা পাইয়াছে এবং তাহাদের প্রকৃত অভাবই বা কী, এই সকল বিষয়ে জ্ঞানদান করা কর্তব্য; তাহার ফলে আত্মচেতনা জাগিলে হয়তো উহারা অধিকতর দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে পারিবে। এজন্য প্রচার দ্বারা যথেষ্ট জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ প্রচারকার্যে শিক্ষক ও ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চাকরিজীবী, ব্যবসাজীবী, সকলেই সাহায্য করিতে পারেন।

জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যতদিন না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত পুস্তকের শিক্ষা ছাড়াও নানা বিষয়ে যে সমস্ত মূলসূত্র সামান্য বুদ্ধিমান লোকে বুঝিতে পারে, সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়াই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু জাগাইয়া রাখিবার

চেষ্টা করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীতে পাটের চাহিদা কী পরিমাণ, চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অধিক হইলে মূল্য কীরূপ হইবে, চাহিদা মাফিক পাট উৎপাদন করিতে হইলে প্রতি ১০ বিঘা জমির কত বিঘা জমিতে পাটের চাষ করা উচিত এবং তাহা হইলে পাটের দর মণ প্রতি কত হইতে পারে, কী কী কারণে চাষিরা উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে, মহাজনের দাদন প্রণালীর কর্জ টাকার সুদ জোগাইতে জোগাইতে চাষিরা কীরূপে সর্বস্বান্ত হইতেছে এবং এই সংকটময় অবস্থা হইতে কো-অপারেটিভ প্রণালী বা অন্য কোনো উপায়ে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে কিনা, অনর্থক বাজে খরচ বা মামলা-মকদ্দমা করিয়া ঘরের পয়সা পরের হাতে দিয়া পরের নিকট করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ কিনা, এই সমস্ত বিষয়, এবং এইরূপ আরও অনেক বিষয় বোধহয় যে কোনো শিক্ষিত সমাজসেবক আন্তরিকতা সহকারে পুনঃপুনঃ প্রচার করিলে দেশের বর্ণমালাজ্ঞানশূন্য সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে; অন্তত পক্ষে তাহাদের কয়েকজন মাতব্বরকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে। মোটের উপর, উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কোনো ভুঁইফোড় সমাজই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। উন্নতি করিতে হইলে সবাইকে যথাসম্ভব টানিয়া তুলিয়া সকলে মিলিয়া উপরে উঠিতে হইবে। ময়ূর সাজিলে কাকের কাকত্ব দূরীভূত হইবে না, এই কথাটা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাই; অতএব শিক্ষিত লোকদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

শিক্ষিত সমাজে একদল লোক দেখা যায়, যাহারা অশিক্ষিত বিশ্বাস-পরায়ণ লোককে আপন-আপন স্বার্থসিদ্ধির কামধেনুরূপে ব্যবহার করেন, অথচ অশিক্ষিত দরিদ্রেরা যখন তাহাদের প্ররোচনায় বিপদের মুখে পড়িয়া হা-হুতাশ করিতে থাকে, তখন শিক্ষিত উপদেশকদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। আগের আমলে জমিদারের পক্ষ হইয়া লাঠিয়ালেরা লাঠি ঘুরাইয়া সম্পত্তি রক্ষা করিত, কিন্তু জমিদারও যথাসম্ভব ওই সমস্ত লাঠিয়াল প্রজার মা-বাপ ছিলেন। কিন্তু এখন যে-সব বুদ্ধিমান নেতার উপদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, তাঁহারা কার্যকালে অবসর বুঝিয়া সরিয়া পড়েন; মারা যাওয়ার বেলায় রামা-শ্যামা করিম-রহিমের দলই মারা যায়। এই সমস্ত ব্যাপার যাহাতে না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য ছাত্রসমাজ ও অন্যান্য সেবকসংঘ প্রচার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির আদর্শ লোকের সম্মুখে ধরিতে পারেন। মানুষের হৃদয়ের গোপন কোণে অতি যত্নে লালিত কোনো ভাবকে মন্দ দিকে উস্‌কাইয়া দিয়া প্রলয়কা- ঘটানো সহজ; কিন্তু ওই সমস্ত ভাবকেই যুগের শ্রেষ্ঠ ধারণা ও কল্পনা দ্বারা মহীয়ান করিয়া মহা-মানবতার দিকে লোকের মনকে প্রবাহিত করা ততটা সহজ নহে। কিন্তু ইহাই তরুণের সাধনা; ইহা না করিলে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে হতভাগ্য সমাজের উদ্ধার নাই। এর জন্য উৎসাহী আদর্শাশ্রয়ী কর্মী-পুরুষ চাই।

দরিদ্রেরাই সমাজের অধিকাংশ। এ জন্য ইহাদের কল্যাণেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ। ইহাদের মধ্যে অর্থাগম, সৎচিন্তার উদয় ও শিক্ষার প্রসার হইলে প্রকৃত আশার কথা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, নীতিহীন শিক্ষায় লোককে স্বার্থপর ও আরামপ্রিয় করিতেছে। যাঁহারা অধিক-সংখ্যক নিরক্ষর লোক খাটাইয়া কারবার করেন, তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই, অশিক্ষিত গরিব লোকেরাই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ; তাহাদের উপর নির্ভর করা করা যায়; কিন্তু শিক্ষিত বাবু বা মিয়াসাহেবদের উপর কোনো কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই; তাহারা নানারূপ ফন্দি খাটাইয়া ফাঁকি দিবে ও চুরি করিবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে এই সমস্ত শিক্ষিত লোক একেবারে অনুপযুক্ত। বিশ্বাসের উপরেই কারবার চলে; সততা ও বিশ্বাস হারাইলে বাঙালির আর্থিক উৎকর্ষ সুদূরপরাহত। এজন্য শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের কর্তব্য হইতেছে দৃঢ়চরিত্র হওয়া; দৃঢ়চরিত্র হইলেই লোকের বিশ্বাস অর্জন করা সহজ হইবে। তখন সমবায় প্রণালীতে কারবার করিয়া বিশ্বের প্রতিযোগিতায় নিজের একটু স্থান করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। সৎ আদর্শ যদি ছাত্রাবস্থায়ই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের চিত্তে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাঙালির ব্যাংক, কাপড়ের কল, চিনির কল, ইনসিওর অফিস, চায়ের বাগান এবং লাভের সম্ভাবনাপূর্ণ নানাপ্রকার কর্ম-কল্পনা (speculative schemes) এখনকার চেয়ে কম ফেল পড়িবে। ফলে বাঙালিও অধিক-সংখ্যক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া গৌরবের আসনের অধিকারী হইবে। এই স্থলে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে শিক্ষিত লোকের শুধু চাকরির প্রত্যাশায় থাকিলে চলিবে না, চাকরির সংখ্যা সীমাবদ্ধ। প্রকৃত উন্নতি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাবাণিজ্যের উৎকর্ষেই হইবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানেরা এ বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। একবার শিক্ষা-বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইয়া তাহারা প্রায় ৫০/৬০ বৎসর পিছনে পড়িয়া গিয়াছে, আবার যাহাতে শিল্পবাণিজ্যাদি সম্বন্ধে অধিক পিছাইয়া না পড়ে, এখন হইতে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতি হইলে তবেই বাংলা প্রদেশের উন্নতি হইতে পারিবে। অতএব যাহাতে সামাজিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া মূল সূত্র ধরিয়া বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে মিলন সম্ভবপর হয়, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের কর্তব্য। এই কার্য সুসাধ্য করিতে হইলে উভয় জাতিরই কর্তব্য, শুধু স্বধর্ম নয় প্রতিবেশীর ধর্মেরও মূল কথা কী এবং যে সমস্ত বিষয় লইয়া আমরা বিরোধ করিয়া মরি, তাহা প্রকৃতই ধর্ম ও সমাজবন্ধনের অচ্ছেদ্য অংশ কিনা এ সব বিষয় ভালোরূপ জানিবার চেষ্টা করা। এই চেষ্টা করিতে হইলে সংস্কারমুক্তভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা ও চিন্তার ফলাফল প্রকাশ করিবার সাহস থাকা চাই। এক কথায়, যাহারা শিক্ষিত লোক– নেতৃত্বে যাহাদের ন্যায়ত অধিকার– তাহাদের দৃঢ়-চরিত্র হওয়া আবশ্যক। সচ্চরিত্র শিক্ষিত

লোকের সদ্‌ভাবনা ও সৎক্রিয়ার ফলেই সমাজ উন্নতি লাভ করিবে। নিরাশ হইলে চলিবে না– আমাদের বিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষার গোড়া পত্তন করিতে হইবে। মুসলমান ও হিন্দুর জন্য পৃথক পৃথক স্কুল করিলে চলিবে না। ধর্ম শিক্ষা (অর্থাৎ ধর্মের অনুষ্ঠান অংশ বাদ দিয়া উহার ইতিহাস ও আদর্শগত অংশ) স্কুল হইতে বর্জন করিলে চলিবে না, বরং হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক ছাত্র হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কালচার সম্বন্ধে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, স্কুলের শিক্ষাতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষানীতিজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান সকলেরই এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া পাঠ্য নির্দেশ করা উচিত। পাঠ্য নির্দিষ্ট হইলে পঠনীয় পুস্তকের অভাব শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। পুরাতন রত্নরাজি উদ্‌ঘাটিত করিয়া নূতনভাবে মাতৃভাষার সাহায্যে তাহা বর্তমানের উপযোগী করিয়া জনসমাজকে উপহার দেওয়া বর্তমান শিক্ষিত মুসলমানের একটি অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কার্যে অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের চেষ্টা না করিয়া যথাযথভাবে স্বধর্ম ও স্বসমাজের শ্রেষ্ঠাংশটুকু লোকের সম্মুখে ধরাই প্রকৃত কাজ।

চারিদিকে অভাব যখন প্রচ-, তখনও নিত্য-অভাবের অতিরিক্ত কিছু প্রাণে চায়। সেটুকু না হইলে মানুষের জীবন অতিশয় দুঃসহ হইয়া পড়ে। যে দীনভিখারি, তাহারও একটু অবসর চাই এবং সংসারের দুঃখজ্বালার কথা ক্ষণেকের জন্যও চাপা পড়িতে পারে, এমন কোনো চিন্তা চাই। যাঁহারা দার্শনিক তাঁহাদের পক্ষে হয়তো সংসারকে উপেক্ষা করিয়া আপন ধ্যানে আপনি মগ্ন থাকা কিছুই ক্লেশকর নহে। কিন্তু মানসিক বৃত্তি ও ভাবপ্রবণতা সকলের একরূপ নহে; এজন্য কিছু স্থূলতর আনন্দেরও প্রয়োজন। কৃষকের জীবনে এই আনন্দ– হাডু-ডু-ডু খেলা, পর্ব বুঝিয়া গাঁতা করিয়া মাছ ধরিতে যাওয়া, ধর্মগ্রন্থ ও পুঁথি পাঠ করা, মৌলুদ শরিফ এবং সাময়িক যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতিতে যোগদান করা, বৈঠকি, ভাটিয়ালি, জারি, শারি প্রভৃতি গান করা এবং উৎসবাদি উপলক্ষে একটা আমোদ-আহলাদ করা– অত্যন্ত আবশ্যক। এইগুলি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে, উহাদের তৃষিত আত্মাকে একেবারে শুকাইয়া মারা হয়। যাত্রা-থিয়েটার, লণ্ঠন-লেকচার, বায়স্কোপ প্রভৃতির সাহায্যে যথেষ্ট শিক্ষাদান করিতে পারা যায়। আমাদের অশিক্ষিত কৃষক-সমাজ, এমনকি শিক্ষিত সমাজেরও অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম-ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবকাহিনী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। মনে হয়, ওলি-পয়গম্বর এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পুরুষদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়া যাত্রা-থিয়েটার ও বায়াস্কোপের সাহায্যে জ্ঞান প্রচার করা যাইতে পারে। এ বিষয় শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের বিশেষ করিয়া অবহিত হওয়ার সময় আসিয়াছে।

শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত ধনী ও পদস্থ মুসলমান-সমাজেও সুরুচিসম্মত আমোদপ্রমোদ এবং আলাপ-আলোচনার শোচনীয় অভাব প্রায়ই লক্ষ করা যায়; যাহাকে আমরা কালচার বলি, মধ্যম-রকম হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা ওই শ্রেণির

মুসলমান-সমাজে তাহার নিম্নতর আদর্শ দেখিতে পাই। ইহার কারণ হয়তো এই যে মুসলমান-জনসাধারণ অনেকদিন হইতে প্রাচীন কালচার প্রায় খোওয়াইয়া বসিয়াছে, এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহার সহিত নূতন অবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেছে না; তাছাড়া, মাত্র অল্পদিন হইতে শিক্ষালাভ শুরু করিয়াছে বলিয়া বাল্যকালে গৃহে একটা সভ্যতার আবহাওয়ার বর্ধিত হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সে যাহাই হউক, চিত্তের এই চাহিদা ভুলিলে চলিবে না। প্রায়ই মুসলমান-সমাজে (অবশ্য, হিন্দু-সমাজেরও কোথাও কোথাও) বড় বড় উকিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, প্রফেসর, জমিদার প্রভৃতির সাহচর্যে আসিলেও সচরাচর অতি অকিঞ্চিৎকর পরনিন্দা এবং সাধারণ গল্পগুজবের অধিক আর কোনো আলোচনাই শোনা যায় না। সাহিত্য, কলা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল; সাধারণভাবে দেশের মঙ্গল-চিন্তামূলক আলোচনাও কমই শুনিতে পাওয়া যায়, আর যাহাও শুনা যায় তাহাও অধিকাংশ স্থলে সংকীর্ণ মনেবৃত্তির পরিচায়ক—সমগ্রভাবে বৃহত্তর সমস্যার সমাধান-চিন্তা খুব কম কম লোকেই করিয়া থাকেন। অবশ্য হিন্দু-সমাজও যে এ বিষয়ে মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক সংস্কারমুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাহা নয়। কিন্তু এরূপ অবস্থা দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক। অশিক্ষিতের মানসিক দৈন্য স্বাভাবিক, কিন্তু শিক্ষিত সমাজেও যদি তাহা দেখা যায় তবে বড়ই আক্ষেপের কথা। হয়তো মুসলমান-সমাজ এখন আপন পুত্র-পরিজনের তাল সামলাইতেই এত অধিক বিব্রত যে উচ্চ চাকরি বা ব্যবসায়ে একটু পসার প্রতিপত্তি হইলেও পারিপার্শ্বিকের টানে পড়িয়া তাহার চিন্তা অথই পানিতে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। হয়তো একপুরুষ পরেই শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার আর একটু স্থৈর্য হইবে। তথাপি বর্তমানে আমাদের সাহিত্য, আর্ট, সংগীত, সুরুচিপূর্ণ আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে অভাববোধকে মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিয়া তাহার সমাধানচেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষত ছাত্রসমাজ, যাহারা কয়েক বৎসর পরে দেশের নেতৃস্থানীয় হইবে, এখন হইতেই তাহাদের মধ্যে জ্ঞানচর্চা, বিদ্যাবত্তা ও রুচিসৌষ্ঠবের অনুশীলন করা আবশ্যক। বর্তমান ছাত্রসমাজ সেবাধর্মী, কর্তব্যনিষ্ঠা, চরিত্রবান, সহিষ্ণু এবং সুষ্ঠুজীবন যাপনে অনুরাগী হইলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশার কোনো কারণ থাকিবে না।

[লেখক: ১৮৯৭-১৯৮১। সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী।]

বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কী, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া দুরূহ। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও কলা, সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাপ্রণালী এমনকি জীবনাভ্যাস ও জীবনানুশীলনের বাহন যে শিল্প, এসবের মধ্য দিয়েই বাঙালির একটি বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় মেলে যার সঙ্গে বহির্বঙ্গের পার্থক্য তর্ক করে বোঝাতে হয় না। বাঙালি মাত্র– কি হিন্দু কি মুসলমান, ন্যায়তই হোক কি অন্যায়তই হোক, বহির্বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অনাত্মীয়তা বোধ করে। রাজনীতি ও ইতিহাসের পক্ষে এটাই চরম কথা। বাঙালির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে উত্তর-ভারতীয় পরিবেশ কল্যাণকর নয়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য, এবং দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন না হলে এখনও পথে-ঘাটে এর প্রমাণ দেখা যায়।

কাজেই বাঙলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে কোনও বাঙালি ভিন্নমত হতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিভাবে এই অধিকার কার্যকরী ও সফল হবে– অর্থাৎ কোন্ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও সুযোগ আছে, এ বিষয়ে মতান্তর থাকা সম্ভব। এর আলোচনা যে একেবারেই হয়নি তা নয়, তবে তার মধ্যে শ্লোগান-এরই প্রাদুর্ভাব, বাস্তব বিশ্লেষণের পরিচয় অত্যন্ত কম। রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠাই তো চরম উদ্দেশ্য নয়– সমগ্র ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনকে প্রয়োজনমতো সংস্কৃত ও উন্নত করার উপায় মাত্র এবং যাকে সংস্কৃতি বলি তার সুষ্ঠু বিকাশেই এ আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র সার্থকতা।

যে কোনও দেশের বা সমাজের সাংস্কৃতিক সমাজীয়তা নির্দিষ্ট হয় তিনটি জিনিস দিয়ে– ভাষা, ঐতিহাসিক ট্রেডিশন ও ধর্ম। এর মধ্যে ভাষাই প্রধান; ইতিহাস ও ধর্মে শ্রেণি, সম্প্রদায় বা স্থানগত বৈচিত্র্য ও এমনকি সুপ্ত (latent) বৈষম্যও থাকতে পারে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে জাতিগত (racial) উৎপত্তি, যার প্রভাব উপরে উক্ত কোনোটিই মুছে ফেলতে পারে না।

ধর্ম আপাতত বাদ দিলে ভাষা ও জাতিগত সম্বন্ধ (racial kinship) অনুসারে বাঙলার সাংস্কৃতিক সমজাতিত্ব (homogeniety) নিসঃন্দেহ! যাঁরা বাঙালি মুসলমানের রক্তে তুর্কি-ইরানি প্রাধান্য দেখবার পক্ষপাতী তাঁরা অংশ দিয়ে সমগ্রের

বিচার করেন। মুগলদের সময় থেকেই বাঙলায় মুসলমান ইতিহাস আরম্ভ হয়নি। এখানকার মুসলমান অধিকাংশই ঔপনিবেশিক বংশোদ্ভূত একথা সত্যি হলে ইসলামের প্রচারণা এদেশে একেবারেই কার্যকরী হয়নি মানতে হয়; অথচ বাঙলায় অগণিত সুফি ও প্রচারকের আত্ম-সাম্প্রদায়িক শ্রদ্ধা অর্জন থেকে এর বিপরীত সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতাগত ভিন্ন-ভাষী মুসলমানের এদেশীয় ভাষা গ্রহণ, ও এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ, বিস্ময়করই নয় শুধু, অসম্ভবও মনে হয়, যখন দেখি উত্তর-ভারতীয় উৎপত্তি যাঁদের ইতিহাসপ্রমাণিত, সেই সব অভিজাত কথিত মুসলমানদের মধ্যে এখনও বাংলার প্রচলন সহজ হতে পারেনি। বাংলার যে অংশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য, গঙ্গার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে, সেখানে ফার্সি বা উর্দু কোনও কালে যে ব্যাপকভাবে কথ্যভাষা ছিল তার লক্ষণ চোখে পড়ে না– উনিশ শতকের ওহাবি সংস্কারের ফলে পূর্ব বাঙলার গ্রামে গ্রামে ধর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালিত্ব বর্জন ও উত্তর-ভারতের সঙ্গে ভাষা ও আন্দোলনগত যোগ স্থাপনের যে প্রচেষ্টা চলেছিল তার সাময়িক সফলতা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের ভাষার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু, এবং অমুসলমান পরিবেশ বাস করে, সেখানে ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে উত্তর-ভারতীয় উপাদান এখনও সহজ দৃষ্ট হয়ে আছে।

ধর্মকে যদি ব্যক্তিগত বিশ্বাস না বলে অপর বিরোধী জীবনাদর্শ মনে করি তাহলে বাঙলায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য আছে একথা মানতেই হয়। ইতিহাসের আবহও সে কারণে স্বতন্ত্র ধারা। বাঙলার ইতিহাসে মুসলমানি আমলকে দেশীয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক অধ্যায় মনে না করে, প্রভাবলেশহীন বহিরাগত প্রসঙ্গ বলে যাঁরা মনে করেন, হিন্দুর মধ্যে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আরবেতিহাসে 'আইয়ামে জাহেলিয়াতে'র মতন, প্রাক-মুসলিম বাঙলাকে মুসলমানেরা স্বীয় ইতিহাসের একীতভূত (integral) অংশ মনে করে না। ফলে বাঙালির ইতিহাসে পরস্পরবিরোধী ঝোঁক (emphasis) ও দ্বিধাগ্রস্ত ট্রেডিশনের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু লিখিত বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে তাই হিন্দুরই সামাজিক ইতিহাস; বাঙালির স্বাধীনতা বা বাঙালির বীরত্ব মানে বাঙালি হিন্দুরই স্বাধীনতা ও বীরত্ব। কালাপাহাড়ের নিঃসন্দেহ বাঙালিত্ব সত্ত্বেও তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের জন্যই বাঙলার ইতিহাসে তাঁর বীরত্ব ও সমর-কৌশল আসুরিক বর্বরতা রূপেই চিত্রিত হয়। অথচ নৃশংসতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় যার তুলনা মেলা ভার, যাঁর বীরত্ব কাপুরুষের অতর্কিত আক্রমণেরই নামান্তর এবং সম্মুখসমরে একাধিকবার বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেও আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করেন নাই সেই প্রতাপাদিত্য বাঙালির বীরত্ব ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার আদর্শ। সীতারাম রায়ও তাই। অথচ বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁরা আজীবন প্রান্তরে প্রান্তরে মোগলদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, যাঁরা মুহূর্তের জন্যও বশ্যতা স্বীকার করেননি এবং যাঁরা সব হারিয়েও স্ত্রী-কন্যাকে আগুনে সমর্পণ করে রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করেছেন তবু বশ্যতা স্বীকার করেননি, বাঙলার সেই মুসলমান পাঠান সামন্তদের উল্লেখও বাঙালি ইতিহাসালোচনায় হয় না।

ধর্মের জন্য যত-না হোক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির এই একদেশদর্শিতার জন্যই বাঙালির সংস্কৃতি সমতা লাভ করতে পারেনি, কারণ মুসলমানদের বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিতে এমন কোনও ধরনের বৈচিত্র্য বা বিরোধ সৃষ্টি করেনি যার দৃষ্টান্ত প্রাক্-ইসলামি যুগের বাঙলায় ছিল না, ও যার নিদর্শন হিন্দু সমাজ গোষ্ঠীর মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। মুসলমানের বিশ্বাসে অপর ধর্ম বর্জনের নীতি এই পার্থক্যকে তীব্র বিরোধে পরিণত করেছে, ইদানিং কেউ কেউ এ কথা বলে থাকেন। কিন্তু স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস মানুষের সহজাত, একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য নয়, এবং হিন্দুরও এ-বিশ্বাস না থাকলে তার ধর্মের চিরন্তন হওয়ার অর্থ কি?

যে ভাবেই ঘটে থাকুক আজ বাংলা দেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য আছে এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেও থাকবে। গণতন্ত্রের নিয়মে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই রাষ্ট্রের ও সমাজের রূপ নির্ধারণ করে। বাঙলা মুসলমানের দেশ ও বাঙলার সংস্কৃতি অর্থে মুসলমানের সংস্কৃতি, একথা বলার স্বপক্ষে যুক্তি নেই এমন নয়, অন্ততঃ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সভ্যতাকে পাশ্চাত্য বলার চেয়ে অশুদ্ধ হয় না।

কিন্তু কালচার বা তাহ্জিব ভোট নিয়ে নির্দিষ্ট হয় না, সমাজ-চেতনায় বহু শতাব্দীর অলক্ষ কিন্তু অমোঘ প্রভাব সংখ্যাগুরুত্বের জোরে ঘুচানো বা সৃষ্টি করা যায় না। বলা চলে না, সংখ্যাগুরুদের কালচার সংখ্যালঘুরও কালচার। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার বৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতার অধিকার ব্যক্তিস্বাধীনতার মতো পরিবার গোষ্ঠী এবং সমাজে-ও সমানভাবে প্রযোজ্য।

অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান বা হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের কথাই উঠতে পারে না, যেমন কথা উঠতে পারে না বাঙলার উপর উত্তর-ভারতীয় তাহ্জিব চাপানোর। বাঙলার সংস্কৃতি হিন্দুপ্রধান হবে না, মুসলমান-প্রধানও হবে না, এ হবে বাঙালিত্ব প্রধান– যে বাঙালিত্বের বিকাশে, পুষ্টি ও সংরক্ষণে মুসলমানের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সক্রিয়তা হিন্দুর চেয়ে অধিক না হলেও সমতুল্য তো বটেই।

সংস্কৃতিতে এই বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠার মানে, ব্যবহারিক ও মনোজীবনে উভয় ক্ষেত্রেই প্রাদেশিক মনোবৃত্ত অর্জন। সঙ্কীর্ণতা বলে প্রাদেশিকতা ইদানিং ফ্যাশনবিরুদ্ধ, কিন্তু বাঙালির আত্ম-প্রতিষ্ঠার এ ছাড়া আর কি মানে হয়? বাঙালি হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক ব্যবহারিক জীবনে যেভাবে অধিকারচ্যুত হচ্ছে, তার

প্রতিকারের অন্য উপায়ই-বা কী? এবং মানসিকতার এই প্রাদেশিক ঝোঁক না জন্মালে প্রতিরোধী স্পৃহা অর্জন করাও অসম্ভব।

মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানে ভারতে হিন্দুশক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল সত্য কিন্তু বাঙালির জন্য তা অশেষ দুঃখেরই কারণ বয়ে এনেছিল বলে তার জন্য বাঙালি কোনো গৌরব বোধ করে না– এ দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বাঙালি হিন্দুর হওয়া উচিত, তেমনি মোগল, এমনকি তুর্কির বঙ্গবিজয়েও বাঙালি মুসলমান গৌরব বোধ করলে বাঙালিত্বকেই অস্বীকার করা হবে। আর্য সভ্যতার মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ হিন্দুর যেমন অতীত ও বর্তমানকে এই অনার্য-অধ্যুষিত বাঙলার স্বার্থ দিয়েই বিচার করা উচিত, তেমনি, দিল্লি আগ্রার গৌরবমুগ্ধ মুসলমানেরও বাঙলা-আশ্রিত জীবনাদর্শের উত্থান-পতনের প্রতি স্বগোষ্ঠীসুলভ সহানুভূতি দিয়েই দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তোলা উচিত। শশাঙ্ক, গোপাল বা দিব্য শুধু বাঙালি হিন্দুরই গৌরব সূচনা করেন না যেমন হোসেন শাহ্, ওসমান খাঁ বা আলিবর্দি শুধু বাঙালি মুসলমানের একার নহেন।

এর থেকে এ কথা মনে করা উচিত হবে না যে, যে আমাদের ভাবগ্রহিতা, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টির প্রসার সঙ্কীর্ণ করে আনতে হবে, বহির্জগৎ থেকে অর্জিত সব কিছুই বর্জন করে বহির্বিরোধী আত্মকেন্দ্রিক হবে আমাদের আদর্শ। তাতে বাঙালির জড়ত্ব ও মৃত্যু অনিবার্য। আপন শ্রেষ্ঠত্বে অন্ধবিশ্বাস কখনও উন্নতি ও বিকাশের সহায়ক হতে পারে না। আত্ম-সচেতনতা ও সঙ্কীর্ণতা এক বস্তু নয়। যে সমাজ স্বীয় ইতিহাস ও ট্রেডিশন বিস্মৃত হয়েছে বা অস্বীকার করে তার মূলোৎপাটিত বৃক্ষের অবস্থা। স্থান, কাল ও পাত্রের সীমায় বাঙলায় যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ট্রেডিশন গড়ে উঠেছে এবং যা হিন্দু ও মুসলমানের অবচেতন সত্তায় মিশে গেছে তারই স্বচেতন অনুশীলন মানে বর্হিদ্বার রুদ্ধ করা নয়, বহির্বিশ্বে নিজের যোগ্য স্থানাধিকার করার উপায় মাত্র।

দুই

ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু তবু কতকটা প্রাদেশিকতা মেনে চলে– তাদের সামাজিক আচার, পোশাক ও ধর্মানুষ্ঠান ও বহির্বঙ্গীয় রীতির সঙ্গে মেলে না। কিন্তু মুসলমানের বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের বিশ্বময়তা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিরোধী বলে আপত্তি উঠতে পারে। মুসলমানের সামাজিক দৃষ্টি দেশ, শ্রেণি বা জাতীয় সীমাকে স্বীকার করে না– মুসলমান সমাজের মতো তাহাদের সংস্কৃতি অবিভাজ্য। আফ্রিকারই হোক বা চীনেরই হোক, মুসলমান কোনও দেশগত আর সংস্কৃতিগত পরিবেশে আবদ্ধ থাকতে পারে না, বিশ্বের মুসলিম সমাজে ও সংস্কৃতিতে কোথাও সে ধষরবহ নয়। কাজেই মুসলমান বাঙালিত্বকেই যদি তার সংস্কৃতি বিকাশের

ভিত্তি করে তা হলে, বিশ্বসমাজের যে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সে অংশ, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, এবং তার ফলে তার মুসলমানত্বই যাবে হারিয়ে।

মুসলমান জীবনাদর্শের এই fundamental গুলো সর্বত্র স্বীকৃত। বিশ্ব-মুসলিম সমাজের সমগোষ্ঠিতা ক্ষুণ্ন হবে বা মুসলমানের মূল সংস্কৃতির ঐক্যহানিকর, এমন কিছু করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের এই সার্বজনীন রূপ অক্ষুণ্ন রেখে জাতিগত বা দেশগত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ বা অনুমতি এবং তার ঐতিহাসিক নজির আছে কিনা। যে কারণেই হোক, দারুল-ইসলাম কোনও কালেই বিশ্বব্যাপী হয়নি এবং এর মধ্যেও বৈচিত্র্যহীন, দেশোত্তোর একরূপী 'তাহ্‌জিবের' প্রবর্তন হয়নি। যা হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে, বহু জাতি ও দেশের কালচার সমষ্টির মধ্যে ধর্মাচরণ ও সমাজ-ব্যবস্থা জনিত যে অন্তর্নিহিত ঐক্য ছিল, তাকেই কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বলে একটা uniform কাঠামো গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল– এবং তাকেই মুসলিম সংস্কৃতি বলি। রাষ্ট্র-শক্তি-নির্ভর এই সাদৃশ্য তবুও জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে জয় করতে পারেনি। মনে রাখা উচিত তথাকথিত মুসলিম কালচারকে মুসলমান বলা মুসলমানের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের পটভূমিকাতেই শুদ্ধ হতে পারে, কারণ এই প্রাধান্যের জন্যই অমুসলমানও পরেছে মুসলমানের পোশাক, মুসলমানি ঢঙে নির্মাণ করেছে বাসগৃহ, এবং শিল্পকলার চর্চা করেছে মুসলমানি আদর্শ ও উপাদান নিয়ে, যেমন ব্যবহারিক ও চিন্তাজগতে আজকাল পাশ্চাত্য রীতি ফ্যাশন হয়েছে। মধ্যযুগের এই সংস্কৃতির সৌকর্য ও বিস্তৃতি সাধনে অমুসলমানের অংশ উপেক্ষণীয় নয়। মুসলমান ও অমুসলমানের দানে সমৃদ্ধ এই সংস্কৃতির নমুনা-ও ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন রূপ নিয়েছে সাহিত্যে চারুকলায়, স্থাপত্যে, পোশাকে ও আচার-ব্যবহারে। রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য ছাড়া অন্য যে বস্তুটি এই কালচারকে এক-সূত্রে সংযোজিত করেছিল তা হচ্ছে ধর্মানুষ্ঠানের ভাষা ও প্রকরণ ও ধর্মীয় চিন্তাপ্রণালী এবং মুসলমানের বিশ্বভ্রাতৃত্ব। তাই মসজিদের কাঠামো এক হলেও গঠন-বিন্যাসে এসেছে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। সাহিত্যে ও শিল্পাদর্শে ভাষা ও প্রণালীর ঐক্য সত্ত্বেও, প্রকাশ পেয়েছে জাতীয় মানসিকতা। আচার-ব্যবহারে ও চারুকলায় দেশজ পার্থক্য সমগোষ্ঠিতা অব্যাহত রেখেও সুপরিস্ফুট। মরক্কোর আরবিভাষী মুসলমান পরিব্রাজক সমস্ত মুসলিম শাসিত দেশেই সাদরে বরিত হয়েছেন সমাজ ও পরিবারে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের জীবনাদর্শে ও প্রণালীতে তাঁর আরবি মন স্বাজাত্য অনুভব করেনি, আরবি ভাষা ও সাহিত্য সমস্ত দেশেই Second language-এর মতো প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও।

ভাষানুসারে-ও মধ্যযুগের এই সংস্কৃতির একরূপী হওয়া প্রমাণিত হয় না কারণ আট শতক থেকে মুসলিম জগতে দুইটি ভিন্ন ভাষাশ্রিত প্রাণবান ও বিশিষ্ট কালচার

গড়ে উঠেছিল– আরবি ও ইরানি, যার সীমারেখা ছিল টাইগ্রিস নদী। এর পূর্বাঞ্চলের যে সংস্কৃতি ছিল এবং যা ভারতেরও মুসলমান সভ্যতার রূপ নির্দিষ্ট করেছিল, তা যে ফার্সি ভাষার মারফত ইরানি সংস্কৃতিরই মুসলমানি চেহারা, সে বিষয়ে ইতিহাস নিঃসন্দেহ। আর আরব থেকে নিয়ে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের যে সংস্কৃতি তা ছিল পুরোপুরিই আরবি। ভারতে ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনের সব কিছুতেই ইরানের এই সাংস্কৃতিক আধিপত্য আজ পর্যন্ত ইসলামীয়তার নামে চলে আসছে। অথচ, কে না জানে, আরবের শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক ইসলাম ইরানিদের হাতে কী পরিমাণে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাক্-ইসলামি ভারতের সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলোকে অনৈসলামিক বলে অগ্রাহ্য করলে-ও ভারতীয় মুসলমান বিনাদ্বিধায় নওশেরওয়ান, খসরু, শিরি-ফরহাদ, সোহরাব-রুস্তমের কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকে মুসলমান তাহ্জিবের নমুনা মনে করে প্রেরণা পায় এবং তারই ভাষা ও চিত্রকল্পকে মুসলমানি পুথির ভিতর দিয়ে এনে বাঙালিকেও এই তথাকথিত মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা চলছে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বজায় রেখে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বাদ দিলে যে common factor এই মুসলমান আমলের কালচারে রয়ে যায় সে হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত অনুভাব, অনুষ্ঠান ও সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থার মূল নীতিগুলো, যার সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের কোনও মৌলিক দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

কাজেই বাঙালি মুসলমানের জীবনে মধ্যযুগের এই ফার্সি সভ্যতার পুনরুজ্জীবন না হলে ইসলামের আদর্শ অরক্ষণীয় হয়ে উঠবে, এ আশঙ্কা যুক্তিসহ নয়। ইসলামের দেশ ও কালজয়ী আদর্শকে কোনও বিশেষ সংস্কৃতিনির্ভর মনে করলে তাকে খর্বই করা হবে। যেমন ব্যক্তির জীবনে ইসলামি আদর্শ মুক্তি ও বিকাশের বীজমন্ত্র, দেশের ও জাতির সুপ্ত মানসিকতা ও ক্রিয়াশক্তির (creative genius) স্ফুরণেও এ তেমনিই সহায়ক। তার মারণাস্ত্র নয়।

তিন

এতে দ্বিমত নেই যে, বর্তমান বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে, উপরে যে বাঙালিত্বের কথা বলেছি, তার সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ নেই, এ কালচার হিন্দু-প্রভাবিত। মুসলমানের অংশগ্রহণ বা অংশ-স্বীকৃতির প্রতিফলন এতে নেই এবং সেজন্য এ সংস্কৃতি পুরোপুরি বাঙালি নয়।

একে বাঙালি হতে হলে বর্জনের চেয়ে আহরণই করতে হয় বেশি। কারণ হিন্দুঘেঁষা হলেও বাঙলারই একাংশের মানসিকতা রূপ পেয়েছে এই সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশে। বাঙলার সংগীতে কীর্তনের বিশিষ্ট স্থান। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের

অঙ্গ হিসাবে উদ্ভূত ও বৈষ্ণবী ভাবানুপ্রাণিত হলেও এ বাঙালিরই নিজস্ব, উত্তর-ভারতে এর চলন নেই। কাজেই হিন্দুর ধর্মাশ্রিত বলে কীর্তনের চর্চা বাঙলা সংগীত থেকে বর্জন করলে তার ঐশ্বর্যহানিই হবে। শ্যামাসংগীতে মুসলমানের রুচি পীড়িত হতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদী সুর বাঙলারই মানস সৃষ্টি, যেমন ভাটিয়ালি বা বাউল মুসলমান মাঝি ও ফকিরদেরই সুর নয়, বাঙলা সংগীতের অমূল্য সম্পদ।

কাজেই হিন্দুর দান অস্বীকার করে নয়, তার সঙ্গে মুসলমানের দান যুক্ত হয়েই বাঙালি সংস্কৃতি সর্বাঙ্গীণ পুষ্টতা লাভ করবে। এবং এ কাজে মুসলমানেরই কর্তব্য বেশি তা বলা বাহুল্য নয় এ জন্য যে, হিন্দুর সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের যে সমালোচনা হয়, তার নেপথ্যের প্রশ্ন হচ্ছে মুসলমানের জীবনাদর্শ ও সাংস্কৃতিক উপাদান এ কালচারে যথেষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় না কেন? তার জবাব মুসলিম তাহ্‌জিব সম্বন্ধে হিন্দুর অজ্ঞতা স্বীকার এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় পাওয়া যেতে পারে। এ অভিযোগের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য এবং একমাত্র প্রতিকার সে অজ্ঞতা দূর করা। বাঙলায় হিন্দুর সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব চিরকাল ছিল না– রামমোহন রায়ের ফার্সি গ্রন্থ মুসলমানি পদ্ধতিতে 'হামদ' ও 'নাত' দিয়েই আরম্ভ করতে হয়েছে। বিদেশি শাসকের আনুকূল্যে অর্জিত এই নেতৃত্বের অংশীদার হওয়া খুব শক্ত নয়।

বাঙলাই যে বাঙলার মুসলমানের ভাষা হবে– এ আপাত সত্যের পুনরুক্তি করতে হল এই জন্যে যে, ইদানিং মুসলিম কালচারের নিরাপত্তা ও অখ-তার নামে উর্দু চালাবার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। এর সমর্থকরা প্রভাবশালী হলেও সংখ্যায় অল্প এবং বাঙলা ভাষা আজও তাদের আভিজাত্যের বাহন হতে পারেনি। একথা মনে করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাদের যুক্তির সম্পূর্ণ জবাব হয় না। কারণ একথা স্বীকার করতেই হয় যে, উর্দুতে ফার্সি ও আরবি বিশ্বমুসলিম সাহিত্য ও তাহ্‌জিবের যে আহরণ আছে, ভারতের অন্য কোনও ভাষায় নেই এবং এই সাহিত্যের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ বাঙালি মুসলমানের অপমৃত্যু। কাজেই উর্দু যে বাঙালি মুসলমানের অবশ্য শিক্ষণীয় second language হওয়া উচিত তাতে সন্দেহ নেই– অন্তত যতদিন-না বাঙলাতে এই মুসলিম সাহিত্যের মোটা অংশ অনূদিত ও আত্মসাৎ হয়ে যায়।

আত্মসাৎ হয়ে যায় বল্‌লাম, কিন্তু বাঙালি মুসলমানের যে বচনবহুল ও নিষ্ক্রিয় ইসলামপ্রিয়তার নজির দেখা গেছে তার থেকে এই কাজ যে দ্রুত ও স্বাভাবিক গতিতে হবে তার ভরসা হয় না। আজ পর্যন্ত মুসলমান-কৃত কুরআনের সম্পূর্ণ বাঙলা অনুবাদ একটিও বেরোল না; অথচ বিশ-পঁচিশ বছর ধরে মুসলমানের শিক্ষা ও তাহ্‌জিব সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা ও তৎপরতার অন্ত নেই। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার জন্য মুসলমানই আন্দোলন করেছে বেশি; কিন্তু এ শিক্ষার কী বাস্তব রূপ হবে বা বিদ্যালয়ে Standard পাঠ্য রূপে কী চালানো যায় তার আলোচনা

উহ্যই রয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক ইসলাম বা দীনিয়াত সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া চলে না, কারণ মায্হাব ভেদে অনুষ্ঠানের পার্থক্য আছে। মুসলমানি সাংস্কৃতিক ট্রেডিশনের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করানোই যদি এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হয়– আর এ ছাড়া অন্য অর্থও এর হয় না– তাহলে এই সংস্কৃতি প্রতিফলিত মুসলিম সাহিত্যের সর্বাগ্রে যে বাঙলাতে ভাষান্তরিত হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে সচেতন আলোচনা দেখিনি।

বাঙলার তাহ্জিবে তাই মুসলমানি আবহাওয়া ঢোকাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই তাহ্জিবের ধারক মুসলিম সাহিত্যের বাঙলায় অনুবাদ ও তৎসম্বন্ধে গবেষণা। এর জন্য প্রয়োজন, সময়নির্দিষ্ট পরিকল্পনার এবং গবেষক ও অনুবাদম-লী স্থাপনের। বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টি, স্বীয় ইতিহাসনুরাগ শুধু অতীতের কথিত ঐশ্বর্যের প্রতি একটা উচ্ছ্বাসময় অন্ধ আবেগ মাত্রই রয়ে গেল, তাতে সত্যানুসন্ধিৎসু কৌতূহল নেই। লিখিত ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব সত্ত্বেও কী পরিমাণ সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা হিন্দুরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সজীব চিত্র গত একশ' বছরের মধ্যে আবিষ্কার করে সংস্কৃতির ট্রেডিশনকে শক্তিশালী ও ব্যাপক করেছে তা দেখে মুসলমানের লজ্জিত হওয়ার কথা। কারণ মুসলমানের ইতিহাস সাহিত্যের ঐশ্বর্য বিশ্বে অনন্যসাধারণ। বাঙলায় মুসলমান প্রতিষ্ঠিত কোনও অনুসন্ধান সমিতি তো নেই-ই, যে কয়টি সংস্কৃতি পরিষদ আছে, তাতেও তাদের সংখ্যা লজ্জাজনক। এর ফলে মুসলমান তাহ্জিবের দিকে যদি এই সব পরিষদের ঝোঁক না হয়, তা হলে দোষারোপ করব কাকে? আমরা মনে করতেও চেষ্টা করি না যে, গৌড়ে ও পা-ুয়ায়, সাতগাঁ ও হুগলিতে, রাজমহল ও ঢাকায় ধ্বংসস্তূপের নিচে আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন লুকিয়ে আছে। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ যে প্রাক্-মুসলিম সভ্যতা নিয়েই ব্যস্ত তার জন্য মুসলমানের উদাসীনতাই দোষী। অথচ বাঙালি হিন্দুরা স্বচেষ্টায় প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করে ইতিহাস উদ্ধারে সতঃই উৎসাহী। মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও অনুশীলনেরও ব্যাপক চেষ্টা হওয়া দরকার, শুধু আরবি ফার্সি চর্চাতেই তার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের স্বরূপ আবিষ্কৃত হবে না। ভাষা ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেরও বাঙালিত্ব সম্পাদনে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের কর্তব্যই বেশি। মুসলমানি বাঙলা দিয়ে ভাষার synthesis হবে না; তাকে দ্বিখ-িতই করা হবে। ভাষা সমাজ-মন প্রকাশের বাহন, যদি সে সমাজ সমতাহীন হয়, ভাষাও হবে empasis-ময়। বাঙালি সমাজের সব ক্ষেত্রেই যদি মুসলমানের অনস্বীকার্য স্থান থাকে তার প্রতিফলন ভাষাতে অবশ্যম্ভাবী। স্পেন থেকে মুসলমান বিতাড়িত হলেও তার সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ স্পেনের ও ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় মুসলমানি উপাদান সাদরে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যাসাগরি ভাষা বাঙলা সাহিত্যে যে আজকাল ব্যবহৃত হয় না তার জন্য

আন্দোলনের চেয়ে সমাজ-সংস্কৃতির প্রসার ও বিভিন্ন শ্রেণি ও অঞ্চলবাসী লোকের সাহিত্যে প্রবেশই বেশি কার্যকরী হয়েছে। মুসলমানি পুঁথি সাহিত্যকে পাঙক্তেয় করার চেষ্টার চেয়ে এই পুঁথির রসগ্রাহী এবং এর ভাষাগত আনুষঙ্গিকে অভ্যস্ত মুসলমানের সাহিত্যে অংশগ্রহণের সফলতার-ই অধিক সম্ভাবনা। এই কৃষক শ্রেণি বাঙলা সাহিত্যে যে শক্তি ও বাস্তবতা আনবে সেই প্রতীক্ষিত যোগাযোগে সাহিত্যের একমুখিনতা তো ঘুচবেই, বুর্জোয়া tendency ও তজ্জনিত লক্ষ্যহীনতারও হবে অবসান। শক্তিশালী লেখকের সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভের পথে ভাষা যে অন্তরায় নয়– তার প্রমাণ নজরুল ইসলাম– যাঁর প্রাথমিক কাব্যের মর্ম গ্রহণ মুসলমানের পক্ষেও অভিধান-নির্ভর ছিল। সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ হওয়ার কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, শক্তিই নিজের নিয়ম রচনা করে। Charles Daughty-র ভ্রমণকাহিনী Arabia Deserta ইংরেজি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ; কিন্তু অসংখ্য ব্যাকরণিক ভুল ও archaic ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির জন্য এ গ্রন্থ কারোরই সহজপাঠ্য নয়।

সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানকে নিজের ট্রেডিশন ও আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সে ট্রেডিশনের আবিষ্কারক ও প্রচারক হতে হবে তার নিজেকেই। ভারতীয় সংগীতে মুসলমানের নেতৃত্ব আজও খর্ব হয়নি কিন্তু চারুকলার অন্যান্য বিভাগে তার অস্তিত্ব আবিষ্কারসাপেক্ষ। Plastic Arts-এ মুসলমান ধর্মানুজ্ঞার দোহাই দিয়ে অংশগ্রহণ না করলে বাঙলায় এ শিল্প হিন্দু-নির্ভরই রয়ে যাবে। স্থাপত্যে মুসলমান সভ্যতার সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রকাশ ও নিদর্শন আছে; কিন্তু বাঙালি মুসলমান তার অনুশীলন করে প্রচ্ছদপটে চাঁদ-তারা সম্বলিত মিনার ও গম্বুজের ছবি এঁকে। প্রাচীন ভারতীয় কালচারের জ্ঞান ও নিদর্শন কী ব্যাপকভাবে হিন্দু সমাজে সঞ্চারিত হয়েছে ও কী পরিমাণে সমাজচেতনায় মিশে যাচ্ছে– তার প্রমাণ যে-কোনও মাসিকের বিজ্ঞাপনে ও প্রাচীর-পত্রে বা কলকাতার যে-কোনও হিন্দু পল্লির গৃহের ও আসবাবপত্রের গঠনবিন্যাসে ও কারুকার্যে দেখা যায়। কলকাতার মুসলমান নির্মিত গৃহের সংখ্যা খুব সামান্য নয়, কিন্তু তার গঠনবিন্যাসকে কারুশিল্পে বা আসবাবপত্রে মুসলিম সংস্কৃতিজ্ঞাপক বা অনুমোদিত সামান্যতম– চাঁদ-তারা মার্কা ছাড়া– নিদর্শনও দেখতে পেলে বিস্মিত হব। শেরওয়ানি, সালওয়ার, দোপাট্টা আর খানা-পিনা দিয়েই মুসলমান কালচারের রক্ষণ ও প্রসার হতে পারে না; চাই স্বীয় মননে সে সংস্কৃতির আবিষ্কার। ব্যবহারিক জীবনে এমন রুচিসম্মতভাবে ও মানসিক ঔদার্যের সঙ্গে এর অনুশীলন করে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে, যার ফলে এই কালচারেই হবে ফ্যাশন এবং তখনই বাঙলায় হিন্দু-প্রভাবিত কালচারে মুসলমান সম্মানীয় স্বীকৃতি পাবে।

[লেখক: গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ।]

বাঙালি মুসলমানের পরিচয় অন্বেষণ: ইতিহাস-রচনার (পরি) প্রেক্ষিতে

অ সী ম রা য়

পৃথিবীর একটি অত্যন্ত বৃহৎ অংশের ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজগুলোতে ইতিহাসে ও ইতিহাস-প্রণয়নে একটা জিনিস সবার মনে চেপে বসে থাকে। এ-জিনিসটাকে নানাভাবে অভিহিত করা হয়, কিন্তু সমষ্টিগত বা সম্প্রদায়গত স্তরে একে "পরিচয় অন্বেষণ" বলে চেনা যেতে পারে। এ-ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়াও ব্যতিক্রম নয়। আর কিছু না হোক, "আত্মান্বেষণ" এখানে তার অর্থ ও মর্ম হারিয়েছে এবং "প্রতিপক্ষ" খুঁজে বের করার খেলায় এর রূপবিকৃতি ঘটায় গুরুতর মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জনগোষ্ঠীর আত্ম-আবিষ্কারের সমষ্টিগত প্রয়াসের নামে অযথা ও বর্বর হত্যা, গণহত্যা যা দক্ষিণ এশিয়ায় বহুদিন ধরেই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব ইয়োরোপকে উত্ত্যক্ত করছে এবং ধ্বংসলীলা নিয়ে আসছে। সর্বত্রই মানুষ নানাভাবে অন্যদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবার ক্ষমতা ও প্রবণতা দেখাচ্ছে এবং নিজেদের "অমানবিকতা"-র সমর্থনে যুক্তি খাড়া করছে।

অন্য অনেক এলাকার মানুষের মতোই দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের মধ্যে পরিচয় অন্বেষণ আরম্ভ হয় আঠারো শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতক থেকে। এক-একটি বিশাল ও মিত্র জনগোষ্ঠী, যা পরম্পরাগতভাবে ছোট ছোট আদিম গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, যখন ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অনেক বৃহত্তর ধর্মীয় ও ইহবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে অভিন্নতা দেখাতে আগ্রহী হল তখনই এর আরম্ভ। মুসলিমদের মধ্যে এক সমষ্টিগত আত্মসচেতনতার ক্রমবৃদ্ধি এবং সম্প্রদায়টির পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক বিকাশের উপর এর প্রভাব একই পরিঘটনার অন্যতম রূপ। বাঙালি মুসলমানদের বিষয়টি এ-প্রসঙ্গে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে, কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামের সাধারণ ধারার সঙ্গে এটি একই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

আবার ব্যতিক্রমীও বটে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে এটা ঘটলেও, বঙ্গদেশের বেলায় কিন্তু এ-অন্বেষণ সম্পূর্ণত মুসলিম পরিচয় অন্বেষণের অভিন্ন ও একমুখীন রূপ নেয়নি। এখন এটা ভালোভাবেই জানা হয়ে গেছে যে বাঙালি মুসলমানের সমষ্টিগত পরিচয় অন্বেষণ ঐতিহাসিকভাবে রাজনীতির আবর্তে ধরা পড়েছে এবং তার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়েছে দুই বিপরীত আকর্ষণ। এর একটি হল "ঐস্লামিক" পরিচিতির আকর্ষণ তার বিদেশি অনুষঙ্গ সহ, আর অন্যটি দীর্ঘ ও সুস্থিত স্থানীয় "বাঙালি" সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা দেশজ বাঙালি ভাষার সমৃদ্ধ ও শক্তিমান ঐতিহ্যের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ও মূর্ত হয়ে আছে তার আকর্ষণ। এটা সাধারণভাবে জানা থাকলেও জনগণের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে একটি দ্বৈত সত্তার গভীরতা ও জটিলতা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো উপলব্ধি ও অর্থবোধের ভিত্তিতে এ-জ্ঞান গড়ে ওঠেনি। এটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ যে উপলব্ধির এ-অস্বচ্ছতা সাধারণ জ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে পা-ত্যের আঙিনায় প্রসারিত হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষত বঙ্গদেশে, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসার নিয়ে যেসব চর্চা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক বিকাশের কারণ হিসেবে "ঐস্লামিকীকরণের" ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার উপর প্রধানত আলোকপাত করা হয়। ইতিহাস রচনার এই ধারায় একটি সাধারণ আলোচ্য থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রাজনীতির প্রসার ও বিকাশে– যার পরিণামে দেশবিভাগ হল– বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ। এ-কাহিনীর রূপরেখাটি খুব বেঠিক নয়। কিন্তু গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় যখন একটি জটিল ইতিহাসের উপস্থাপনে ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকপাত ঘটে এক সামতলিক ও ঋজুরৈখিক ধারার উপর। "ঐস্লামিকীকরণের" একটানা জয়যাত্রার কাহিনী, যার আরম্ভ এক "পুনরুজ্জীবিত" দেশের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এবং সমাপ্তি খ-িতাকারে হলেও এক কাঙ্ক্ষিত "মুসলিম স্বদেশ" লাভে। এটা একটা মন-মাতানো গল্প হতে পারে কিন্তু ইতিহাস হিসেবে এর বিশেষ মূল্য নেই। বাঙালি মুসলিম ইতিহাসের এই প্রচলিত ও প্রভাবশালী ভাষ্যের মধ্যে কিছু ইচ্ছাকৃত ও কিছু অনিচ্ছাকৃত সমস্যা দেখা দেয়। মুসলিম বাংলার "ঐস্লামিকীকরণের" "উনিশ শতকী দৃষ্টিভঙ্গির" এক উৎসাহী সমর্থকের ভাষায় :

> ... এমনও বলা যায় যে গড় (আমার গুরুত্বারোপ) ভারতীয় মুসলমানের ঐস্লামিকীকরণ আরম্ভ হয় (মূল রচনায় গুরুত্বারোপ) উনিশ শতকে পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। বাঙালি ইসলামে এ-ধারারই একটি মুখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এসব সাদামাটা, অ-সুচিন্তিত ও অনৈতিহাসিক মন্তব্য বোলতার চাকে ঢিল ছোঁড়ার সামিল। এর ফলে বাংলায় প্রাক্-পুনরুজ্জীবন ইসলামের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে; অত্যন্ত মৌলিক কিছু আনুষঙ্গিক প্রশ্নও দেখা দেয় "ঐস্লামিকীকরণের" অর্থ নিয়ে– শুধু পণ্ডিত মহল থেকেই নয়, তার চেয়েও বড় কথা যাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাদের দিক থেকেও। উনিশ শতকের আগেও অনেক শতক ধরে মুসলমানরা বঙ্গদেশে বাস করে এসেছেন এ সন্দেহাতীত তথ্যটি মনে রাখলে আমরা প্রশ্ন করতে বাধ্য হই : উনিশ শতকের আগে এ-মানুষরা যদি মুসলমান না হয়ে থাকেন, তবে তাঁরা কী ছিলেন? প্রাক্-পুনরুজ্জীবনবাদী বাংলার মুসলমানদের সমন্বয়বাদী বিশ্বাস প্রসঙ্গে রফিউদ্দিন আহ্মদ স্পষ্টভাবে আমাদের প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন : "নিশ্চয় করে বলা যায়, এ-ধর্মবিশ্বাস ঠিক ঐস্লামিক ছিল না।" এমন বিচারমূলক ঐতিহাসিক অবস্থান যাঁরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসী বলে জানেন এবং আখ্যাত করেন তাঁদের ধর্মপ্রাণতা সম্পর্কে চর্চা ও সন্দেহ প্রকাশের পণ্ডিতি স্বাধীনতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু গম্ভীর প্রশ্নের উদ্রেক করে। মুসলমান হিসেবে সে-লোকেরা কতটা ধর্মপ্রাণ ছিলেন তা পরিমাপ করার অর্থহীন পণ্ডিতি প্রয়াসে এ-মতের প্রবক্তারা বড় ভুল করেন। এক মহান জনগোষ্ঠী যখন তাদের সারা ইতিহাস জুড়ে বাংলায় মুসলমান হওয়ার ও হয়ে ওঠার গুরুতর সমস্যা নিয়ে ক্লেশকর প্রয়াস চালাচ্ছে– যে-সমস্যা ইতিহাসেরই সৃষ্টি– তখন এই প্রবক্তারা তাদের সম্পূর্ণ ও দীর্ঘ ইতিহাস তুচ্ছ করেন বা ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখেন এবং বিবৃত করেন। এসব মৌল প্রশ্নের আলোচনায় আমরা পরে ফিরে আসব।

অন্য কিছু সমস্যাও রয়েছে যার মোকাবেলা বঙ্গীয় ইসলামের উনিশ শতক কেন্দ্রিক এই ভাষ্যকে করতে হয়। এর এদিক থেকেও গলদ আছে যে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয়বাদী শক্তিগুলোর ক্ষমতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শুধু "ঐতিহ্যাশ্রিত" পরিবর্তন-বিমুখ গ্রামীণ ধর্মীয় ও ইহবাদী স্বার্থকেই পুনরুজ্জীবনবাদী ক্রিয়াকলাপের জন্য এখানে দায়ী করা হয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের একটা বৃহদাংশের ভূমিকা, যেখানে একটি সম্পূর্ণত বাঙালি পরিচয়ের এক বিকল্প মডেল পাওয়া যায়– তার বিবেচনা ও মূল্যায়নে এ-ভাষ্য ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীমুখী ভাবনা ও মতবাদের এমন তন্নিষ্ঠ প্রকাশ বিবেচনা না করলে বঙ্গদেশে ও পরে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মুসলিম রাজনীতির অনেক বিপরীতমুখী ও দ্বন্দ্বমূলক ধারা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যাদান দুর্বল হয়ে পড়বে। বস্তুত, উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগের বাঙালি মুসলমান সাহিত্য নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে বাঙালি মুসলমানদের আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-উক্তির মধ্যে গভীর টানা-পোড়েন, অস্থিরতা এবং এমনকি স্পষ্ট অন্তর্বিরোধ ও সংঘাত লক্ষিত হয়। এমন অনিশ্চয়তারই স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় তৎকালীন ও পরবর্তীকালীন

রাজনীতিতে। ১৯৪৭ সালের বঙ্গদেশ বিভাজনে যদি বাঙালি মুসলমানের "ঐস্লামিক" পরিচিতির সমর্থন পাওয়া যায়, তবে পাকিস্তানের "ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্বের" ভস্মস্তূপ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আবির্ভাব এমন অনেক "ঐস্লামিক" কল্পনাকে খ-িত করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অবশিষ্টাংশও রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষ "এক বাঙালি জাতির" আবির্ভাব আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। বন্ধনমুক্তির অল্পকাল পরেই নতুন রাষ্ট্রের যে ইহবাদ ও গণতন্ত্রী সংবিধান গৃহীত হয় তাকে বাঙালি মুসলমানের চূড়ান্ত "গৃহে প্রত্যাবর্তনের" সূচক বলে অনেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিছুকাল পরেই কিন্তু দেখা গেল "সে-জাতির ও সংবিধানের জনক" পাকিস্তানে গেলেন ঐস্লামিক সম্মেলনে (১৯৭৪) যোগ দিতে এবং পাকিস্তান-কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি স্বরূপ আশীর্বাণী লাভ করতে। বাংলাদেশের কিন্তু অত্যল্প কাল পূর্বে জন্ম হয়েছিল রক্তের স্বাক্ষরে, একদিকে নির্মম পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের তাঁবেদার এবং অন্যদিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এক নিষ্ঠুর ও তিক্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। ইহবাদী "বাঙালি" পরিচয়ে যাঁরা আস্থাবান তারা যেমন এ-সময়ে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন এবং মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, তেমনি অল্পকাল পরে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যের ঘাতকের হাতের মৃত্যুর ভয়ানকতা ও বর্বরতায় তাঁরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। এই রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের পেছনে যেসব শক্তি সক্রিয় ছিল পরবর্তী কয়েক বছরে সামরিক শাসক বা অসামরিক পোশাকের ছদ্মবেশে সামরিক শাসকদের অধীনে একদিকে দেশের উদ্ভিন্ন গণতন্ত্রের দ্রুত অবক্ষয়ের জন্য জমি তৈরি করেছে, অন্যদিকে দেশের রাজনীতিতে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকাল শুরু হল যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল : সংবিধানের মুখবন্ধে কোরানের অনুসরণে "মহানুভব ও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে"– এর উল্লেখ; সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮(১) পরিবর্তন করে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উল্লেখের পরিবর্তে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আস্থা" সূচক ধারাটি স্থাপন; অনুচ্ছেদ ১২ সম্পূর্ণত বর্জন করা, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়িত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল; অনুচ্ছেদ ২৫-এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য স্থির করে নতুন একটি ধারার সংযোজন, যেখানে বলা হল এর লক্ষ্য "ঐস্লামিক সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অবিচল রাখা, রক্ষা করা এবং দৃঢ় করা"।

সরকার ও প্রশাসনের ঐস্লামিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ক্রমশ দৃঢ়তর হতে থাকল পরবর্তী মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল হুসেন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে। এ-প্রক্রিয়া তার চূড়ান্ত রূপ পেল সংবিধানের অষ্টম সংশোধনে (৭ জুন

১৯৮৮) যেখানে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হল। যাঁরা উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে এসব ঘটনার সূত্রে বাঙালি মুসলমানের নিজ ভূমি অন্বেষণের দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রার এক ঐস্লামিক পরিসমাপ্তি হল বলে লিখতে চেয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু অনেকটা আশাহত হলেন। নব্বই-এর দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি থেকে তাঁরা বড় ধাক্কা খেলেন যখন জেনারেল এরশাদকে গদিচ্যুত করে কারাগারে পাঠানো হল। জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশের ঘটনাবলি যে-চিত্রটি আমাদের সামনে বার বার তুলে ধরে তা হল সকলের গ্রহণযোগ্য এক পরিচয়ের অন্বেষণে ব্যগ্র এক জনগোষ্ঠীর চিত্র। বস্তুত এ-কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেনি– মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয়, সময়-সময় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ও দুঃখজনক ইতিহাসের এ-কাহিনী মুসলমানের একই সঙ্গে মুসলমান হওয়ার এবং বঙ্গদেশে নিজভূমি লাভের বাসনা সূচিত করে।

দুই.

মুসলিম বাংলার ও বাঙালি মুসলমানের পরিচিতির ইতিহাস রচনা

যেহেতু ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধের অবতারণা, তাই মুসলিম বাংলা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস রচনার বৃহত্তর প্রসঙ্গ সামনে রেখেই আমাদের প্রশ্নগুলো রাখা উচিত হবে। তাই আমাদের অভিপ্রায় এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রথমে মুসলিম বাংলা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সাহিত্যের মূল সম্ভারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করা, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের পরিচয় সংক্রান্ত সমস্যাটিই আমাদের প্রধান আগ্রহ এ-কথাটা মনে রেখে, এবং পরে এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এই সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ মূল্যায়ন।

আমাদের খানিকটা ধাঁধা লাগে যখন দেখি দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক মুসলিম ইতিহাস রচনার কাজ এ-শতকের তৃতীয় দশকের পূর্বে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। এ-কথাটা অবশ্য সত্যি যে বিগত শতকের শেষার্ধে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের নেতৃস্থানীয় কিছু সদস্য, যেমন সৈয়দ আহ্‌মদ খান, চিরাগ আলি, জাকাউল্লাহ্‌, হালি ও শিব্‌লি নোমানি, মুসলিম ইতিহাস বিষয়ে যথেষ্ঠ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং ইসলাম সম্পর্কে কিছু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। মুসলিম ধর্মীয় ও অ-ধর্মীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের বর্ধমান ও প্রবল ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আগ্রহের মধ্যে মুসলিম ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতায় এই ছেদের একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাঁদের এই আগ্রহ প্রধানত খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক এবং ইহবাদী একেশ্বরবাদী ও "প্রগতিশীল" গোষ্ঠী এবং উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে উন্মেষশীল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী শক্তির হুমকি ও ভীতির কারণেই দেখা দিয়েছিল। পশ্চিমি শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের সাড়া দিতে বিলম্ব সমস্যাকে জটিলতর করেছিল। বিশেষত

এই ব্যাপারটা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম লেখকদের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আগ্রহকেই ক্ষুণ্ন করেনি, আত্মসমর্থনে ও ইসলাম-সমর্থনে অপরাধবোধ সূচক রচনার এক দুর্ভাগ্যজনক উত্তরাধিকার রেখে গেছে, যা পরে বহু বছর ধরে মুসলিম ঐতিহাসিক উপলব্ধি ও পন্থাপদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। এ-পরিস্থিতির অপর একটি বড় ফল হল এই যে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমদের ইতিহাস বিষয়ে অল্প যা আগ্রহ ছিল তা এ-অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় ঐস্লামিক ইতিহাসের অন্তর্দেশে কেন্দ্রীভূত হল।

বঙ্গদেশে মুসলিম ঐতিহাসিক রচনা উনিশ শতকের শেষাংশে ও বিশ শতকে দেশ-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত আয়তনে সীমিত ছিল, কিন্তু তার চরিত্র অনেকাংশেই ছিল দক্ষিণ এশীয় মূল ধারার অনুসারী। এখানেও ছিল দক্ষিণ এশিয়ার গ-ি ছাড়িয়ে ইসলামের সাধারণ ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর গুরুত্বারোপের একই প্রশস্ত ও প্রভাবশালী ধারা; ছিল বাইরের সমালোচনা ও বিরোধিতা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার ব্যাপারে একই অপরাধবোধ-মিশ্রিত উৎকণ্ঠা। বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রধান পুরুষ, সৈয়দ আমীর আলি ও খুদা বক্সের মধ্যে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজি রচনায় লক্ষিত এই ধারা বাংলার অনুরূপ সাহিত্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল; বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাঙালি মুসলিম সাহিত্যসেবী এ-সময়ে সাধু বাংলায় ঐস্লামিক ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে সাধারণ ধাঁচের পুস্তক রচনা করেছেন। বাংলায় দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়ার মতো পেশাদার ঐতিহাসিকের সংখ্যাল্পতা হেতুই বোধহয় যাঁরা ঐতিহাসিক নন এমন মানুষদের হাতে চলে যায় একদিকে ঐস্লামিক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে লেখার দায়িত্ব ও অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয়-সংস্কৃতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার প্রয়াস। মুসলিম বাংলা নিয়ে প্রথম ইংরেজি ভাষায় বিশেষ সমস্যা কেন্দ্রিক গবেষণার অন্যতম হল এম. আজিজুল হকের শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা। এটা অদ্ভুত যে বিশিষ্ট বাঙালি মুসলিম প-িত মোহম্মদ এনামুল হকের বাংলায় সুফিবাদ সম্পর্কিত গবেষণা ত্রিশের দশকে সম্পন্ন হলেও ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে যায়, যদিও ১৯৩৫ সালে তিনি তাঁর গবেষণার নির্বাচিত অংশের সংক্ষিপ্ত এক জনতা-ভাষ্য বাংলায় প্রকাশ করেন। একজন পেশাদার বাঙালি মুসলিম ঐতিহাসিকের কোনো সারবান্ গ্রন্থ আমরা প্রথম পাই আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর কাছে থেকে। তিনি পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐস্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির অত্যন্ত বিশিষ্ট অধ্যাপক রূপে এবং পরে দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন।

মুসলিম বাংলা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রচনার সম্ভার অমুসলিম বাংলা সম্পর্কিত রচনাসম্ভার বা দক্ষিণ এশীয় মুসলিম রচনাসম্ভারের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য সন্দেহ নেই। দেশভাগ-পূর্ববর্তী বাংলায় মুসলমান অধিবাসীদের নিয়ে তন্নিষ্ঠ ঐতিহাসিক গবেষণার যেমন অভাব লক্ষিত হয়, তেমনি অভাব দেখা যায় এমন ইতিহাস রচনায় মুসলিমদের অংশগ্রহণের। সাধারণত "বাংলার ঢাকা ইতিহাস" বলে যা অভিহিত হয় তার দ্বিতীয় খ-ে-র লেখকদের তালিকায় প্রায় সবই যে অ-মুসলিম নাম এ-থেকে আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা সূচিত হয়। এ-গ্রন্থটিকেই কিন্তু দেশভাগ-পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম শাসকদের আমলের বাংলা সম্বন্ধে রচিত সবচেয়ে প্রামাণ্য রাজনৈতিক ইতিহাস বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটি তার উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও দুটি কারণে হতাশার উদ্রেক করে। প্রথমত, এর বিষয়বস্তু মধ্যযুগীয় বঙ্গ নিয়ে গবেষণার বিরাট সুযোগ ও সম্ভাবনা সূচিত করলেও আমরা বুঝতে পারি বাংলার ঐতিহাসিকরা এ-খ-ে মুসলিম বাংলার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সম্পর্কে কতটা উদাসীন থেকেছেন। দ্বিতীয়ত, আমরা হতাশ বোধ করি যখন দেখি এ-খ-টি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ঘটনাবলির মধ্যে সীমিত থেকেছে, যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নাদি পৃথক একটি তৃতীয় খ-ে আলোচিত হবে, সে-খ-টির কাজ কিন্তু আদৌ সমাপ্ত হয়নি।

দেশভাগের ফলস্বরূপ সমস্ত বঙ্গের ঐতিহাসিকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যায় একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়; অনেক বৃহত্তর অনুপাতে মুসলিম ঐতিহাসিকরা এখন মুসলিম বাংলায় ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। দেশভাগের পর পঞ্চাশের দশকে কিন্তু মুসলিম বাংলা নিয়ে গবেষণার প্রাধান্য তেমন দেখা যায়নি; এটা বেশি লক্ষিত হল ষাটের দশক থেকে। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে ইতিহাস গবেষণার পরিস্থিতির উপর দেশভাগের অভিঘাত সমানভাবে পড়েনি, তবু পঞ্চাশের দশকের আপেক্ষিক বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে খানিকটা হদিস পাওয়া যায়। দেশভাগের অব্যবহিত পরে দেখা গেল ইতিহাস গবেষণার মুখ্য কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশ পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পৃথকীকরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষার কাজ অনেক ভাবে ব্যাহত হল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রসারিত হওয়ার ফলে অন্য শাস্ত্রের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস গবেষণার সুযোগও বাড়ল। করাচিতে পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি এবং ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক একাডেমি স্থাপিত হল। এ-সবই পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরে বাংলাদেশে ইতিহাস গবেষণার বিকাশে সমধিক পরিমাণে সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া, ওখানকার পেশাদার ঐতিহাসিক ও প-িত বহুসংখ্যায় বিদেশে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি পাওয়ার সুবাদে ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার কাজকে

এগিয়ে নিয়ে যান। ষাটের দশকে অত্যন্ত দরাজ হাতে এমন অনুদানের ব্যবস্থা থাকায় (প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এ-ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়) পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু পণ্ডিত নানা পশ্চিমি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS)-এ পাঠরত ছিলেন। এটা শুধু আপতিক ঘটনা নয় যে ষাটের দশকে বঙ্গদেশ নিয়ে বেশ কিছু প্রকাশন মুখ্যত SOAS-এ সম্পন্ন গবেষণা থেকে উদ্ভূত।

দেশভাগের পরের দশক যদি মুসলিম বাংলার ইতিহাস রচনার দিক থেকে বন্ধ্যা বলে মনে হয়, তবে এর একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেতে সেই সঙ্কটময় প্রারম্ভিক বছরগুলোতে বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তানি অভিজ্ঞতার দিকে গভীরতর দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথম বছরগুলোতে পাকিস্তান যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার সবই যে কোনো নবজাত উত্তর-ঔপনিবেশিক শিশু রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যা ছিল এমন নয়। এমন সমস্যার অনুপাত নগণ্য ছিল না। উপরন্তু, জন্মের অব্যবহিত পরই দেশ একের পর এক আলোড়নকারী ঘটনাবলিতে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে হতভম্ব হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার প্রায় ঊষালগ্নে জাতির পিতা কায়েদ-এ-আজম জিন্নাহর জীবনাবসান হয়। দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক, লিয়াকত আলি খান, এক আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। পাকিস্তানি উচ্চ বর্গের দুই শক্তিশালী গোষ্ঠীর মধ্যে (একটি ধর্মীয় ও অন্যটি রাজনৈতিক) মতানৈক্য, আস্থার অভাব ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিরোধের ফলে উৎপন্ন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দিশাহারা অবস্থা পাকিস্তানি রাজনীতিতে জমিদার-আমলা-সৈন্যদলের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করল। শেষে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন নিয়ে ক্রমবর্ধমান টানা-পোড়েন ও সঙ্ঘাত, যার ফল হল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-র শহীদ দিবস, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪-র নির্বাচনে পাকিস্তান-সমর্থক মুসলিম লীগের বিপুল পরাজয় এবং পরিণামে ১৯৫৮ সালে সমগ্র দেশে সামরিক ও একনায়কতন্ত্রী শাসন আরোপ। শিশু রাষ্ট্রের জীবনে ঘটনাবলির এমন দ্রুত পটপরিবর্তন এবং তার চেয়েও বড় কথা নতুন রাষ্ট্রের মতবাদগত ভিত্তি ও পরিচিতি নিয়ে চরম বিভ্রান্তি ও আস্থাহীনতা ঐতিহাসিকদের ও অন্য বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে রাষ্ট্রের মানস ও হৃদয় নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের অনুকূল ছিল না।

ষাটের দশকে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ইতিহাস-চেতনার ক্রমোন্মেষ ও ঐতিহাসিক রচনার ধীর আবির্ভাব সত্ত্বেও এটা আশ্চর্যের যে নতুন জাতি ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও তাৎপর্য নিয়ে এবং তাদের আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধি নিয়ে মৌল প্রশ্নাদি পর্যালোচনায় কোনো লক্ষণীয় ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা কৌতুকের

বিষয় যে পূর্ব পাকিস্তানের বাইরের দুটি জানা ঘটনাক্রম বা ধারার সঙ্গে তুলনা করলে মুসলিম বাংলায় ইতিহাস রচনার এই অভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিত্র প্রকট হয়ে পড়ে। প্রথমত, এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি এবং এমনকি ভারতীয় মুসলিম ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক নন এমন মানুষদের মধ্যে এসব প্রশ্ন ও সমস্যা পর্যালোচনায় খুবই আগ্রহ লক্ষিত হয়। আমরা বিসংবাদী ও অপরাধবোধ সূচক তিন খ- সমাপ্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের পাকিস্তানি ভাষ্যের কথা বাদ দিতে পারি। কিন্তু ইশতিয়াক হুসেন কুরেশি, আজিজ আহ্মদ, কে. কে. আজিজ, সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা, এস. মুহম্মদ ইক্রাম, খালিদ বিন সয়ীদ, হাফীজ মালিক, আব্দুল হামিদ প্রমুখ পাকিস্তানি ঐতিহাসিকেরা সকলেই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনুরূপ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখ্য মালিক আহ্মদ নিজামি, মোহাম্মদ ইয়াসিন, আবিদ হুসেন, জিয়াউল হাসান রিজভি, মুহম্মদ মুজিব, এ. রশিদ ও রফিক জ্যাকেরিয়া। পক্ষান্তরে, কিছু সংখ্যক বাঙালি লেখক ও চিন্তক দেশভাগের পূর্ববর্তী দশকগুলোতে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নিয়ে স্পষ্টতই আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং তাদের প্রধান প্রশ্নাদি সম্পর্কে চিন্তায় যথেষ্ট ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। আমরা যদি ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিককার মুসলিম বাংলার সাহিত্যের বিপুল সম্ভার (গ্রন্থ ও সামরিক পত্র সহ) যেখানে এমন প্রশ্ন পর্যালোচনা করা হয়েছে তার কথা ছেড়েও দিই, তা হলেও দেখা যাবে ওই প্রজন্মের কিছু নেতৃস্থানীয় বাঙালি মুসলমান চিন্তক ও লেখক ত্রিশ, চল্লিশ, এমনকি পঞ্চাশের দশকের প্রথম ভাগেও বাঙালি জাতি ও বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, এস. ওয়াজেদ আলি, আবদুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, রেজাউল করিম, হুমায়ুন কবির ও আবুল ফজল।

এসব ধারার কথা মনে রাখলে, এটা বিশেষ অর্থপূর্ণ মনে হয় যে বাঙালি মুসলমানরা দেশভাগের পরবর্তী বছরগুলোতে নিজেদের সাম্প্রতিক অতীত ইতিহাস নিয়ে বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত মতাদর্শের রীতি-নীতি নিয়ে অপেক্ষাকৃত নির্বাক বা উদাসীন থেকেছেন। মুসলিম বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে ফজলুল রহমানের খুবই প্রথম দিককার ও খুবই উপযোগী গবেষণা (১৯৪৮) অত্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু এটা বোধহয় একেবারে আপতিক নয় যে তাঁর গবেষণা-কর্ম খানিকটা অগোচরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাফেজখানায় পড়েছিল, যে পর্যন্ত-না বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৭৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। লতিফা খাতুনের ১৮৮৪ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়ের মুসলিম রাজনীতি

সংক্রান্ত গবেষণা আজও অপ্রকাশিত রয়েছে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশের দশকে নাজমুল করিম কৃত গবেষণার বিষয় ছিল আধুনিক বঙ্গে মুসলিম উচ্চবর্গের উত্থান, তা-ও বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত (১৯৭২ সাল পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়নি। এম. কে. ইউ. মোল্লার (SOAS) থিসিস (১৯৬৬), যার বিষয় নবগঠিত পূর্ববঙ্গ (আসামের অংশসহ) এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, এটাও অদ্ভুত ব্যাপার যে অন্য একটি গবেষণা– লোকায়ত ইসলামের উপর নগরকেন্দ্রিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আহ্মদ মিঞার যুক্তরাষ্ট্রে সম্পন্ন পি-এইচ. ডি. থিসিস (১৯৬৮) এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

পঞ্চাশের দশকে এবং অনেকটা ষাটের দশকেও অন্যান্য প্রকাশনে গবেষণার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল এমন সব বিষয় বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের প্রশ্নের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই। আহ্মদ হাসান দানী বেছে নেন মুসলিম লিপি (১৯৫৭) ও স্থাপত্য (১৯৬১)। একই ধারায় আবদুল করিম গবেষণা করলেন মুসলিম মুদ্রা বিষয়ে (১৯৬০)। তাঁর অন্য প্রকাশনগুলোর বিষয় প্রধানত প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা, মুর্শিদ কুলি খাঁর নবাবি আমল, ১৭০৫-১৭২৮(১৯৬৩) এবং মুঘল রাজধানী হিসাবে ঢাকার ইতিহাস (১৯৬৪)। তাঁর মহাগ্রন্থ, সুলতানি আমলে মুসলিম বাংলার "সামাজিক ইতিহাস"-এ যদিও আধুনিক ঘটনাবলি আলোচিত হয়নি, তবু এর মধ্যে বাঙালি মুসলমানের সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিচিতি নিয়ে মৌল প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ ছিল। পরিতাপের বিষয় যে এর মধ্যে তেমন কিছু নেই যার সূত্র ধরে উত্তরসূরি ঐতিহাসিকরা গবেষণা করতে পারতেন। খুবই সম্ভব যে যার ভিত্তিতে এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেত তেমন সারবান্ উৎসের অভাবে তিনি এরূপ গবেষণা থেকে বিরত হয়েছেন। এটা কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না যে তাঁর গবেষণায় এরূপ প্রশ্নাদি নিয়ে তাঁর আগ্রহের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি খানিকটা গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন যা "বিশ্লেষণাত্মক" ইতিহাসের বদলে "বর্ণনাত্মক" ইতিহাসেরই উপযোগী। যে গবেষণা-ক্ষেত্রে "সামাজিক ইতিহাস" রচনার মতো সম্পদের অপ্রতুলতাই প্রত্যাশিত সেখানে এ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; তাই এ-পদ্ধতির অবলম্বনে ঐতিহাসিক গবেষণা অগভীর হওয়ারই কথা। এটাও খানিকটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে তিনি মুঘল আমলকে উপেক্ষা করেছেন, যদিও সেখানে তাঁর উদ্দিষ্ট সামাজিক ইতিহাস রচনায় অনেক বেশি মাল-মশলা পাওয়া যেত। শেষ কথা, তাঁর নানা বাধা-অসুবিধার কথা মনে রাখলে বোঝা মুশকিল কেন তিনি বাংলায় মুসলিম পদ্য-রচনার (সাধারণত 'পুঁথি' বা 'পুথি' হিসেবে পরিচিত) বিরাট সম্ভারের মধ্যে নিহিত মূল্যবান সাহিত্যিক উৎসকে সম্পূর্ণত অবজ্ঞা করেছেন– যে সম্ভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মুখ্যত পা-লিপি আকারে এবং অংশত মুদ্রিত আকারে সংরক্ষিত আছে। যদিও এ-সাহিত্যের অনেকটাই কালগত

দিক থেকে সুলতানি আমলের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, করিম নিঃসন্দেহে এর অন্তত খানিকটা তাঁর গর্বের "সামাজিক ইতিহাস" প্রণয়নের কাজে লাগাতে পারতেন।

মুসলিম বাংলায় পুঁথি-সাহিত্যের স্বর্ণখনির গভীরে না গেলে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রকৃত প্রণয়ন বা পুনঃপ্রণয়ন চিন্তা করা বা তার প্রয়াস করা সম্ভব নয়। মুসলিম বাংলার ঐতিহাসিকেরা মুসলিম বাংলার ঐতিহাসিক তথ্যের এই অমূল্য উৎস উপেক্ষা করেছেন, হয় ইচ্ছাকৃতভাবে নয়তো অজ্ঞানতাবশে। ষাটের দশকের শেষভাগে আমিই প্রথমে মধ্যযুগের বাংলায় ইসলাম সম্পর্কে আমার পি-এইচ. ডি. গবেষণায় এবং পরের কিছু গবেষণার কাজে প্রাথমিক উৎস হিসেবে এই বিচিত্র সাহিত্যের ব্যাপক ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার করেছিলাম। অন্য একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, মমতাজুর রহমান তরফদার, সুলতানি আমলে হুসেন শাহি বংশের শাসনাধীন বাংলার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এ-কাজে আমার আগে তিনি খানিকটা অংশত, কিন্তু কার্যকরভাবে, অতীন্দ্রিয়বাদী সাহিত্যের ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনায় এমন মালমশলার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে এবং ফলে আবদুল করিমের পদ্ধতির গলদ প্রকট হয়েছে। ষাটের দশকের শেষেও আবদুল মোমিন চৌধুরী (১৯৬৭) ও শাহনারা হুসেন (১৯৬৯) কাজ করে গেছেন অমুসলিম বিষয়বস্তু নিয়ে যার কেন্দ্রে ছিল প্রাক্‌মুসলিম বাংলা। তা সত্ত্বেও ষাটের দশকে দেখা গেল ঔপনিবেশিক বাংলার প্রথম কাল পরবর্তী কালের তুলনায় অধিকতর অনুপাতে ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রকাশনায় স্থান পেয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল মুসলিমদের সম্পর্কিত বিশেষ কিছু ক্ষেত্র। বাঙালি মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজিজুর রহমান মল্লিক বাঙালি মুসলমান সমাজের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি অভিঘাত নিয়ে গবেষণা করে (১৯৬১) পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণায় বাঙালি মুসলমানের আত্মবীক্ষা নিয়ে অধিকতর আলোকপাতী প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি প্রাসঙ্গিক কিছু ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও ভাসা-ভাসা আলোচনা করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। বাংলার নবাবের কাছ থেকে কোম্পানির কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর বিষয়ে আবদুল সাজেদ খান কেমব্রিজ থেকে যে সারবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৯৬৯) সেখানেও মুসলমানের পরিচয় নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য ছিল না। উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন, যেমন ফরাইজি এবং তথাকথিত ওয়াহাবি বা তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া আন্দোলন, নিয়ে মুইনুদ্দিন আহমদ খানের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল তার ফলে আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা পেলাম (১৯৬১, ১৯৬৫ ও ১৯৭৪)। খানের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় প্রতিবাদের মধ্যে ধর্মীয় ও ইহবাদী ভাবনার জটাজালকে উন্মোচিত করা। ষাটের দশকের শেষ দিকে (১৯৬৮)

জন এইচ ব্রুমফিল্ডের মুখ্য গবেষণা-কর্ম সম্পাদিত হল যার বিষয় ছিল বাঙালি উচ্চবর্গের দুই অংশের (হিন্দু ও মুসলিম) সংঘাত। তাঁকে গবেষণার এক নতুন ধারার প্রবর্তক বলা চলে। তিনি ঔপনিবেশিক বাংলায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের উচ্চ রাজনীতি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁর পছন্দানুসারে একটি ঐতিহাসিক কালাংশ বেছে নিয়ে। পরবর্তী দশকের অনেক গবেষণা-কর্মে কম-বেশি সাফল্যের সঙ্গে বাংলার মুসলিম ইতিহাস ও রাজনীতির বিভিন্ন পর্ব ও কাল আলোচিত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম উচ্চবর্গের সদস্য নবাব আবদুল লতিফকে নিয়ে এনামুল হকের দলিল-দস্তাবেজ ভিত্তিক গবেষণা (১৯৬৯) একটি প্রাসঙ্গিক কাজ যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলিম উচ্চবর্গের অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী লক্ষণগুলোর উদ্‌ঘাটন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের যে ঐতিহাসিক গবেষণা-কর্মের কথা উপরে বলা হয়েছে তার পুরো গ-ির মধ্যে আমরা যদি এমন কোনো কাজ অন্বেষণ করি যার প্রাথমিক আলোচ্য ছিল বাঙালি মুসলমানের পরিচয়, তবে আমরা নিষ্ফল হব। এমন গবেষণার মধ্যে আমরা যতই খুঁজি-না কেন, এই কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি নিয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু উল্লেখের বেশি কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু মুসলিম বাংলার ঐতিহাসিকদের যা স্পষ্টতই ত্রুটিস্বরূপ, তা কিন্তু সাহিত্যের প-িতরা অনেক পরিমাণে সংশোধন করেছেন। সাহিত্যের মাল-মশলা এবং– পরিহাসের মতো শোনালেও– আধুনিক বঙ্গ সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণায় নানা গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের কিছু সাহসিক ও মনস্বী প-িত ষাটের দশকে এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। বাঙালি মুসলমানের পরিচয় সাহিত্যের দৃষ্টি থেকে দেখার প্রথম প্রয়াস পাওয়া যাবে কাজী আব্দুল মান্নানের গবেষণায়। তাঁর ছোট মাপের কাজটি সম্পন্ন হয় ১৯৬১ সালে, কিন্তু এটি পরে একটি বিস্তৃত মনোগ্রাফের রূপ নেয় (১৯৬৯)। এখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট বাঙালি মুসলমানের মানসিকতাকে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সারবান্ ও অনুপেক্ষণীয় প্রয়াস এসেছে আনিসুজ্জামানের কাছ থেকে (১৯৬৪)। তাঁর রচিত *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে (১৯৬৪) তাঁর নির্বাচিত সাহিত্যিক বৃত্তের মধ্যে মুসলিম আত্মোপলব্ধির সঙ্গে গ্রন্থকারের গবেষণাকে সম্পৃক্ত করার এক সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ কাজের পর ১৯৬৯ সালে তাঁর পরিপূরক প্রয়াস ছিল উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলিম সাময়িক পত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রতিচ্ছবির বিভিন্ন দিকগুলো বিধৃত করার। সাধারণ পাঠক ও গবেষকের হাতে বাংলা সাময়িক পত্রের মূল্যবান মালমশলা তুলে দেয়ার এটাই ছিল প্রথম প্রয়াস, যা পরে মুস্তাফা নুরুল ইসলাম অনেক পরিমাণে প্রসারিত করেছেন। একটি সঙ্কলন সম্পাদনার মাধ্যমে (১৯৬৮) সরদার ফজলুল করিম বাঙালি মুসলমানদের কিছু রচনার সঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা

করেছেন। এই সাহিত্য গোত্রের পরবর্তীকালের গ্রন্থাদির মধ্যে পড়ে মোহম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৭০), নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৮০), সাঈদ-উর-রহমান (১৯৮৩) ও খোন্দকার সিরাজুল হক (১৯৮৪)-এর কাজগুলো।

১৯৭১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আমার ডক্টর‍্যাল থিসিস "Islam in the Environment of Medieval Bengal" (মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশের পরিম-লে ইসলাম) সমাপ্ত হয়। এতদঞ্চলে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ইসলামের যে রূপটি আমার কাছে "সমন্বয়বাদী ইসলাম" বলে মনে হয়েছে এটি তার নির্মাণ ও প্রকৃতি আবিষ্কারে সম্পূর্ণত নিবেদিত প্রথম ঐতিহাসিক গবেষণা-কর্ম বলে সঙ্গতভাবে দাবি করা যায়। এখানেই সর্বপ্রথম প্রাচীনতম বাংলার রচিত লভ্য পা-ুলিপির মালমশলার এক বড় অংশকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ-গবেষণা কর্মের মুখ্য অবদান বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দ্বিমুখী ধারার ঐতিহাসিক উৎস উদ্‌ঘাটন। এর একটি হল বহিরাগত উর্দু-ফার্সি ভিত্তিক আশরফ ধর্মীয় সংস্কৃতি, অন্যটি এতদঞ্চলের লৌকিক "ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী দেশীয় ঐতিহ্য"। মুসলিম বাংলার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবনের এই দ্বৈত বিকাশের বিদ্যমানতা ও তার স্বীকৃতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য হল এই যে এর মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নির্মাণের দুটি পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী– একটি "বাঙালি", অন্যটি "মুসলমান"– উপাদানের উৎপত্তি বিষয়ে মৌল ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আমার গবেষণায় যে "সমন্বয়বাদী ইসলাম" উপস্থাপিত হয়েছে তার ঐতিহাসিক চরিত্র আমার অবদানের অন্য একটি প্রধান ও বিশেষ গবেষণা-ক্ষেত্র। এ-বিষয়টি বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দু, কারণ এ-অঞ্চলের মুসলিম পরিচয়ের বাঙালি উপাদানটির মর্মে ছিল ইসলামের সমন্বয়বাদী রূপায়ণ। তারপর থেকে "বাঙালি" ও "মুসলিম" মেরুমুখিতার দ্বৈত, এমনকি সংঘাতময়, চরিত্রের উল্লেখ দেখা গেছে বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক ও অন্যতর রচনায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য দুজন প্রথম সারির লেখক মুস্তফা নুরুল ইসলাম ও রফিউদ্দিন আহ্‌মদ, এঁদের গবেষণায় সম্পূর্ণ আলোকপাত ঘটেছে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের উপর। উভয় লেখকই দেশজ বাংলায় লভ্য মূল্যবান মালমশলার সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন মুসলিম বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে। এঁদের মধ্যে নুরুল ইসলাম বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন কারণ, তিনি এ-শতকের প্রথম দিককার সংবাদপত্রের মালমশলা– যা সহজলভ্য নয়– ব্যবহার করেছেন, আবার এমন সাহিত্য থেকে চয়িত দীর্ঘ রচনাংশ অন্য আগ্রহী পাঠকদের নাগালে এনে দিয়েছেন। এই দ্বিতীয় কাজটির মধ্য দিয়ে তিনি পূর্বে উল্লেখিত আনিসুজ্জামানের গবেষণাকর্মকে অনেকটা প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণায়

বাঙালি মুসলিম পরিচিতির কেন্দ্রিক অবস্থান মনে রাখলে এটা আলোচ্য সমস্যারই একটি রূপ বলে মনে হয় যে নুরুল ইসলাম খানিকটা দ্ব্যর্থবোধ এবং এমনকি স্ববিরোধিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "মুখবন্ধ" পড়ে মনে হয় লেখক অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন যে "বাঙালি মুসলমানরা তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে বেশি করে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং তার সংরক্ষণে প্রয়াসী হচ্ছেন"। অন্য এক স্থানে তাঁর কথা খানিকটা বেসুরো শোনায় যখন তিনি মন্তব্য করেন যে তাঁর গবেষণাপ্রসূত তথ্য থেকে "বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিচয় অন্বেষণের একটা ক্লেশকর প্রয়াসের চিত্র পাওয়া যায়"। রফিউদ্দিন আহ্‌মদের প্রথম মুখ্য গ্রন্থের উপশিরোনামে বাঙালি মুসলমানের "পরিচয় অন্বেষণ"-এর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং সে-উদ্দেশ্য তাঁর মনোগ্রাফের নির্দিষ্ট গ-ির মধ্যে তিনি বেশ ভালোভাবেই সাধন করেছেন। এই গবেষণায় তাঁর প্রধান লক্ষ্য হল বঙ্গের মুসলমান সমাজের সংহতি সাধনে বাংলার উনিশ শতকের শেষভাগের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিচার করা। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি যখন মুসলিম বাংলার প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির জটিল জগতে প্রবেশ করেন, তখন "ঐস্লামিক" সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের প্রকৃতি ও নির্মাণ উপলব্ধিতে তাঁর সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ততা প্রকট হয়ে পড়ে। উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের উপর তাঁর মাত্রাতিরিক্ত ও অনৈতিহাসিক গুরুত্বারোপ উপলব্ধিহীন, অসন্তোষজনক ও দুর্ভাগ্যসূচক, এ-প্রবন্ধের আরম্ভে যে-কথাটা আলোচনা করা হয়েছে এবং পরেও করা হবে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আবির্ভাবে– সে-সময়ে যাকে অনেকে দেখেছেন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী মতবাদের উপর বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে– সকল দিক থেকেই বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনার বিস্ফোরণ দেখা গেল। এসব সাহিত্য-কৃতির জন্ম যে শুধু বাংলাদেশেই তা নয়; পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের অন্যান্য অংশ এবং খানিক পরিমাণে এ-অঞ্চল পেরিয়ে পশ্চিমি দুনিয়ার অনেক অংশ থেকেও এমন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হল। তাৎক্ষণিক এই বিস্ফোরণের অনেকটাই স্রেফ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় উচ্ছ্বাসের ফল বা সংবাদপত্রসুলভ প্রকৃতির নিবন্ধাদি ছাড়া কিছু নয়। সন্দেহ নেই এই বিস্ফোরণের ফল হিসেবে কিছু উপযোগী গবেষণা গ্রন্থ, বিশেষত আলোচনা-সভা বা ছোট সম্মেলন থেকে উদ্ভূত সঙ্কলন গ্রন্থ, পাওয়া গেল। মুসলিম বাংলার বর্তমান ও অতীত উভয়কালের ঐতিহাসিক প্রকৃতি নিয়ে আগ্রহের লক্ষণীয় বৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশের আবির্ভাব সদর্থক প্রমাণিত হল। পঞ্চাশের দশকের বন্ধ্যাত্ব ও ষাটের দশকের আনুপাতিক ধীরগতির তুলনায় অত্যন্ত বিপরীত চিত্র দেখা গেল সত্তরের দশক থেকে মুসলিম বাংলা সম্পর্কে ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিপুল আবির্ভাবের মধ্যে। পূর্বে যে-কথাটা বলা হয়েছে তা আবার

উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের বন্ধনমোচনের পর কয়েকটি অপ্রকাশিত পড়ে থাকা থিসিস প্রকাশিত হল। পরিমাণের দিক থেকে স্বভাবতই বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত পা-িত্যপূর্ণ প্রকাশনগুলো প্রাধান্য পেল। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমানার বাইরেও মুসলিম বাংলা ও বাংলাদেশ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার মধ্যে একটি শুভ পরিবর্তন লক্ষিত হল। অনেক ধরনের ছোটখাট প্রকাশনা তো পাওয়া গেলই, সত্তরের দশকে দেখা গেল কিছু দরকারি গবেষণা-কর্ম আর আশি ও নব্বই-এর দশকে মুসলিম বাংলা নিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সারবান্ গবেষণা-কর্ম এল পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের অন্যান্য অংশ ও বিদেশের পা-িতদের কাছ থেকে।

আশি ও নব্বই-এর দশকে প্রকাশিত গ্রন্থাদি খুঁটিয়ে পড়লে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা বৃদ্ধির অন্য একটি ধারাও লক্ষিত হয়। যদি সত্তরের দশকের শেষভাগে এ-ধারা খানিকটা আপাতমাত্র হয়ে থাকে, তাহলে এর কারণ পাওয়া যেতে পারে নতুন রাষ্ট্রে নতুন করে টানাপোড়েনের আবির্ভাব এবং ঐস্লামিক শক্তিগুলোর পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটের মধ্যে। এ-পরিবর্তন প্রকট হল মুজিব জমানার উন্মূলনে এবং সংবিধানের ইহবাদী ধারাগুলোর ক্রম-অবমাননায়, যার পরিণাম ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮) পাশ– এ-নিবন্ধের প্রথমেই আমরা এটা আলোচনা করেছি। এ-সময়ের ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় আগ্রহের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় ধর্মীয় প্রচারের জন্য অসংখ্য মুদ্রিত গ্রন্থাদির আবির্ভাবে, যা এসেছে মুখ্যত পেট্রো-ডলারের দাক্ষিণ্যে গজিয়ে ওঠা শত শত ছোট-বড় ধর্মীয় সংস্থার কাছ থেকে। এ-ব্যাপারটার পেছনে একটা পরিকল্পনা থাকতে পারে, বা এটা আপতিকও হতে পারে। এ-সময়ে কিছু প্রধান-অপ্রধান গবেষণাও হয়েছে, যার মূল বিষয় ঐতিহাসিক বা সমকালীন মুসলিম বাংলার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবন।

বাঙালি মুসলমানের পরিচয় ও ইতিহাসের ধর্মীয় মাত্রাগুলোর চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যের এক পুষ্পিত বিকাশ গত দুই দশকে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আর এই সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে এর পূর্বেকার অন্য নানা ধরনের প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের বর্ধিত সম্ভার বাঙালি মুসলমানের পরিচয় সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নের আলোচনা ক্ষেত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থেকেছে। কিন্তু বর্তমান কালবিন্দুতে এমন তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম আমাদের কোথায় পৌঁছে দিয়েছে?

তিন.

বাঙালি মুসলমান 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়কারী', এবং পরিচিতি নির্ণয় : প্রাক-ঔপনিবেশিক প্রস্তুতি-পর্ব

একত্র বসবাসকারী দুটি জনগোষ্ঠীর পেছনে আর কিছু না ভেবেই 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' ছাপ মেরে দিলেই তাদের পরিচয়গত সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল– এমন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস রচনায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা একালের দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস রচয়িতা মাত্রই জানেন। নতুন নতুন সমস্যা ও চাপের ফলে– বিশেষ করে উনিশ শতক থেকে– দক্ষিণ এশীয় পরম্পরাগত জনগোষ্ঠীসমূহের পরিবর্তনশীল আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে এই উক্তির যাথার্থ্য সর্বাধিক পরিস্ফুট। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটিকে তাদের পরম্পরাগত স্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষিতে বিচার করার এই সহজ প্রবণতা প্রাথমিক স্তরে তাদের গোষ্ঠী-পরিচিতি উদ্ভবের মূল অনুসন্ধানের কাজটিকে ব্যাহত করেছে। অধুনা সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বহুমুখী আলোকপাতের ফলে জাতিগঠনের বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়েছে। "কোনো জনগোষ্ঠী বহির্লক্ষণে স্বতন্ত্র হলেও গোষ্ঠীর লোকেরা এই স্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তিগতভাবে মূল্য না-ও দিতে পারে কিংবা তার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য না-ও দেখাতে পারে।" এমন একটি জনগোষ্ঠী ক্রমে তাদের "স্বতন্ত্র পরিচিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে একটি 'সম্প্রদায়ে' পরিণত হয়, অতঃপর একটি 'জাতি'তে। তারা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয় অর্থাৎ রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করে এবং আপন প্রয়াসে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করে।"

বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নির্ণয় সংক্রান্ত আমার অপেক্ষাকৃত প্রথমদিকের গবেষণায় আমি এই বিশ্লেষণাত্মক মডেলের যাথার্থ্য যাচাই করেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলাম যে বাঙালি মুসলমানের পরিবর্তনশীল গোষ্ঠীচেতনা পরিচিতি নির্মাণের এই প্রধান ধারাটি দৃশ্যত অনুসরণ করেছে। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত দ্রুত পাল্টাতে আরম্ভ করে যে ফলস্বরূপ উচ্চবর্গের মধ্যে– তা ধর্মীয়ই হোক, বা অধর্মীয়ই হোক– যারা গণসমর্থন লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল এবং গোষ্ঠীকে পরিচালিত করতে চাইছিল, তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ, উদ্বেগ ও উদ্যমের সঞ্চার হয়। জাতিগোষ্ঠী পরিচিতির বিচিত্র ও প্রতিযোগী প্রতীকগুলোর মধ্য থেকে– যেমন আত্মীয়সম্পর্ক, ভৌগোলিক অঞ্চল, ভাষা ও ধর্ম– উচ্চবর্গ কোনো একটিকে কেন্দ্রিক প্রতীক বলে বেছে নিয়েছিল তাকে ঘিরে তার পরিবর্তিত পরিচয় সম্বন্ধে অধিকতর ও গভীরতর সচেতনতা সম্পন্ন একটি "সম্প্রদায়" গড়ে তোলার অভিপ্রায়।

অন্য অনেক বৈচিত্র্যময় সমাজের মতোই বাংলায়ও উচ্চবর্গের দ্বারা প্রয়োজনমাফিক সঞ্চালনের কাজে নৃগোষ্ঠীগত জাতীয়তাবাদ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে, ধর্ম ও ভাষা উভয়ই সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রভাবশালী প্রতীক ও হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "নৃগোষ্ঠীচারিতা" বলতে এখানে আমরা বোঝাব নৃগোষ্ঠীর ভিত্তিতে সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর গঠন করা। এর "যান্ত্রিকতাবাদী" মতের যাঁরা অনুসারী তাঁরা সদস্যদের আনুগত্য অর্জন ও তাদের কার্যকরভাবে সঞ্চালনের কাজে গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে ঐক্যসূচক প্রতীকের ব্যবহারে উচ্চবর্গের সঞ্চালক ভূমিকাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে উচ্চবর্গের ভূমিকা ও তাদের পথনির্বাচনের স্বাধীনতা সম্পর্কে "আদিমতাবাদী-যান্ত্রিকতাবাদী" বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল উত্তরভারতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্নটি। বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতাবাদী মত আদিমতাবাদী মতের তুলনায় বেশি সমর্থিত বলে মনে হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানদের পরিচিতি গঠনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি একদিকে তাদের অবস্থানের পরিবর্তিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে কর্মতৎপর উচ্চবর্গের প্রাথমিক ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলে– তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, তাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতের সংঘাত, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও তাদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য গোষ্ঠী পরিচিতির প্রতীকের সুচিন্তিত প্রয়োগ। অন্যদিকে, বাঙলায় ঔপনিবেশিক সরকারের ভেদসৃষ্টিকারী ও শোষণমূলক ভূমিকা আধুনিক বাংলা নিয়ে চর্চারত পণ্ডিতদের দৃষ্টি অনেকখানি আকর্ষণ করেছে। এক্ষেত্রে দেখলে এসব ঘটনা যান্ত্রিকতাবাদীদের পরিচিতি নির্মাণ মডেলের অনেকটাই সমর্থন যোগায়। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকে বাঙালি মুসলমানের পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, যা উচ্চবর্গের হস্তক্ষেপ, পরিচিতি পুনঃপ্রণয়ন এবং জনসমর্থন সংগ্রহ– এ সবের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

উচ্চবর্গের খানিকটা অংশের কথা বাদ দিলে, পরম্পরাগত বাঙলায় ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যেকার কেন্দ্রিক মূল্যবোধের প্রভেদ সামান্যই স্বীকৃতি পেয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের বিপুল অংশ যে ইসলামের কথা পরম্পরাগতভাবে ভেবেছেন, যা তাঁরা গড়ে তুলেছেন এবং তাঁরা যার অনুশীলন করেছেন, তা হল আমার নিজের বিশদ গবেষণায় যাকে আমি "সমন্বয়বাদী" বলে চিহ্নিত করেছি। সাধারণ মুসলমানরা যারা স্থানীয় ভাষা বাংলা ছাড়া অন্যভাষায় কথা বলতে পারত না তাদের সঙ্গে যোগস্থাপন ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটাবার পক্ষে আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে বিধৃত শাস্ত্রগ্রন্থের বা ধর্মীয় অনুশাসনের ইসলাম সম্পূর্ণ অনুপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল। বিষয়টি অধিকতর জটিল রূপ নিয়েছিল বাংলা-বিমুখ উচ্চবর্গের মধ্যে "হিন্দুদের" "প্রাকৃত" ও "ধর্মবিরোধী" বাংলাভাষা

("হিন্দুয়ানি ভাষা")-র প্রতি অ-বাংলামুখীন উচ্চবর্গের অবজ্ঞায়। বহিরাগত ঐস্লামিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহ এবং দেশজ পরিচিত প্রতীকসমূহের মধ্যবর্তী বিরাট ব্যবধান হ্রাসের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্দম সমস্যাটিও ছিল। মুসলিম শিক্ষিত ধর্মীয় উচ্চবর্গের একটি বাংলাভাষী অংশ– আমার গবেষণায় এটিকে "সাংস্কৃতিক সমন্বয়কারী" বলে ভাবা হয়েছে– এই সমস্যার মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এঁরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একটি সমৃদ্ধ ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী পরম্পরা প্রবর্তন করেন। এই পরম্পরা তারপর থেকে বেশ কয়েক প্রজন্মের বাঙালি মুসলমানের হাতে পরিপুষ্ট হয়েছে। কয়েক শতক ধরে বাঙালি মুসলমানের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশের কাছে এটি সমন্বয়বাদী রূপদানের এক বিকল্প মহান পরম্পরার মডেল থেকেছে এবং অন্য ভাষাগুলোর মধ্যে বিধৃত ও অবাংলামুখীন মুসলিম উচ্চবর্গের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত বহিরাগত মহান পরম্পরার সমান্তরাল রূপে বিদ্যমান থেকেছে।

বঙ্গদেশের পরম্পরাগত পরিম-লে সাংস্কৃতিক মেলকরা মুসলমানের পরিচিতির এক সমন্বয়বাদী মডেল নির্মাণ করার ফলে– যে মডেল মুসলমান সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের আনুগত্য লাভ করেছিল– বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের এক সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতা সঞ্চারক দ্বিমুখিতা ও বৈপরীত্যের অবসান ঘটেছিল। পরম্পরাগত বাঙালি মুসলিম সমাজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উভয়ত "আশরফ" (অর্থাৎ "উচ্চ" বা "অভিজাত") এবং "আলতফ" (বা "সাধারণ মানুষ")– যাদের সাধারণত বঙ্গদেশে আত্রাপ/আত্রাফ (অর্থাৎ "অধম") বলা হত– এ দুই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। দুয়ের বিভাজন ছিল একই সঙ্গে বহুরৈখিক ও বহুমাত্রিক। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল জন্মগত কৌলিন্য; আশরফরা এই আভিজাত্য দাবি করত এবং তাদের অবাঙালি শিকড়ের ভিত্তিতে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা দাবি করত– সে শিকড় আরবীয়, আজমি (অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার অনারবীয় অঞ্চল), এমনকি উত্তর ভারতীয়ও হতে পারত। বিদেশে যেমন আশরফদের জন্ম, তেমনি ছিল তাদের বহিরাগত অবাঙালি সাংস্কৃতিক অভিমুখিতা, যা উত্তর ভারতের প্রভাবশালী ফার্সি-ভিত্তিক মুঘল অভিজাত সংস্কৃতির মানসিকতার সঙ্গে তাদের নৈকট্য সূচিত করেছিল। বঙ্গদেশের আশরফদের বহির্দেশীয় সাংস্কৃতিক অভিমুখিতার সবচেয়ে প্রধান উপাদান ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং একই সঙ্গে ফার্সি ও উর্দুর প্রতি অনুরক্তি। উপরন্তু, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আশরাফরা দাবি করত তারাই বিশুদ্ধ ইসলামের উচ্চতম নীতি ও গুণাবলির প্রতিভূ। এসব প্রভেদ দুই অংশের অর্থনৈতিক অবস্থানের বৈষম্য হেতু আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল; সাধারণভাবে আশরফরাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, পৃষ্ঠপোষণ ও প্রতিপত্তির একচেটিয়া অধিকারী ছিল।

বাঙালি মুসলমানের পরিচয় প্রসঙ্গে আশরফদের উচ্চতর অবস্থানের স্বীকৃতির একটা অত্যন্ত গুরুতর পরিণাম দেখা দিয়েছিল। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের ক্রমযৌগিক ফলে এই হয়েছিল যে বাঙালি মুসলমান সমাজের "সামাজিক অনুসরণের" জন্য এই সামাজিক বর্গকে "অভীষ্ট মডেল" হিসেবে স্বভাবতই উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। আশরফদের অভারতীয় এবং এমনকি অবঙ্গদেশীয়, জন্মসূত্রকে সমধিক গুরুত্ব দানের ফলে সামাজিক মর্যাদা প্রার্থী দেশজ মানুষের মধ্যেও নিজের জন্য একটা বিদেশীয় জন্মসূত্র "আবিষ্কারের" স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যেত। উনিশ শতকের শেষ ভাগে জনগণনার বিপরীতে বিদেশীয় জন্মসূত্রের দাবিদারদের সংখ্যার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ওঠার একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। একদিকে "আশরফিকরণের" এই সামাজিক প্রবণতা চলছিল, আর তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে হিন্দুদের মধ্যে চলছিল বাংলা ভাষার সংস্কৃতিকরণের প্রক্রিয়া– নিম্নতর বর্ণদের দ্বারা উচ্চতর ও প্রভাবশালী বর্ণগোষ্ঠীর "সামাজিক অনুসরণ" এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জন্মসূত্রে বিদেশি হওয়ার বিষয়টিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দান বাঙালি মুসলমান সমাজকে এতটাই নিষিক্ত করেছি যে বাঙালি মুসলমান পরিণামস্বরূপ আপন কল্পজগতের শিকার হল– বিদেশি জন্মসূত্র না হোক, বিদেশি সংস্কৃতিকে আপন বলে দাবি করল এবং অন্যরাও সে-কথাটা মেনে নিল। বাঙলার অনেকাংশে– তা গ্রাম হোক, আর শহর হোক– একজন হিন্দুকে দেখা হত, এখনও দেখা হয়, 'বাঙালি' বলে, এবং একজন মুসলিমকে দেখা হত কেবলই "মুসলমান" বলে। প্রায়শই হিন্দু-প্রধান এলাকাকে বলা হত "বাঙালি-পাড়া", কিন্তু মুসলিম-প্রধান এলাকাকে বলা হত "মুসলমান পাড়া"।

এমন পরিস্থিতিতে বাঙালি মুসলমানের পরিচিতিতে একটা দ্বৈতসত্তা– "ঐস্লামিক" ও 'বাঙালি'– এবং এই দুই সত্তার মধ্যে সংঘাতের উৎস লক্ষ করা কঠিন নয়, আর এ-সংঘাত তখন থেকেই এই জনগোষ্ঠী ও তাদের ইতিহাসকে যেন সর্বদা তাড়না করেছে, ভূতগ্রস্ত করে রেখেছে। মুসলিম বাঙালি সম্পর্কে আমার গবেষণা এদিক থেকেই ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে এবং তারপরও বাঙালি মুসলমানের পরিচিতি অন্বেষণের জটিল ও সমাধান-দুর্লভ প্রশ্নটির পরবর্তী কালে গভীরতর চর্চার জমি তৈরি করেছিল বলে দাবি করতে পারে। ষাটের দশকের মধ্যভাগে লন্ডনের ঝঙঅঝ-এ গবেষণা আবদ্ধ হয়েছিল, পরে ক্যানবেরার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এবং তারও পরে হোবার্টের ইউনিভার্সিটি অব তাসমানিয়ায় এই গবেষণা চলছে। এটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে বাংলার মতোই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যত্র মুসলিম সমাজে আশরফ উচ্চ বর্গ ও বে-আশরফদের মধ্যেকার বিস্তৃত সামাজিক ব্যবধানের ধারণা ও উপলব্ধি তাদের

ইতিহাসের প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। আমি আমার নিজের গবেষণার ইতিহাসে– মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আমাদের কাল পর্যন্ত– সামাজিক ও ধর্মীয় উচ্চম্মন্যতার শরিফি দৃষ্টিভঙ্গির অনড়তা ও অবিচ্ছিন্নতা অনুসরণের খানিকটা চেষ্টা করেছি। বাঙালি মুসলমানের প্রতি পূর্বতন পাকিস্তানি শাসকদের অপরিসীম ঔদ্ধত্য ও অহমিকার ভাবের মধ্যে এ-উচ্চম্মন্যতা প্রতিফলিত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে অনেক বাঙালি মুসলিম লেখক আশরফ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈদেশিক বংশোদ্ভবতা– প্রকৃত বা কাল্পনিক– নিয়ে মিথ্যা গর্ববোধের তীব্র নিন্দা করেছেন। মুস্তাফা নুরুল ইসলাম ও আমি উভয়ে এবং অন্য লেখকরাও এমন মালমশলার সদ্ব্যবহার করেছি; এগুলো মুখ্যত তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের সাময়িক পত্রে পাওয়া গেছে। বঙ্গদেশের লোকগণনার প্রতিবেদনে– বিশেষ করে এইচ. বিভারলি (১৮৭২), জে. এ. বুর্‌দিলন (১৮৮১) এবং ই. এ. গেইট (১৯০১) কর্তৃক লিখিত প্রতিবেদনে– এসব প্রশ্নের খানিকটা গভীর চর্চা হয়েছে। বিগত কয়েক দশকের অনেক বিদগ্ধ গবেষণা-কর্মেও এ-প্রশ্ন নিয়ে কিঞ্চিৎ গৌণভাবেই হোক, কি অপেক্ষাকৃত মুখ্যরূপেই হোক, আলোচনা হয়েছে! কুঁয়র মুহম্মদ আশরফ (১৯৩৫) থেকে শুরু করে, এ. কে. নাজমুল করিম (১৯৫৬, ১৯৬৪ ও ১৯৭২) এবং রুবেন লেভি (১৯৬২) পর্যন্ত গবেষকদের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্পষ্টতই তা হলে বাঙালি মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ আশরফ-আতরফ গঠনগত বিভেদ আবিষ্কার সাম্প্রতিক কালের পি-তদের কাজ নয়। তার পরিবর্তে আমি এই বিভেদ থেকেই আমার কাজ শুরু করেছি এবং এই ভিত্তির উপর আমার গবেষণা-কর্ম নির্মাণ করেছি। আমার পক্ষে সবচেয়ে প্রাথমিক গঠন ও পুনর্গঠনের কাজ ছিল এই সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নটিকে বাংলার ও বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসের বিস্তৃতির, বিচিত্রতর ও পূর্ণতর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা। বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দেখলে, বাঙালি মুসলিমদের এই সামাজিক বিভেদের মূল বাংলার পরিম-লের কিছু মৌল ও ব্যাপকতর কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের মধ্যে নিহিত বলে বোঝা যাবে। এর মধ্যে সামাজিক দিক থেকে দলিত গোষ্ঠীগুলো থেকে ইসলাম যে তার অনুগামীদের পেয়েছিল সে-ঘটনার ব্যাখ্যাই শুধু পাওয়া যায় না। ইসলাম-অনুগামীদের সংখ্যাবৃদ্ধির এই উৎসটিই 'তৌহিদ' বা বিশ্বাসের ঐক্য ও অবিভাজ্যতার ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সমাজ বা 'উম্মাহ্'-র পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। উচ্চতর ও নিম্নতর স্তরের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান এই আপাত-অবিশ্বাস্য সত্যটিও এভাবে প্রকট করে তুলেছিল। অমুসলিম সমাজে বিদ্যমান অনুরূপ সামাজিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ব্যবধানের বেলায় অন্ততপক্ষে স্থানীয় ও গ্রামীণ সম্মেলক সংস্থাগুলো– ধর্মীয় হোক, কি ইহবাদী হোক– পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য এক সাধারণ ভাষার দৌলতে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। হিন্দু ও

বৌদ্ধ জগতে এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের দ্বিধা-বিভক্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামের বহিরাগত উচ্চ বা মহান ঐতিহ্য, স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের বিশাল জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন বৈদেশিক ফার্সি-আরবির ভাষাগত গ-িতে আবদ্ধ থাকার ফলে, তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতের ব্যবধান অনুরূপভাবে ঘোচাতে অসমর্থ হয়েছিল। এমন পরিস্থিতি সামাল দিতে একটা পথ প্রয়োজন ছিল। বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত জনের একটি দল, যাঁরা "সাংস্কৃতিক মেলক" হিসেবে কাজ করেছিলেন, সে-পথ দেখিয়েছিলেন। এই মেলকদের এক অংশ ধর্মোপজীবী এবং অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মীয় নেতা (পীর) হওয়ার সুবাদে এবং বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সে-ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার কারণে জনগণের নিকটতর ছিলেন। প্রভাবশালী আশরফ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধতা করে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের এক সমন্বয়বাদী রূপ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিরাট পরিমাণে বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সৃজনমূলক গতিশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু তৃণমূল স্তরে এসব পরিবর্তনের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রেক্ষিতেই এই মেলকদের ভূমিকাকে বিচার করতে হবে। সামান্য পরিমাণে হলেও প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় যে সমাজের তলা থেকেই অনেক সময় এর জন্য চাপ গড়ে উঠেছিল। উচ্চকোটির ভূমিকাকে সঠিক প্রেক্ষিতে দেখতে হলে এমন প্রমাণ খুবই সহায়ক হয়। ব্যাপকতর সামাজিক উদ্বেগ ও জনগণের প্রেরণার সঠিক রূপ দান ও তার সঠিক দিকনির্দেশ নেতৃত্বের স্বাভাবিক করণীয়ের মধ্যে পড়ে।

বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের সমস্যা চর্চার জন্য প্রয়োজন একটি বিশ্লেষণী ও ব্যাখ্যাত্মক কাঠামো নির্মাণ, যার মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলকদের আবির্ভাব এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের গঠনগত ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান মোচনে একটা সমন্বয়বাদী ছাঁচে ইসলামের এক সৃজনাত্মক পুনঃপ্রণয়নের মধ্য দিয়ে সাহসিক অংশগ্রহণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমার নিজের বিনীত অনুমান, এক্ষেত্রে আমার অবদানের সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক ও নতুনত্বময় অংশ হল এটাই। আমি খানিকটা নৈরাশ্য বোধ করি যখন মুসলিম বাংলা সম্পর্কিত পরবর্তী কালের গবেষণায় আমার লব্ধ তথ্যাদির তাৎপর্যের সম্যক উপলব্ধির একটা সাধারণ অভাব লক্ষ করি। নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের বাংলার দুটি মুখ্য গবেষণা-কর্মে– তাদের বিষয়বস্তুর বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও– আমার গবেষণা ও তার তাৎপর্যের প্রতি প-িতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক "পবিত্র গোমাতা"-এর উপর আলোকপাত করে জয়া চ্যাটার্জির পথপ্রদর্শক ও উৎকৃষ্ট গবেষণা-কর্মের কথা বলা যায়। বাংলা-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কিছু সারস্বত প্রকাশনায় যে সাধারণত ধরে নেয়া হয়েছে যে "বাঙলার

মুসলমানরা মজ্জায় মজ্জায় সাম্প্রদায়িক ছিল" তা নিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এ-সমস্যা নিয়ে তত্ত্বের উপস্থাপনার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

> এসব তত্ত্বীকরণ, বিশেষ করে সুরঞ্জন দাশ কৃত তত্ত্বীকরণ, রফিউদ্দিন আহ্মদের গবেষণার উপর সমধিক মাত্রায় নির্ভরশীল, যেখানে উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পরিচয়ের এক প্রবল বোধের আবির্ভাবের সপক্ষে তিনি সওয়াল করেছেন। ... এসব কাজের মধ্যে অসীম রায়ের গবেষণা, যেখানে বিপরীত যুক্তি খাড়া করা হয়েছে, উপেক্ষিত হয়েছে। রায় বঙ্গদেশীয় ইসলামের মধ্যে সমন্বয়বাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য বিকাশের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন এবং একই সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে এক বিকল্প 'বাঙালি' পরিচয়ের বিকাশ লক্ষ করেছেন।

চ্যাটার্জির গ্রন্থ প্রকাশের বছরটিতেই ডেভিড ক্যাশিন মধ্য বঙ্গীয় মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদী সাহিত্যের উপর এক মুখ্য গবেষণা-কর্ম প্রণয়ন করেন। তাঁর আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল এসব সাহিত্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক ভিত্তির নির্ণয় ও বিশ্লেষণ। তিনি প্রবলভাবে, এবং অত্যন্ত সঙ্গতভাবে, এমন সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এবং অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "এ-ঐতিহ্যের শুধু সংক্ষিপ্ত উল্লেখের" বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। উপরন্তু, তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে এমন গবেষণায় "ওইসব কাজ বিশদভাবে বিশ্লেষণের ... কোনো চেষ্টা হয়নি" এবং "এ-ঐতিহ্যকে অনুকরণাত্মক, নিকৃষ্ট প্রকৃতির ও আপন অধিকারে চর্চার অযোগ্য" বলে দেখা হয়। এই প্রসঙ্গেই ক্যাশিন ঐশ্লামিক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার গবেষণার উল্লেখ করেন এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। আমার কাজকে "মুসলিম মধ্য বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াসে পাশ্চাত্যে প্রথম গবেষণা-কর্ম" বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে দক্ষিণ এশীয় ইসলামের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যখন বাংলাভাষী এলাকার কথা ভাবা হয়, আমার গবেষণা ব্যাপক খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এতৎসত্ত্বেও আমি খানিক পরিমাণে নিরুৎসাহ হই যখন দেখি আমি যাকে "ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য" বলেছি– এবং অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের জন্য মেলকদের দ্বারা রচিত সৃজনাত্মক নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের এক বিকল্প মহান ঐতিহ্য হিসাবে উপস্থাপিত করেছি– তার অর্থ ও বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য পণ্ডিত সমাজে এখনও হ্রাস পায়নি। এখানে প্রাসঙ্গিক হবে উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙলার ঐস্লামিকীকরণের বিতর্কিত তত্ত্বটিতে ফিরে আসা– রফিউদ্দিন আহ্মদই এ-তত্ত্বের প্রবক্তা, আমার নিবন্ধের শুরুতে যে-কথাটা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলায় ইসলামের

অবস্থার এবং ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি ও বোধের উপর এ-প্রশ্নটির সমধিক প্রভাব রয়েছে।

চার.
ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলমানের পরিচয় ও ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য

"বিশুদ্ধতাবাদীরা" অনেক সময় "সমন্বয়বাদকে" ভুয়ো বলে গণ্য করেন। এমন উপলব্ধিই বাংলা-সহ দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চ শ্রেণির একটি বৃহৎ অংশের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়– কারণ তাঁরা এমন পরিবর্তনকে ইসলামের এক "ভেজাল জনপ্রিয় রূপ" বলে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন এ-শতকের বাঙালি মুসলমান লেখক ও চিন্তকদের মধ্যে পরম যুক্তিবাদী। ১৯৫১ সালে লিখতে গিয়ে তিনি বললেন যে উনিশ শতকের পূর্ববর্তী পুনরুজ্জীবনের সংস্কৃতি ছিল "হিন্দু ও মুসলিম চিন্তার মৈত্রী" এবং এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের সত্যতা "আজকের শিক্ষিত মুসলমানের কাছে সাধারণভাবে পীড়াদায়ক", কারণ "তাঁরা এটাকে নিজ পরিচয়ের অস্বীকৃতি বলে গণ্য করেন"।

প্রশ্নটি কিন্তু ওদুদ সাহেবের গভীর উপলব্ধিসূচক মন্তব্য পড়ে যতটুকু মনে হয় তার চেয়ে অনেক গভীরতর এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ওদুদ যাকে বাংলার "আজকের শিক্ষিত মুসলমানের বেলায়" সত্য বলে দেখেছিলেন বস্তুত তার ইতিহাস দীর্ঘ এবং শুধু বাংলা নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতেই অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। বাংলার ঘটনাবলির উপর যাঁরা নজর রেখেছেন এমন নানা মানুষ মোটামুটি একমত যে এ-ধর্মের যে প্রধান রূপটি পরম্পরাগত বা পূর্ব-আধুনিক বাংলার বিরাট সংখ্যাগুরু অংশে অনুশীলিত তা ছিল বেশ খানিকটা "বিপথগামী" বা "বিকৃত"। আঠারো শতকের শেষভাগে গোলাম হুসেন তাবাতাবাই মুসলিম বাংলার এই "বিপথগামিতা" লক্ষ করেছেন। উনিশ শতকের শেষদিকে মুসলিম-অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় বাস করেছেন এমন এক ব্রিটিশ সাহেব, ড. জেমস ওয়াইজ, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে "বিকৃত হিন্দুঘেঁষা আচারাদির" প্রচলন দেখেছেন। উনিশ শতক ও তার পরবর্তীকালের ঐস্লামিক মৌলবাদী, পুনরুজ্জীবনবাদী ও সংস্কারবাদীদের বিপুল পরিমাণ দ্বন্দ্বমূলক ও প্রচারমূলক রচনাদির মধ্যে বাংলার এই "অধঃপতিত" ইসলামের সবচেয়ে সজীব চিত্রণ ও সর্বাপেক্ষা বিষোদগারী নিন্দাবাদ দেখা গেছে। বর্তমান শতকের প্রারম্ভে আধুনিক মুসলিম সামাজিক ও বৌদ্ধিক উচ্চকোটির বিশিষ্ট সদস্য, সৈয়দ আমির আলি "পশ্চিম থেকে এসে যে-মুসলিমরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং ভারতে সভ্যতা ও আলোকময়তার ঐতিহ্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন" এবং পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান যাঁরা ছিলেন "প্রধানত ধর্মান্তরিত হিন্দু" এবং তখনও "অনেক হিন্দু

রীতিনীতি মেনে চলতেন"– এ দুই গোষ্ঠীর বৈপরীত্য তুলে ধরেছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের ধর্মপ্রাণতা সম্পর্কে সমকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিক ও সরকারি কর্মচারীরা অনেক সময় অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের পাঞ্জাবি রাজ্যপাল, মালিক ফিরোজ খাঁ নূন, তাঁর প্রজাদের দেখেছেন "আধা-মুসলমান" বলে। বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে "পারস্পরিক অসন্তোষের বড় কারণ" হিসেবে অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহাস উল্লেখ করেছেন "পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের দ্বারা পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্মপ্রাণতা সম্পর্কে অবিশ্বাস্য অবজ্ঞার" কথা। বাংলাদেশ সঙ্কটের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের এক জেলায় নিযুক্ত জনৈক সামরিক অফিসারের কথা ম্যাসকারেনহাসের মনে আছে। অফিসারটি ওখানকার "সরস, কালো মাটি" এক মুঠো হাতে নিয়ে বলে উঠেছিলেন, "আল্লাহ, এমন চমৎকার মাটি নিয়ে আমরা কীই-বা না করতে পারতাম", তারপরই যোগ করেছিলেন, "কিন্তু আমার মনে হয় তা হলেও আমরাও এদের মতোই হয়ে যেতাম।" প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁও অনুরূপ মত পোষণ করতেন বলে জানা যায়।

বাঙালি ইসলামের বিপথগামিতা বা "বিচ্যুতির" প্রকৃতি উপলব্ধি সাধারণ ও পরিষ্কার ব্যাপার। কিন্তু এর অর্থবোধ, ব্যাখ্যা ও ধারণা-নির্মাণের কাজ ততটা স্বচ্ছ নয়। সারস্বত সমাজে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির প্রাধান্য দেখা যায় সেখানে "শাস্ত্রীয়" ইসলামের মান ও ব্যবস্থাদির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সবকিছুতেই তথাকথিত "লৌকিক" বা "গণমুখী" ইসলামের ছায়াচ্ছন্ন ও অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়, আর এমন ইসলামের বিকাশের জন্য সহজেই দায়ী করা হয় "অসম্পূর্ণ ধর্মান্তরীকরণ" বা "হিন্দু ধর্মের প্রদূষক প্রভাবকে"। এই লক্ষণনির্ণয় ও ব্যাখ্যাদানের বিষয়ে পশ্চিমি ও দক্ষিণ এশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ খানিকটা ঐকমত্য লক্ষ করা যায়। রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটন মুঘল বাংলায় ইসলামের এই দুই ভিন্ন ধারার কথা বলেছেন– "বাঙালি গণধারা" এবং "উত্তর ভারতীয় আশরফ ধারা"। ফ্রান্সিস রবিনসন তাদের (বাঙালি মুসলমানদের) অভিহিত করেছেন "আধা-মুসলমান" বলে। পিটার হার্ডি স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের "আদমসুমারি মুসলিম" বলে অভিহিত করেছেন এবং আরও বলেছেন :

> ধর্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধতা ও ধর্মানুসরণের দিক থেকে ইসলামের সামনে মধ্যযুগীয় ভারতে সত্যিকারের যে-বিবাদ তার পরিচয় পাওয়া যাবে ... গ্রামাঞ্চলে– ইসলামের নিয়মবিধি সম্বন্ধে নতুন মুসলমানদের অজ্ঞতার মধ্যে এবং ধর্মান্তরিতদের প্রাত্যহিক জীবনে "হিন্দুধর্মের" নানা আচারের অনুপ্রবেশের মধ্যে।

অনুরূপভাবে, মুহম্মদ মুজীবের উপলব্ধিতে মনে হয়েছে, সাধারণ মুসলিমদের কেবল "আংশিক ধর্মান্তরণ"-ই ঘটেছিল। আজিজ আহ্মদের অভিমত : "ভারতীয় ইসলাম হল প্রাকৃত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সমন্বয়বাদী বিশ্বাসের এক বিচিত্র সমাহার। ... পৃথিবী জুড়ে, অন্য ধর্মের মতোই ইসলামের ক্ষেত্রেও, জীবত্বারোপের শিকড় রয়েছে খানিক পরিমাণে লোক-বিশ্বাসের মধ্যে, কিন্তু ভারতবর্ষে হয়তো এ-বিষয়টির মধ্যে খানিক মাত্রায় হিন্দু ধর্মের প্রভাব দেখা যাবে।" তিনি এ-ঘটনাকে "ভারতের অদ্ভুত শোভাবৈচিত্র্যে ভিন্নতর বর্ণসংযোগ" বলে নিন্দা করেছেন।

অন্য ভারতীয় পণ্ডিতরা ইসলামের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুরূপ ভাব ও মত প্রকাশ করেছেন। ইমতিয়াজ আহ্মদ হলেন দক্ষিণ এশীয় ইসলামের নানা রূপ ও বৈষম্যের বড় সমর্থক। তিনি দক্ষিণ এশীয় ইসলামের মধ্যে একটা "স্বতন্ত্র" ধারা বা স্তরের পরিচয় পেয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের "বাস্তববোধ"-এর প্রকাশ ঘটেছে। তিনি আরও বলেছেন :

> ... ইসলাম-সম্পর্কিত আলোচনায় যদি কেউ এ-ধারা বা স্তরকে সম্পূর্ণত উপেক্ষা করতে চান, তবে তা খুবই ন্যায়সঙ্গত হবে, তবু মনে রাখতে হবে এর অনুগামীরা মুসলমান নামে পরিচিত এবং অন্যরাও তাদের মুসলমান বলেই গণ্য করেন।

সুমিত সরকারের ভাষায় :

> এ-কথাটা স্বীকার করতে হবে যে এই পূর্ব-আধুনিক সংশ্লেষণের কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতা ছিল। সামাজিক বাধানিষেধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রবল থাকায় এমনকি গ্রাম স্তরেও তারা পৃথক সত্তা বোধ রক্ষা করে চলত। সমন্বয়কারী প্রবণতা খুব প্রায়শই যুক্তিহীন ভক্তিবাদ ও অভিন্ন কুসংস্কার পালনের রূপ নিত; উনিশ শতকী সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে– হিন্দু ও মুসলিম উভয় ক্ষেত্রেই– এসব রীতি-আচারকে তাদের নিজ নিজ ধর্মমতের আদি বিশুদ্ধতার দূষণ বলে গণ্য না করা সম্ভব ছিল না।

আমাদের পক্ষে এটা বরং বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ যে বাঙালি বংশোদ্ভব ঐতিহাসিকদের– মুসলিম, কি অমুসলিম– এ প্রশ্নে অন্য দক্ষিণ এশীয় ও পশ্চিমি ঐতিহাসিকদের সঙ্গে অনেকাংশেই সম-মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায়। মমতাজুর রহমান তরফদার, যিনি "সরল ও কৃচ্ছ্রতাভিত্তিক ইসলামকে" বাংলার "জনজীবনের" বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করতে চাননি, সিদ্ধান্তে এসেছেন :

> ... তৎকালীন সাহিত্যের সতর্ক পাঠ থেকে দেখা যাবে যে এক ধরনের লৌকিক ইসলাম প্রচলিত ছিল যার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের বিশেষ কোনো সম্পর্কই ছিল না।

একই অবস্থান খুব জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন আজিজুর রহমান মল্লিক। বাংলার ইসলাম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "এর মধ্যে বিকৃত ও অধর্মীয় আচারানুষ্ঠান সমধিক প্রাধান্য পেয়েছিল", "অর্ধ-ধর্মান্তরিত মুসলমানদের" "অজ্ঞানতার" কথা বলেছেন এবং ইসলামের মধ্যে "অনৈস্লামিক আচারাদি প্রবেশের পথ" হিসেবে "অসম্পূর্ণ ধর্মান্তরণকে" শনাক্ত করেছেন। মল্লিক লিখেছেন : "বাংলার গ্রামীণ জেলাগুলোতে অসম্পূর্ণ ধর্মান্তরীকরণের ফলে এমন মানুষরা নামেই ইসলামের অনুগামী ছিল...।" অধিকন্তু তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও "রাজনৈতিক ক্ষমতা লোপের" বিষয়টি তুলে বলেছেন, তাঁর মতে, "ইসলামের বিকৃতিসাধনে এটি নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে...।" একটি মজাদার মন্তব্যে মল্লিক "হিন্দুদের মধ্য থেকে আধা-ধর্মান্তরিতদের" "মুসলমান" বলে গণ্য করায় তাঁর অনীহার কথা প্রকাশ করে ফেলেছেন :

> এভাবে বহু বছর ধরে অনেক পরিমাণে সংখ্যাগুরু অমুসলমানদের সঙ্গে মিশে, ইসলামের মূল বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং হিন্দুধর্ম থেকে আধা-ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে বাস করে, মুসলমানরা মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছিল; তাদের উপর একটা 'ভারতীয় প্রভাব' পড়েছিল।

রফিউদ্দিন আহ্‌মদ শুধু "ঐস্লামিক গোঁড়ামি" এবং "লৌকিক আচার-বিশ্বাসের" মধ্যে গতানুগতিক পন্থায় ব্যবধান নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি। মনে হয় তিনি সমগ্র প্রশ্নটিকে একটা মাতব্বরি ও পৃষ্ঠপোষকতার ভঙ্গি থেকে দেখতে চান যখন তিনি লেখেন :

> উনিশ শতকের শেষভাগ অবধি আপন ধর্মের গুণবত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রায় কোনো ধারণাই ছিল না; এ-গুণবত্তা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কোনো উপায়ও তাদের ছিল না।

সমন্বয়বাদী বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা বোঝাতে তিনি "অধর্মীয়" শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং পয়গম্বর মোহাম্মদকে জনৈক বাঙালি মেলক-লেখক যে হিন্দু দেবদেবীর পাশে স্থান দিতে চেয়েছেন সেই সৃজনমূলক প্রয়াসকে তিনি "অনৈস্লামিক" বলে চিত্রিত করেছেন। আহমদ সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের এমন স্রষ্টাদের মেলক ভাবনা ও ভূমিকাকেই শুধু উপেক্ষা করেননি, অনেক বিখ্যাত উত্তর ভারতীয় সুফিদের অনুরূপ প্রয়াস সম্পর্কও তিনি অজ্ঞানতা দেখিয়েছেন– যে সুফিরা নিজেদের কাজের সমর্থনে কোরানের এই উক্তির উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ সকল জাতির কাছেই তাঁর পয়গম্বরদের পাঠিয়েছিলেন। ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের উপর রচিত আমার গ্রন্থে আমি মুসলিম সাংস্কৃতিক মেলকদের সাহিত্যিক প্রয়াসের পশ্চাতে ধর্মীয় ভাবনা ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য অনেকখানি

স্থান ও কাল ব্যয় করেছি। সৈয়দ সুলতান রচিত *নবী-বংশ* গ্রন্থের বক্তব্য বিশদভাবে পরীক্ষা করার পর আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ঐস্লামিক পয়গম্বরের সাধনার চূড়ান্ততা ঘোষণার অন্তিম উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর সুনিপুণ ও সৃজনাত্মক পরিমার্জন-পরিবর্তন করেছেন। পয়গম্বর মোহম্মদের পূর্বতন অন্য নবীদের উপর ঈশ্বরের বাণী বর্ষিত হয়েছিল এ-তথ্য কোরান থেকে গ্রহণ করে তিনি নানা যুগে নানা "অবতারের" আবির্ভাব সম্পর্কিত হিন্দু ঐতিহ্য, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ কাহিনী, ব্যবহার করেছেন পূর্বতন আবির্ভাবের ব্যর্থতা তুলে ধরতে এবং পয়গম্বর মোহম্মদের অন্তিম সাধনার জমি প্রস্তুত করতে। এটা শুধুই ভাগ্যের পরিহাস নয় যে রফিউদ্দিন আহ্মদ একই সৈয়দ আহ্মদের নামোল্লেখ করে তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এ-কারণে যে তাঁর *নবী বংশ* গ্রন্থে "পয়গম্বর মুহম্মদের নাম রাখা হয়েছে" হিন্দু অবতারদের পাশাপাশি "পয়গম্বরদের একটি তালিকায় অন্যতম নাম হিসেবে"। তিনি শেষে বলেছেন : "নিশ্চয় এটা খুব ঐস্লামিক কাজ হয়নি।" আমি এমন কথা বলতে পারি না যে আহ্মদ মুসলিম বাংলার ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পর্কে আমার গবেষণা বিষয়ে অবহিত নন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না কী কারণে পূর্ব-ঔপনিবেশিক মুসলিম বাংলা সংক্রান্ত তাঁর এই প্রথম বড় আলোচনায়– এমনকি তাঁর গ্রন্থপঞ্জীতেও– আমার গবেষণা-কর্ম তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়নি। আমি যে-যুক্তিরাজি খাড়া করতে চাইছি তার প্রেক্ষিতে যে-বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে বাংলায় সংস্কারপূর্ব ইসলামের বিষয়ে রফিউদ্দিনের অভিমত অনেকাংশেই "ইসলামের আগমনের পূর্বেকার" "গণমুখী" বা "লৌকিক" বিশ্বাসের গতানুগতিক ধারণার কাছাকাছি।

দেখা যায় বঙ্গীয় ইসলামের এই "বিপথগামী" প্রকৃতি বোঝাতে মোটামুটিভাবে দু-ধরনের যুক্তি হাজির করা হয়। "অসম্পূর্ণ ধর্মান্তরণ" বা "আধা-ধর্মান্তরণ"-এর তত্ত্বের প্রকৃতি "লৌকিক ইসলাম"-এর তত্ত্বের বেশ খানিকটা অনুরূপ– দুটিতেই দেশীয় ধর্মান্তরিতদের সাংস্কৃতিক কৃতির মান ও সীমাবদ্ধতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়। পক্ষান্তরে, "অবক্ষয়ের" তত্ত্বে খুবই ভিন্ন এক ধরনের যুক্তি দেখা যায়। কিন্তু যুক্তিশাস্ত্র বা ইতিহাসের নিরিখে এ-দুটি ব্যাখ্যার কোনোটিই ধোপে টেঁকে না।

প্রথমত, অসম্পূর্ণ ধর্মান্তরণ ও নির্জীবণের যুক্তি পরস্পরবিরোধী। যে-পরিস্থিতি আগে থেকেই অপর্যাপ্ত বা "অসম্পূর্ণ" বলে বিবেচিত, তা থেকে নির্জীবণ দেখা দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া, "আধা-ধর্মান্তরিত", "আদমসুমারি মুসলমান" বা "নামেই মুসলমান" ইত্যাদি অভিধার ব্যবহার ঘটলে সারস্বত কর্মে মূল্য-বিচারের স্থান সম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়। কোনো মুসলমানকে ঠিক মুসলমানের চেয়ে ছোট করে দেখা এক মূল্য-বিচার– এটা যে-মানুষ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয়

দেয় এবং সে-ধর্মকে আপন বলে মনে করে তার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান হওয়া বলতে কী বোঝায় তার বিশ্লেষণ নয়। কোনো বিশ্বাসীর ধর্মপ্রাণতার প্রকৃতি ও গভীরতা নিয়ে এমন মত প্রকাশ সারস্বত বস্তুনিষ্ঠার পরিবর্তে ধর্মীয় অবস্থানের বেশি কাছাকাছি। ধর্মীয় জীবন একটা জটিল সমগ্র– অসংখ্য ও বিচিত্র দ্রব্যে পূর্ণ একটা ঝোলার মতো; সেসব দ্রব্য নেয়া হয়েছে তাদের জটিল ও বৈষম্যময় উৎস অর্থাৎ জীবন থেকেই। এবং অনেকটা "জীবনের বুনটের" ধাঁচেই তার তলায় রয়েছে ঐক্য, সামঞ্জস্য এবং উদ্দেশ্য যা পরিণামে ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের মনেই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শেষ কথা, বাংলায় ইসলামের "অবক্ষয়ের" তত্ত্বের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুতর আপত্তি হল এই যে এ-তত্ত্ব স্পষ্টতই অনৈতিহাসিক। ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা থেকে মনে হতে পারে যে বাংলায় সাধারণ মুসলমানরা যে-ইসলামের অনুসরণ করতেন মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির বছরগুলোতে তা সে-দেশের অতীত দিনের ইসলাম থেকে ভিন্ন ছিল। এমন প্রমাণও নেই যে তথাকথিত "বিকৃত", "অবক্ষয়িত" এবং "হিন্দুঘেঁষা" ইসলাম– উনিশ শতক থেকে শুরু করে ঐস্লামিক পুনরুজ্জীবনবাদী ও সংস্কারবাদীরা যার বিরুদ্ধে নেমেছিলেন– অতীতে কোনো সময়কার বাংলার কোনো স্বর্ণযুগ বা ধ্রুপদী যুগ থেকে কোনো বিরাট প্রভেদ সূচিত করত। বরং, মুখ্যত ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে, প্রাচীনতম বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য থেকে স্পষ্টতম প্রমাণ মেলে যে বাংলায় বহুসংখ্যক ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন যাঁরা মাতৃভাষা বাংলায় সহজলভ্য স্থানীয় লৌকিক অ-মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে তখনও ডুবে রয়েছেন। তাঁরা ভাষার অন্তরায়ের ফলে ঐস্লামিক ঐতিহ্যের আরবি-ফার্সি উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, এবং মাতৃভাষা বাংলায় এমন ঐতিহ্য তাঁদের কাছে না থাকার ফলেই এটা ঘটেছিল। প্রাচীন মুসলিম বাংলা সাহিত্যের রচয়িতারা নিজেরাই ঐস্লামিক ঐতিহ্যকে এক সমন্বয়বাদী ছাঁচে ফেলে তাঁর নবরূপ দানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

সমন্বয়বাদ ও ইসলামিকরণের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপকতর প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে "ঐস্লামিক" সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য নির্মাণের প্রশ্নটি হল আমার গবেষণার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যার মর্ম এখনও পর্যাপ্তরূপে অনুধাবিত হয়নি। সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের অর্থ সঠিকভাবে নির্ণয় ও স্পষ্টীকরণ ব্যতীত সমন্বয়বাদ ও ঐস্লামিকীকরণের পারস্পরিক সমন্বয়বাদী সম্পর্কের প্রশ্নটি বিচার করা সম্ভব নয়। আমার গবেষণায় সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেটাই আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে বিশুদ্ধতাবাদীর দৃষ্টিতে ইসলামের সমন্বয়বাদী পরিবর্তন সাধারণত অপছন্দ করা হয়, কারণ মনে করা হয় এটা ঐস্লামিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিকূল। সমন্বয়বাদী বিশ্বাস ও আচারাদি সম্পর্কে একটা ঢালাও ও ব্যাপক ধারণার মধ্যেই সাধারণত এই প্রতিকূল মনোভাবের শিকড়

প্রোথিত– এমন বিশ্বাস ও আচারাদিকে দেখা হয় বিশেষ দেশের ধর্মান্তরণ পর্বের পূর্বেকার সাংস্কৃতিক উপস্তরের শুধু কিছু "অবশেষে", "ভগ্নাবশেষ" বা "বেঁচে-থাকা অংশ" হিসেবে। আমার গবেষণায় উপস্থাপিত সমন্বয়বাদী পরিবর্তন ও ঐতিহ্য কিন্তু এদেশে ইসলামের আগমনের আগে থেকে প্রচলিত "যুক্তিহীন", "সর্বপ্রাণবাদী" এবং "কুসংস্কারমূলক" লৌকিক বিশ্বাস ও আচারাদির পাঁচ-মিশেলি নয়। ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত অভিযোজন প্রক্রিয়া আমার গবেষণায় বাঙালি মুসলমান সাংস্কৃতিক মেলকদের "সচেতন" প্রয়াস হিসেবেই দেখা দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে সাংস্কৃতিক উপস্তর ও তার অবশেষ সংক্রান্ত বদ্ধমূল মতের সমর্থন মেলে না। ইমতিয়াজ আহ্মদের ভাষায় :

> ... ঐস্লামিকীকরণ প্রক্রিয়া বলতে বোঝা হয় যেসব সমন্বয়বাদী উপাদান ধর্মান্তরণের পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি-নীতির অবশেষ হিসেবে বহাল রয়েছে তাদের সচেতন পরিহার।

রিচার্ড ইটন "রায়ের মেলকরা" খুবই সচেতনভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে "তাঁদের সমন্বয়ের পাঁচন" তৈরি করায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন এ-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন :

> সম্ভবত রায়ের উল্লেখিত অধিকাংশ গ্রন্থাদিতে ততটা সচেতন নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেনি ... যতটা ঘটেছে একটা খাঁটি বাঙালি মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার উপস্তরের বিদ্যমানতার।

স্বভাবতই সব বাঙালি, অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর লোকের মতোই, তাঁদের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক অতীত থেকে অনেক কিছুই ধারণ করে রেখেছিলেন। মধ্যযুগীয় বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয় আছে তেমন ব্যক্তিমাত্রই জানেন ওই জনগোষ্ঠীর লোকেরা যেসব বিশ্বাস, কুসংস্কার ও আচারাদি পোষণ করতেন তাদের প্রভাব কতটা ব্যাপক ছিল। মধ্যযুগীয় বাংলার প্রচলিত বিশ্বাস ও আচারাদির সাধারণ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এসব ঘটনাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা তাদের অন্বেষণ এর কোনোটাই আমার গবেষণার লক্ষ্য ছিল না। আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল মেলকদের সাহিত্যিক প্রয়াসের মধ্যে এমন দেশজ উপাদানের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যা অগণিত বাঙালি মুসলমানের ঐস্লামিক সচেতনতা পরিপোষণে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করে ও মাতৃভাষা বাঙলার মাধ্যমে পুনর্নির্মিত ঐস্লামিক ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মুসলমানের আনুগত্য অর্জনের সহায়ক হয়। এ-পুনর্নির্মাণে তাঁরা পরিচিত লৌকিক সমন্বয়বাদী রূপ ও প্রতীকগুচ্ছের সাহায্য নিয়েছেন। আমার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল বাঙালি মুসলমানের জন্য অমুসলিম ঐতিহ্যের সমান্তরাল একটি "ঐস্লামিক" ঐতিহ্যের "পরিকল্পিত" নির্মাণ ও সৃজন। আবার আমার গবেষণার আওতা থেকে

"অমুসলিম" সমন্বয়বাদী আচারাদিকে বাইরে রাখার কারণও এটাই, যদিও তাদের মধ্যে– যেমন বাউলের মধ্যে– মুসলমানরা বড় মাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। হয়তো "আমার মেলকদের" উদ্দেশ্যের মতোই আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটিও ছিল সীমিত ও নির্দিষ্ট। আমার আলোচিত সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যটি বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের– ধর্মীয় ও ইহবাদী উভয় গোষ্ঠীর– এক অংশের হৃদয় ও মনের সুচিন্তিত উদ্দেশ্যপূর্ণ সঞ্চালনে গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যের যে বিপুল ভা-ার তাঁরা রেখে গেছেন তার মধ্যেই আমরা তাঁদের প্রয়াস ও কৃতির প্রকৃতি ও সুফল দেখতে পাই।

এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতেই সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য ও বাংলায় ঐস্লামিকীকরণ প্রক্রিয়ার যোগসূত্রটি আমরা দেখতে পারি, তার মূল্য উপলব্ধি করতে পারি। বাংলার অমুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ধর্মান্তরিতরা পরেও ডুবে থাকতেন বলেই মুসলিম বিদ্বৎসমাজ এমন একটি ঐতিহ্য নির্মাণে বাধ্য হয়েছিলেন যা বাঙালি মুসলমানরা আপন বলে গ্রহণ ও দাবি করতে পারতেন। সৈয়দ সুলতান এই বলে দুঃখ করেছেন যে "ঘরে ঘরে" বাঙালি মুসলমানরা মাতৃভাষা বাংলায় তুলনীয় মুসলিম বিকল্পের অভাব হেতু হিন্দু মহাকাব্য *মহাভারত* ও *রামায়ণের* শরণ নিতেন। এ-কারণেই তিনি মুসলমানদের মনোযোগ হিন্দু মহাকাব্য, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য থেকে সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে তাঁর মহাগ্রন্থ *নবীবংশ* রচনায় তৎপর হয়েছিলেন। মুহম্মদের সাধনাকে সমর্থন করতে গিয়ে কৃষ্ণ-কাহিনীর সূক্ষ্ম ও উদ্দেশ্যপূর্ণ অদলবদল ও তার আদলে কিছু নতুন কাহিনী রচনার মধ্যে বাঙালি মুসলমানের জন্য এক লৌকিক ও অর্থপূর্ণ ঐতিহ্য নির্মাণে মেলকদের "আত্মসচেতন ও পরিকল্পিত" ভূমিকার স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দেখলে বাংলায় ইসলামের সমন্বয়বাদী পুনশ্চিত্রণ এদেশে ঐস্লামিকীকরণের অগ্রগতির এক আবশ্যিক স্তর রূপে পরিস্ফুট হয়। এ-ঐতিহ্য কয়েক শতক ধরে সাধারণ বাঙালি মুসলমানের, ও অন্য বাঙালি মুসলমান যাঁরা মেলকদের বিশ্ববীক্ষা ও মূল্যবোধের সামিল ছিলেন তাঁদেরও, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উপলব্ধিকে প্রভাবিত করেছে। উনিশ শতকেই প্রথম এই সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য এবং ঐস্লামিক পুনরুজ্জীবন ও শোধন আন্দোলনের মধ্যে প্রতিকূলতা দেখা দেয়। উক্ত আন্দোলন দ্বারা সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নিন্দিত হয় এবং অনৈস্লামিক ভাবনা দমনের আহ্বান আসে। আজ এ-কথাটা সুবিদিত যে পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের আক্রমণ ও তার প্রভাব সমন্বয়বাদী মূল্যবোধকে বাঙালি মুসলমানের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত বা স্থানচ্যুত করতে অনেক দিন পর্যন্ত পারেনি, হয়তো কোনোদিনই পারেনি। সে যাই হোক, পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রতিকূলতার পূর্ব পর্যন্ত সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য একটা বড় ঐতিহাসিক প্রয়োজন

মিটিয়েছে বাংলায় ইসলামের প্রসারের কাজে। তাই এ-ঐতিহ্য ইসলামিকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া না হয়ে বাংলায় তার ঐতিহাসিক বিকাশে এক আবশ্যিক পর্যায় রূপে দেখা দিয়েছিল। সমন্বয়বাদ দেশে ঐস্লামিকীকরণ প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকল পরবর্তীকালের পুনরুজ্জীবনবাদী, সংস্কারবাদী ও মৌলবাদী অবদানের মতোই।

দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যে একটা "ঐস্লামিক লক্ষ্যের" সচেতন পরিপোষণ অনুরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে সুসান বেইলি'র (Susan Bayly)-র তামিল এলাকা সংক্রান্ত গবেষণায়। তামিল সমুদ্রোপকূলবাসী মানুষদের ব্যাপক সমন্বয়বাদী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তিনি সঠিকভাবেই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে "এরা হিন্দু নয়, ধর্মান্তরিত মানুষ"। তিনি আমাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করেছেন যে "মুসলিম ও খ্রিস্টীয় উপাসনাগৃহ, তা যতই মহামিলনের প্রতীক হোক না কেন", সেখানে ভক্তরা "একটা পৃথক ধর্মীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেছে, এক যৌথ ও অভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রবলভাবে আচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও"। তিনি তাদের "উপকথার" উল্লেখ করেছেন যেখানে "হিন্দু শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিজয় বর্ণনা করতে গিয়ে হিন্দু শব্দাবলি ও ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে"। তিনি উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে "বিষয়টি একদিক যেমন ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতিকূলতার সূচক তেমনি অন্যদিকে সাধারণ কিছু মূল্যবোধ ও মতের প্রতি নিষ্ঠারও পরিচায়ক"। এই অভিযোজন প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক উপস্তরের অবশেষ মাত্র হওয়ার পরিবর্তে পরিকল্পিত ও "সচেতনভাবে" ঘটানো সম্ভব ছিল বরং তা-ই ঘটেছিল।

একদিকে বাংলার "ঐস্লামিক সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের" ধারণার অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত বোধগম্যতা ও স্বীকৃতির অভাব রয়েছে; অন্যদিকে আছে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়– যার ফলে বাংলাদেশের আবির্ভাব–সম্পর্কিত ইতিহাস রচনার উপাদানরূপে একে ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধিতে ব্যর্থতা। মুসলিম বাংলার ইতিহাস রচনার সমকালীন উদ্যোগে এসব প্রশ্নের আলোচনা স্পষ্টতই অভীপ্সিত।

পাঁচ.

ঐস্লামিক পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার: সমষ্টিগত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সচেতনতার লক্ষ্যে

বাঙালি মুসলমানের পরিচয় বিকাশের পরবর্তী পর্বের বিষয় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এক সমষ্টিগত সচেতনতার বৃদ্ধি। একে দুটি মুখ্য পর্যায়ে দেখা যেতে পারে– প্রথম পর্যায়ে এক "ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের" উদ্ভব ঘটেছে, দ্বিতীয়টিতে ঘটেছে এক "রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের" উদ্ভব। এই দুটি পর্যায়ের কোনোটিই উপরে আলোচিত প্রারম্ভিক পর্বের মতো উপেক্ষিত হয়নি। দুই পর্যায়ের মধ্যে প্রথমটি,

অর্থাৎ এক সমষ্টিগত মুসলিম ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উদ্ভব ও বৃদ্ধি, অত্যন্ত সীমিত-সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকার ভিতর ভাসাভাসা-ভাবে আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে শেষ পর্যায়, অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের "রাজনৈতিক সম্প্রদায়" হিসেবে আবির্ভাবের পর্যায়, বহুসংখ্যক গবেষণার বিষয় হয়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসেছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে দ্বিখ-িত বাংলার দুদিক থেকেই। বিষয়টির বিশালতা ও আমার নিবন্ধের সীমিত পরিধির কথা মনে রেখে আমি প্রথম পর্যায় নিয়েই একটু গভীরভাবে আলোচনা করতে চাই। অংশত এই কারণে যে প্রথম পর্যায়টি অপেক্ষাকৃত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল, আর আমার যা বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল, সেই প্রারম্ভিক প্রস্তুতি-পর্বের সঙ্গে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রশ্ন বেশি প্রত্যক্ষভাবে এবং গভীরভাবে জড়িত– অংশত এই কারণেও। আর বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভাব, যার ফলে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হল, তা নিয়ে ঐতিহাসিক পুস্তক-প্রবন্ধের প্রাচুর্য হেতু আমি "রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের" লক্ষ্য নিয়ে গতানুগতিক বিবরণের বহুমানুষের-হাঁটা পথ এড়িয়ে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক অভিযাত্রার কিছু স্বল্প পরিচিত পথের উপর আলোকপাত করতে চাই।

উনিশ শতকে সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য নবজাগ্রত শুদ্ধিবাদী ও মৌলবাদী শক্তিগুলোর দিক থেকে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়– বাংলার ভিতরে এবং বাইরেও। এসব আন্দোলনের সূত্রপাত খুঁজতে হলে তৎকালীন বাংলার পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকাতে হবে, তেমনি তাকাতে হবে এতদঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর মুসলিম জগতের দিকে। মইনুদ্দিন আহ্মদ খাঁ এবং রফিউদ্দিন আহ্মদ উভয়েই বাংলার ইতিহাসের দুটি ভিন্ন পর্যায়ের মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রথম জন আলোচনা করেছেন উনিশ শতকের প্রথম ভাগ নিয়ে, আর দ্বিতীয় জন করেছেন উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের প্রারম্ভিক অংশ নিয়ে। বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নির্মাণের ইতিহাসের দিক থেকে উনিশ শতকী ঐস্লামিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনসমূহের গুরুত্ব অসীম; বস্তুত বিষয়টি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

এসব গবেষণা কয়েকটি মৌল অনুসন্ধানের শক্ত ভিত্তিকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত হলেও নিবিড় পরীক্ষায় গবেষকদের যুক্তির পরিচ্ছন্নতা ও সামঞ্জস্যতা নিয়ে কিছু গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। তাঁদের অন্যতম সারস্বত উদ্দেশ্য– বাংলায় সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অভিঘাত নিরূপণ, বিশেষ করে এই অঞ্চলে মুসলিম পরিচয়ের বিকাশে তার তাৎপর্য– এর ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তাঁরা সমস্যাটি আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন। বর্তমানকালের প-িত সমাজে

যে বিষয়টি সম্ভবত সর্বাধিক সারস্বত আগ্রহের উদ্রেক করে তা হল বিভিন্ন সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে ইসলামের প্রাধান্য নির্ণয়– এসব আন্দোলনকে আমাদের লেখকরা সুবিধার জন্য ধর্মীয়/আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এইভাবে বিভক্ত ও শ্রেণিভুক্ত করেছেন। অধিকাংশ গবেষণাতেই এসব আন্দোলনের ধর্মীয় গুরুত্ব কোনো না কোনোভাবে স্বীকার করা হয়, যদিও তার কোনো পর্যাপ্ত 'ব্যাখ্যা' বা 'বিশ্লেষণ' এই রচনাসমূহে বিশেষ পাওয়া যায় না। যেসব অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তা সাধারণভাবে, এবং হতাশাজনকভাবে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং মামুলি ধাঁচের। এসব সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের খানিকটা রূপরেখা দিলে সুবিধা হতে পারে। তথাকথিত ওয়াহাবি বা তরিকাহ্-ই-মুহম্মদিয়াহ্ আন্দোলন সম্পর্কে জগদীশনারায়ণ সরকার বলেছেন : "একটা ধর্মীয় শক্তি হিসেবে এ-আন্দোলন ভারতীয় মুসলিম সমাজের ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।" ফরাইজিদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

> তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনা দ্বারা শরিয়ত উল্লাহ্ বাংলায় ইসলাম ধর্মকে তার হতবিহ্বল অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ... এই হাজি দেখতে পান ইসলাম রয়েছে বিশ্বাসবারির অভাবে এক মুমূর্ষু অবস্থায় ... কিন্তু তিনি বিশ্বাসের তরুটিতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেন ...। এখানেই ছিল তাঁর অবদান ... প্রায় অর্ধশতক ধরে বাংলায় ধর্মীয় জীবনে কিছু স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের পর এর গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

"আন্দোলনের তাৎপর্য"-শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন :

> ...এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার আন্দোলনগুলো ... বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। অনেক ক্ষেত্রেই এটা ছিল ব্রিটিশ শাসকগণ কর্তৃক মুসলিম জনসাধারণের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এভাবে ধর্মীয় সংস্কার একটি বহুমুখী কর্মকা- হয়ে দাঁড়াল– সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক।

আজিজুর রহমান মল্লিক "রাজনৈতিক লক্ষ্য", "ধর্মীয় লক্ষ্য" ও "আধ্যাত্মিক লক্ষ্য" এ তিনটির মধ্যে প্রভেদ নির্দেশ করেছিলেন। তিনি বলেন : "(পুনরুজ্জীবনবাদী নেতাদের) অনুগামীদের অধিকাংশ এসেছিলেন সমাজের নিম্নতর বর্গ থেকে।" সমাজের তৎকালীন ব্যবস্থায় অসন্তোষের ফলে এবং দুর্দশা মোচনের কোনো পথ না পেয়ে, ধর্মের নামে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারিত হচ্ছিল তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়।

এ-বিষয়ে প্রধান দুই লেখক মুইনুদ্দিন আহমদ খাঁ ও রফিউদ্দিন আহ্মদ-এর মধ্যে পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ধর্মীয় তাৎপর্য উপলব্ধিতে মৌল প্রভেদ দেখা যায়।

খাঁ এগুলোকে ধর্মীয় আন্দোলন বলে গণ্য করেছেন এবং এদের সাফল্য বিচার করেছেন "আধ্যাত্মিক" ও "রাজনৈতিক" উভয় দিক থেকে। তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> ... উনিশ শতকের ঐস্লামিক পুনরুজ্জীবনবাদ ছিল মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে এক পরম প্রয়াস এবং এ-প্রয়াস হয়েছিল ইসলামের আদি শিক্ষানুযায়ী মুসলিম পথ ও মতের পুনঃপ্রণয়নের মধ্য দিয়ে। এই উদ্যোগে সংস্কারক গোষ্ঠীগুলো জনগণের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সচেতনতা জাগাতে বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন। ... সংস্কারপন্থীরা জনগণের ভিতরে বিপুল উৎসাহ সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন, আর জনগণও পুনরুজ্জীবনবাদ সফল হলে তাঁদের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে এমন আশা পোষণ করতেন।

পক্ষান্তরে রফিউদ্দিন আহ্মদ শুধু একটি বিপরীত অবস্থানই গ্রহণ করেননি, সে-অবস্থান সময় সময় খানিকটা বিভ্রান্তিকর বলেও মনে হয়। তিনি এমন একটি অবস্থান সমর্থনে আগ্রহী বলে মনে হয়েছে যাতে আন্দোলনের ধর্মীয় তাৎপর্য ন্যূনতম গুরুত্ব পেয়েছে, তাঁর মতে ঐস্লামিকীকরণের সাধারণ ধর্মীয় উদ্দেশ্যটি বিশেষ বা একেবারেই সাধিত হয়নি। তিনি লিখলেন :

> তাঁরা (পুনরুজ্জীবনবাদীরা) তাঁদের মুখ্য কাজে, অর্থাৎ আত্মার ঐস্লামিকীকরণে, সফল হয়েছিলেন কিনা সে-বিষয়ে সংশয় আছে; কিন্তু তাঁরা আত্মার সামাজিক জগতের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন।

একজন ইতিহাসবিদ্ "আত্মার" গুণাগুণ বিচারে সমর্থ কিনা বা এটা তাঁর পক্ষে করা প্রত্যাশিত কি না এমন প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সচেতনতার কোনো পরিবর্তন সাধন ছাড়াই তার "সামাজিক জগতের" রূপান্তর ঘটানো সম্ভব ছিল কি না এটা ভাবার বিষয়। নিচের উদ্ধৃতি থেকে এটা আরও বেশি করে প্রতিভাত হবে যে "ধর্মীয়" দিকটিকে অবহেলা করে "সামাজিক" দিকটিকে আহ্মদ বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন :

> সংস্কারপন্থী উদ্যোগের সামাজিক ভিত্তির মধ্যে বাঙলার সাধারণ মুসলমানদের ঐস্লামিকীকরণের ব্যর্থতার আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভূমিহীন চাষি বা দুঃস্থ তন্তুবায়ের কাছে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক অনেকটাই অর্থহীন মনে হয়েছে, এমনকি যখন তারা ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক উভয় লক্ষ্য নিয়েই এসব আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তখনও। সংস্কারপন্থী মঞ্চটি প্রারম্ভে তাদের কাছে এসেছিল এমন একটি জমায়েতের জায়গা হিসাবে যেখান থেকে দীর্ঘদিনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের

অভিযোগ ব্যক্ত করা যায়; মৃত্যুর পর স্বর্গে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা একটা উপরি পাওনা হিসেবে তাদের কাছে মনে হয়ে থাকতে পারে।

অন্য এক স্থানে আহ্‌মদ পুনরুজ্জীবনবাদীদের আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে তাদের ধর্মীয় সংস্কার কর্মসূচি থেকে পৃথক করে দেখেছেন এবং যুক্তি খাড়া করেছেন যে "প্রথম পর্বে আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের তুলনায় অনেকটাই অগ্রাধিকার পেয়েছিল", এবং এটাও বলেছেন যে "গুরুত্বারোপের" এই পরিবর্তনের ফলে তাদের ধর্মীয় কর্মসূচিগুলোতে বড় ধাক্কা লাগে"।

উপরে যে-লেখকদের কথা বলেছি, আহ্‌মদ সহ তাঁদের অধিকাংশই মনে হয় ঐস্লামিক পুনরুজ্জীবনের বহুমুখিতার তলায় যে অনুপেক্ষণীয় ঐক্য রয়েছে তার শুধু একটা খ-িত রূপ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁরা তাঁদের এই খ-িত অবস্থানে পৌঁছেছেন ইসলামের এই মৌল সত্যকে উপেক্ষা করে যে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক এ-দুয়ের ভিতরে এক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। আহ্‌মদ নিজেই যে "সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের" প্রশ্ন তুলেছেন, তা ইসলামের এক মৌলিক বিচার্য বিষয়। যদি আহ্‌মদের মতানুযায়ী "সংস্কারপন্থী প্রচারকরা মুসলমান কৃষককুলের দারিদ্র্যকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে কাজে লাগিয়ে থাকেন" বা যদি, সরকার যেমন বলেছেন, "সরল ও নিপীড়িত কৃষককুলের মধ্যে (লোভী জমিদারদের) জুলুমের নিন্দাবাদ প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চার করে থাকে বা বিপুল আকর্ষণের বিষয় মনে হয়ে থাকে", তা হলে পুনরুজ্জীবনবাদী ও সংস্কারকদের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনে শুধু শাস্ত্রের বাণী উচ্চারণই যথেষ্ট হত।

বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নির্মাণ ও তার বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের পরিবর্তনশীল উপলব্ধিতে এসব সমন্বয়বিরোধী মৌলবাদী আন্দোলনের অভিঘাত এবং এ-ব্যাপারে সমাজের উচ্চকোটির দায়িত্ব সম্পর্কে একটা সমালোচনামূলক মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। বাংলায় মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনসমূহের অভিঘাত সম্পর্কে অনেক স্পষ্টতর জ্ঞান অর্জন করা যায় এ-অভিঘাতের "সাংস্কৃতিক" ও "সমাজগত" দিকগুলোর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। দুটোই বাঙালি মুসলমানদের সমষ্টিগত ঐস্লামিক সচেতনতা গঠন ও দৃঢ়ীকরণে মিলিতভাবে কাজ করেছে এবং বাঙালি মুসলমানদের এক "রাজনৈতিক সম্প্রদায়" হিসেবে আত্মপ্রকাশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্‌শর্ত হিসেবে কাজ করেছে।

এসব পুনর্জীবনদায়ী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক অভিঘাতের যথার্থ মূল্যায়ন নানা কারণ ও পরিস্থিতির সমাবেশে কঠিন হয়ে পড়ে। পুনরুজ্জীবনবাদীরা স্বভাবতই তাঁদের অনুগামীদের সংখ্যা ও তাঁদের সাফল্য সম্পর্কে একটা অতিরঞ্জিত চিত্র

উপস্থাপিত করেছেন। কিছু মানুষ যেমন নানা চাপে পড়ে এসব আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হতেন, অন্য কিছু মানুষ, সক্রিয়ভাবে না হলেও, আবেগের দিক থেকে এসবের মধ্যে অংশ নিতেন। সরকারি সূত্রগুলো যে এ-ব্যাপারে অধিকতর সহায়ক এমনও নয়। এই নতুন সংস্কারক সম্প্রদায়গুলোর অনুগামীদের সংখ্যা সম্পর্কে আদমশুমারির তথ্য বাস্তব-সম্মত না-ও হতে পারে, কারণ জঙ্গি মনোভাবাপন্ন লোকেদের সরকার কর্তৃক কঠোর হাতে দমন এবং পরবর্তী সময়ে ১৮৬৯-৭০ সালের ওয়াহাবিদের বিচার এই নতুন গোষ্ঠীগুলোর অনেক সদস্যকে আদমশুমারি কর্মচারীদের কাছে তাদের সঠিক পরিচিতি প্রকাশে নিরুৎসাহ করেছে। অনুরূপভাবে, উইলিয়াম হান্টারের মতো ব্রিটিশ কর্মচারীগণ সিপাহি বিদ্রোহের পরের দশকগুলোতে ব্রিটিশ সরকার এবং উচ্চতর শ্রেণির ও শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন এবং মুসলমান জনসাধারণের ভিতরকার অসন্তোষ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাতে অত্যধিক আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। একইভাবে তৎকালীন ও তৎপরবর্তী কালের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এর সামগ্রিক অভিঘাত বিচার করা সম্ভব নয়। ১৮৪০ সালেই ইংরেজ জেমস টেলর (ঔধসবং ঞধুষড়ৎ) নিম্নবঙ্গের জেলাগুলোতে ফরাইজি আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয়েছিল। পক্ষান্তরে ১৮৮১ সালের আদমশুমারি কর্তৃপক্ষ "বাংলার অজ্ঞান ও উদাসীন মুসলমানদের মধ্যে" এসব আন্দোলনের সাফল্যের তেমন সম্ভাবনা দেখতে পাননি। আদমশুমারির এই মন্তব্যের উত্তর হিসেবে জেমস ওয়াইজ নামক পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জনৈক উৎসাহী পর্যবেক্ষক "হিন্দুদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-বিচারে" নিমজ্জিত নেতৃত্বহীন বাংলার আনুগত্যপ্রবণ মুসলমানদের মধ্যে এক "ঐস্লামিক" প্রাণসত্তা সঞ্চারের দিক থেকে এ-আন্দোলনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ-মত পরবর্তীকালের অনেক লেখকের মতের সঙ্গে মেলে, বিশেষ করে যাঁরা বাংলার মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয়ে লিখে গেছেন। এখানে বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আত্ম-প্রতিচ্ছবির এক বিপ্লবী ঐস্লামিক রূপান্তর ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

আমি বেশ পূর্বেই "ঐস্লামিক বিপ্লব" সম্পর্কিত দাবির দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। এর কারণ ছিল নানাবিধ সাহিত্য থেকে আরহিত বিচ্ছিন্ন তথ্যাদি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন ও মন্তব্য, প্রধানত বাংলা ভাষায় রচিত আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস, খ্রিস্টীয় মিশনারি উৎসসমূহ এবং কিছু "ঐস্লামিক বাংলা পুঁথি" সাহিত্য– যার সবই ছিল বর্তমান শতকের পুনরুজ্জীবনবাদোত্তর কালের বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রফিউদ্দিন আহ্মদের এতৎসম্পর্কিত সুষ্ঠু গবেষণা পুনরুজ্জীবনবাদী ও পরম্পরাবাদীদের মধ্যে বিরোধিতার প্রাণবন্ত বিরাটত্বকে স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত

করেছে। তাছাড়া আদি উগ্র সংস্কারপন্থী কর্মসূচির অনেকখানি রূপান্তর ঘটে– এটা ঘটে বিশেষ করে তা' য়য়ুনি (Ta'ayuni) আন্দোলনের বিস্তার এবং পরম্পরাবাদীরা নিজেরাই শেষে যে সব আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তার নমনীয় প্রভাবের ফলে!

এতৎসত্ত্বেও পুনরুজ্জীবনবাদীদের উদ্যোগের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৪১ সালেই কাজী আব্দুল ওদুদ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে "মুসলিম উপলব্ধির সার্বিক পরিবর্তন ও তজ্জনিত বাঙালি মুসলমানদের 'প্রাচীন যুগ ও নূতন যুগের' মধ্যে প্রভেদের কারণস্বরূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শর্তগুলোর তুলনায় পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলো অধিকতর কার্যকর হয়ে উঠেছিল"। ওদুদের মন্তব্যে বাঙালি মুসলমানদের ঐস্লামিক সচেতনতা গভীরতর করার কাজে পুনরুজ্জীবনবাদীরা যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার প্রতি স্পষ্ট অঙ্গুলি-নির্দেশ লক্ষ করা যায়। হয়তো এটাই পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী ফল। ঐতিহ্যাশ্রয়ী বাঙলায় "বহিরাগত" ইসলামের ন্যাসপালদের থেকে ভিন্ন পথে নব্য-পুনরুজ্জীবনবাদী নেতারা ইসলামের মধ্যে অনৈস্লামিক আচারদির বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ও অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে গেলেন এবং মৌল ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানালেন। ইসলামের এতদ্দেশীয় মূল ও আচার-আচরণের এমন অবিরাম ও অক্লান্ত হীনীকরণের ফলে মুসলমানরা বাধ্য হয়েই ব্যষ্টিগতভাবে এবং একটি আদি গোষ্ঠী হিসেবে সমষ্টিগতভাবে ইসলাম বলে তাঁরা যা বিশ্বাস করতেন এবং যার চর্চা করতেন সে-সম্বন্ধে বেশি সচেতন হয়ে উঠলেন। যদিও তাঁদের সামগ্রিক জীবনধারার সামান্যই "সংস্কার" ঘটল, প্রত্যেকের মধ্যেই মুসলমান হিসেবে আপন আচরণ ও অবস্থান নিয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষিত হল। ১৯১৯ সালে জনৈক বাঙালি মুসলমান সখেদে লিখলেন যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী হানাফিদের "প্রায় এক-চতুর্থাংশ" "নামাজ পড়ার বিষয়ে বিশেষ তোয়াক্কা করত না" এবং পুনরুজ্জীবনবাদীদের তুলনায় এদের ধর্মপ্রাণতাকে হেয় করে দেখালেন। প্রায় পঁচিশ বছর পরে, দু'জন বিশিষ্ট বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক "লৌকিক" ইসলামের "ক্রম-ক্ষীয়মাণতার" কারণ হিসেবে পুনরুজ্জীবনবাদী প্রচারক এবং "ঐস্লামিক বাংলায়" নতুন পুঁথি-লেখকদের মধ্যে তাঁদের অনুগামীদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই অনুগামীরাই ঐতিহ্যাশ্রয়ী ফকির-দরবেশদের মতো বিপথগামীদের "মাথা ফাটিয়ে দেয়ার" জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। লেখক দু'জন উপসংহারে লিখলেন :

> বাংলার গ্রামের শান্ত পরিবেশ ওয়াহাবি ও হানাফিদের দ্বন্দ্ব-বিবাদের ফলে বিঘ্নিত হল। এই আলোড়নের মধ্যে পড়ে সাধারণ মুসলমানরা যেন থই

হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁদের সকল শুভ অনুভূতিগুলোই যেন প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল।

নতুন ও বিকাশমান ঐস্লামিক সচেতনতা ক্রমাগত সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের প্রতিকূলতা করতে লাগল– এর স্পষ্টতম প্রতিফলন ঘটল সমৃদ্ধ ও কালোত্তীর্ণ সমন্বয়বাদী সাহিত্যকর্মের পরিমাণ ও গুণ উভয়েরই ক্রমাবনতির মধ্য দিয়ে। এর স্থান গ্রহণ করতে ঐস্লামিক পুঁথির একটা নতুন জাত, যার মধ্যে উর্দু ও বাংলা বাক্যরীতির এক ক্লেশকর পাচনের ব্যবহার ঘট, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে অধিকতর শিক্ষিত বাঙালিরা বেশি করে ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক ও বাদবিসংবাদ-ভিত্তিক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক ঐস্লামিক সাহিত্যের দিকে বেশি করে মুখ ঘোরালেন। এগুলো রচিত হত গতানুগতিক পদ্যে নয়, নব-বিকশিত আধুনিক গদ্যে। সমন্বয়বাদীরা যেন একই সঙ্গে তাঁদের মঞ্চ ও শ্রোতৃম-লী উভয়কেই হারালেন।

পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন গ্রামবাংলার মুসলমানদের সামাজিক জীবনেও একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে এল। গ্রামীণ ব্যবস্থায় হিন্দু জাত-পাতের মতোই পরম্পরাগতভাবে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত গ্রামের মুসলমানরা পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন ও প্রতি-আন্দোলনের ফলে তাঁদের বহুধাবিভক্ত সামাজিক জীবন থেকে রেরিয়ে এসে অন্য মুসলিম গোষ্ঠী ও লোকালয়ের সঙ্গে মেলামেশায় লিপ্ত হতে বাধ্য হলেন। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রিক উপাদান ছিল গ্রামের ক্ষমতাবান পুরোহিত-সদৃশ মোল্লাহ্ (মুল্লাহ)। পরম্পরাগতভাবেই গ্রামের মুল্লাহ ও পীর গ্রাম-বাংলার মুসলিম ধর্মীয় জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রথম জন ধর্মবিশ্বাসীদের "ধর্মীয়" আচার ও প্রার্থনা সম্পর্কিত প্রয়োজন মেটাতেন; দ্বিতীয় জন দেখতেন তাদের অধিকতর "আধ্যাত্মিক", গূঢ়, অতীন্দ্রিয় ও আবেগগত প্রয়োজনগুলো। গ্রামবাংলার ধর্মীয় উচ্চবর্গের এই দুই অংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাইতে পরিপূরণের ভূমিকা সম্বন্ধে সহমত থেকেই গ্রামীণ মুসলমান সমাজে ধর্মীয় ভারসাম্য রক্ষিত হত। যদিও গ্রামজীবনে পুনরুজ্জীবনবাদী আঘাত ও অনুপ্রবেশ মুল্লাহ্ ও পীর উভয়ের অবস্থানকেই সমানভাবে বিঘ্নিত করেছিল, তবু প্রথম জনই প্রত্যুত্তর ও প্রত্যাঘাতের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। পীরবাদের উপর আক্রমণের রূপ দাঁড়াল তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে এবং সবশেষে জনপ্রিয় কোনো পীর বা সন্তের মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘিরে অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব উর্স্ নিয়ে প্রশ্ন তোলা। মুল্লাহ্দের ফতিহাহ (ফাতেহা) পাঠের রীতি (অর্থাৎ সামাজিক ধর্মীয় সকল আচার-অনুষ্ঠানে কোরানের বিশেষ শ্লোক পাঠের রীতি) এবং মুল্লাহ্দের তত্ত্বাবধানে পয়গম্বর মুহম্মদের জন্মদিন (মিলাদ) অনুষ্ঠানের রীতি পুনরুজ্জীবনবাদীদের দ্বারা নিন্দিত হওয়ার ফলেও মুল্লাহ্দের মর্যাদার বড় এক বাস্তব আঘাত পড়েছিল। তাছাড়া

ভূতপ্রেত, কুনজর, অশুভ ইঙ্গিত, শুভদিন ইত্যাদিতে বহুপ্রচলিত বিশ্বাস, কবচ-তাবিজ, মাদুলি, মন্ত্রপড়া, ঝাঁড়ফুঁক ইত্যাদি মুল্লাহ ও পীর উভয়কেই একটা লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এই বিপদের সম্মুখীন হয়ে মুল্লাহ্‌রা পুনরুজ্জীবনবাদীদের সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস)-র ব্যবস্থা করতেন; সেখানে গ্রামের মুসলমানদের গতানুগতিক সামাজিক মেলামেশার এলাকার বাইরে থেকেও অন্য মুসলমানরা এসে দলে দলে যোগ দিতেন। প্রথম দিকে মুল্লাহ্‌রা নিজেদের আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু জনসমক্ষে বিতর্কমূলক আলোচনা এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুল্লাহ্‌দের মদতে প্রস্তুত বিতর্কমূলক রচনাদি গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব এবং সামাজিক দিক থেকে তাৎপর্যময় কৌতূহল-বোধ এবং নিজেদের বিষয়-আশয়ে আগ্রহ ও অংশগ্রহণের অভিপ্রায় জাগাতে পেরেছিল। তাছাড়া ঐস্লামিক সচেতনতা তীব্রতর করার উপর গুরুত্বারোপ একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছিল– ভিতরের দিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সংহতি বিধানের কাজ; আর বাইরের দিকে, মুসলমান সম্প্রদায় ও অমুসলমান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রভেদকে তীব্রতর করার কাজ। এসব পরিবর্তন পরবর্তীকালে শহরের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবের গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশের পথ সুগম করে দিয়েছিল। সে-প্রভাব সম্প্রদায়ের উপর একটি ধর্মীয় ঐক্যের কাঠামো চাপানোর সার্থক প্রয়াস চালিয়েছিল, চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সম্প্রদায়কে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা।

ছয়.

এক রাজনৈতিক সমষ্টি গঠনের পথে

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের আরম্ভে যে-কথাটা আমরা আগেই বলেছি, বাঙালি মুসলমানের পরিচিতির রাজনৈতিকীকরণ হল এই দীর্ঘ ও জটিল কাহিনীর তাত্ত্বিক দিক থেকে সবচেয়ে পর্যাপ্তরূপে আলোচিত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটির সাহায্যেই মনে হয় আমরা ঐতিহাসিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার থেকে আলোকে প্রবেশ করি। দেশভাগের পর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেই এই ক্ষেত্রটি নিয়ে পা-ত্যপূর্ণ প্রকাশনার একটি ক্ষীণ ধারা দেখা দিয়েছিল। তা-ই সত্তরের দশকে এক স্থায়ী স্রোতের রূপ নেয় এবং আশি ও নব্বইয়ের দশকে প্রায় এক প্রবাহিণীতে পরিণত হয়। আলোচনার প্রথম দিকে আমি চেষ্টা করেছি এসব প্রকাশনার মধ্যে কিছু স্পষ্ট নকশা আবিষ্কারের এবং দেশ-বিভাগের পরের প্রথম দুই দশকের প্রতিকূল রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক বাতাবরণের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানি লেখকদের উপর আরোপিত বাধানিষেধ নির্দেশ করেছিলাম। সীমান্তের অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গে, অবশিষ্ট ভারতে এবং

পাকিস্তানেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে আগ্রহ ও রচনাদির অভাবের কথাও আমি উল্লেখ করেছি।

বাঙলার মুসলমানদের একটি "রাজনৈতিক সমষ্টি" হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এক সমস্যা এবং এ-সম্বন্ধে সযত্ন বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিষয়ের বিশালতা, এ-সম্বন্ধে গবেষণার উপযোগী মালমশলার প্রাচুর্য এবং একটি নিবন্ধের সীমিত পরিধির কথা মনে রেখে আমি আগেই এ-বিষয় ও তার ঐতিহাসিক সাহিত্য নিয়ে একটা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক চর্চা এড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তৎপরিবর্তে আমার পক্ষে এ-বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়া এবং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বা অবহেলিত ক্ষেত্রগুলোর উপর অধিকতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সমীচীন হবে।

এ-শতকের তৃতীয় দশকের শেষ নাগাদ "ইসলামের" পতাকাতলে ভিন্ন ভিন্ন বাঙালি মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক একীকরণ অনেকাংশে সাধিত হয়েছিল। এ-প্রক্রিয়ার কয়েকটি পরিপূরক অংশ ছিল কলকাতা শহরের নানা মুসলিমদের, মফস্বলের মুসলিমদের এবং পরিশেষে সকল বাঙালি মুসলিমদের একীকরণ। কিন্তু এই রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটানোর কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? জন ব্রুমফিল্ড ও কেনেথ ম্যাকফারসন উভয়েই এই প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে একমুখী এক ধারা– মহানগর থেকে তার উপকণ্ঠে, শহর থেকে গ্রামে, কলকাতা থেকে মফস্বলে প্রসারমান ধারা– হিসেবে দেখার পক্ষপাতী। ম্যাকফারসনের দৃষ্টিতে : ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কলকাতার মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস ছিল "একটি বহিরাগত শহুরে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ইতিহাস", যে-গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ ও বর্ধমান সাম্প্রদায়িক আত্মসচেতনতার এক প্রক্রিয়া কাজ করেছে। এই মানসিকতা "শহরের সীমা পেরিয়ে প্রসারিত হয়ে মফস্বলের মুসলিমদেরও আচ্ছন্ন করেছে"।

এ-মত থেকে কিন্তু মহানগর কলকাতার ভূমিকা সম্পর্কে একটা অতিরঞ্জিত ও বিকৃত চিত্র পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় যে গুরুত্বপূর্ণ জমি প্রস্তুতের কাজ হয়েছিল সে-কাজকে ইতিহাসবিদের পক্ষে উপেক্ষা করা অনুচিত। ফরাইজি নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহ্ ও দুদু মিঞা এবং "ওয়াহাবি" নেতা তিতুমীর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলিম কৃষকসমাজের অভাব-অভিযোগ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, লড়াই করেছেন। শহরে মুসলিম রাজনীতিকরা বিষয়টির বিপুল সম্ভাবনা উপলব্ধি করার এবং পরে গ্রামের সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করার অনেক আগেই তাঁরা এটা করেছেন। প্রদীপ সিংহ ফরাইজি-প্রভাবিত এলাকাগুলো এবং সিপাহি-বিদ্রোহের পরবর্তী দশকগুলোতে সমষ্টিগত কৃষক

অভ্যুত্থানের প্রবণতার মধ্যে একটা সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। পুনরুজ্জীবনবাদীদের গড়া সাংগঠনিক এককগুলো শুধু গ্রামের মানুষদের গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ করার মূল্যবান অভিজ্ঞতাই যোগায়নি, যুগিয়েছে একটা সহজলভ্য ভিত্তিভূমি যা পরে মুসলিম সংহতি-আন্দোলনের ধর্মীয় ও রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে বাইরে থেকে যতটা মনে হয় বাঙালি মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিতে শহর-গ্রামের পারস্পরিক সম্পর্ক তার চাইতে অনেক বেশি জটিল। মইনুদ্দিন আহ্‌মদ খাঁ ও রফিউদ্দিন আহ্‌মদ বর্তমান শতকের পূর্বেকার মুসলিম বাংলার শহুরে ও গ্রামীণ অংশের মধ্যে স্পষ্ট করে সন্দেহাতীত সম্পর্ক-সূত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। গ্রামের মুল্লাহ্‌ অনেক ক্ষেত্রেই হতেন শহরের লোক; গ্রামের শরিফ অনেক সময়ই দুই জগতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতেন, শহরের উচ্চ বর্গের পশ্চিমি শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে বা কোনো পেশায় নিযুক্ত মুসলমানদের সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের কল্যাণে। অনুরূপভাবে, সমৃদ্ধ মুসলমান জোতদার, যিনি গ্রামের সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার কাজ অনেকটাই করে দিতেন, নির্ভরশীল ছিলেন শহর-গ্রামভিত্তিক আর্থ-সামাজিক শক্তিগুলোর এক জটিল মিশ্রণের উপরে। একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও শহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কও থাকত। এসব যোগসূত্রই পরিশেষে মুসলিম বাংলার শহর ও বিশাল গ্রামাঞ্চলে মেলবন্ধন ঘটানোতে সহায়ক হয়েছিল। তার পূর্ব পর্যন্ত প্রধানত উর্দুভাষী, অবাঙালি-মনোভাবসম্পন্ন মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত কলকাতা শহরের মুসলিম জীবনধারায় প্রাধান্য ছিল মুঘল ও অভিজাত ও ধনী আশরফ জমিদার, সরকারি কর্মচারী, পেশাদার মানুষ এবং বণিক উচ্চবর্গের এক বিচিত্র গোষ্ঠীর। সে-জীবনধারা বিরাট গ্রামীণ জেলাগুলোর জীবনধারা থেকে প্রায় পৃথক একটি খাত বেয়ে চলত বলে মনে হত।

এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংহতি বিধানের কাজে উল্লিখিত যোগসূত্রগুলোর যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা ব্রুমভিল্ড, রজত রায় ও রফিউদ্দিন আহ্‌মদ ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামের ভদ্রলোকরা এবং শহরের পশ্চিমি শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী ও পেশাদারদের মধ্যে সামাজিক অভিন্নতা ও সম্পর্ক গ্রামের মুল্লাহ্‌ গোষ্ঠী ও শহর-গ্রামের ফকির-দরবেশদের সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও মতবাদগত সৌভ্রাত্র্যের মতোই সাম্প্রদায়িক সংহতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনৈতিক ভাব বিনিময়ের এই উন্মেষশীল ব্যবস্থায় মুল্লাহ্‌ নায়কের ভূমিকায় এলেন, ঠিক যেমন গ্রাম-শহরের সামাজিক-ধর্মীয় সমিতি (আঞ্জুমান)গুলো এর প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র হিসেবে প্রাধান্য পেল। মফস্বলের আঞ্জুমানগুলো প্রায়শই শহরে শিক্ষিত কর্মচারী ও পেশাদারদের গ্রামীণ ভদ্রসমাজ, সমৃদ্ধ চাষি ও মুল্লাহ্‌দের একটি

সাধারণ মঞ্চে মেলাবার কাজ করেছে। এ-ভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী মুল্লাহ্ ও জোতদারদের মাধ্যমে আঞ্জুমানগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষদের কাছে তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তব্য বেশ কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ঐস্লামিক ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও সাহিত্যিক অগ্রগতির কাজ তত্ত্বাবধান ও তার বাস্তব সহায়তা বিধানে আঞ্জুমানগুলোর অবদান অপরিসীম। 'নসিহৎনামা' বলে পরিচিত ঐস্লামিক বাংলায় লেখা স্বল্পমূল্যের জ্ঞানদায়ী ও প্রচারমূলক ধর্মীয় পুস্তকের একটা ঢল মুসলমান জনসাধারণকে প্লাবিত করে দিয়েছিল।

পূর্ব-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক শতকগুলোতে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে এমন 'নসিহৎনামা'র ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আহ্মদের ধারণা স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ। গতানুগতিক ধারার উপদেশমূলক সাহিত্য বাংলায় রচিত একগুচ্ছ প্রামাণিক ধর্মীয় আচার বা প্রার্থনায় নিত্যব্যবহার্য পুস্তিকার বেশি কিছু ছিল না, যেমনটি পাওয়া যেত অন্যতম ভাষাতেও। দু-ধরনের সাহিত্যকে পরিমাণ ও গুণবত্তা উভয় দিক থেকেই স্পষ্টভাবে পৃথক করা সম্ভব ছিল। গতানুগতিক 'নসিহৎনামা'র সম্ভার ছিল অনেক ক্ষুদ্রতর– শুধু পরবর্তী কালের সমরূপ সাহিত্যের তুলনায়ই নয়, ঐতিহ্যাশ্রয়ী বাংলায় মুসলিম বাংলা সাহিত্যের সামাজিক ও বিপুল সম্ভাবের তুলনায়ও বটে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সাহিত্যে– যার উদ্ভব প্রধানত উনিশ শতকে– যে গোঁড়ামি, উন্মাদনা ও অধৈর্য লক্ষিত হত তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল গতানুগতিক সাহিত্যে। এ-প্রসঙ্গে এটা অর্থপূর্ণ যে উনিশ শতকের প্রথম দিককার একটি পুনরুজ্জীবনবাদী গ্রন্থে– *তাকওয়াৎ-উল-ইমান*-এ– মুসলিম জীবনধারায় সংস্কারের আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাংলার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এক রচনায় এর প্রবল বিরোধিতা করা হয়।

অধিকতর শিক্ষিত মানুষদের জন্য সাধু বাংলা গদ্যে ঐস্লামিক ধর্মীয় ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক রচনার এক পরিশীলিত রূপ উপস্থাপিত করা হয়েছিল। নতুন শতকের আরম্ভে এই উন্মেষশীল ঐস্লামিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচিতির বোধে উদ্বুদ্ধ বেশ কয়েকটি মুসলিম সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয় বাংলার শহর এলাকায়। শহুরে ভ্রাম্যমাণ প্রচারকরা প্রায়শই আঞ্জুমানগুলোর উদ্যোগে বহু সংখ্যায় গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করতেন এবং ইসলামের ঐক্য (তৌহিদ) এবং সকল ধর্মবিশ্বাসীদের একতাবোধ (উম্মাহ্) প্রচারের উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে ধর্মোপদেশ (ওয়াজ-মাহ্ফিল) দিতেন। এই প্রচারকবৃন্দ এবং সাহিত্য দুয়ে মিলে ধ্রুপদী ইসলামের জ্ঞান প্রসারের কাজই শুধু করেননি, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে তার উপরে জোর দিয়ে মুসলিম ঐক্যের বন্ধনকেও দৃঢ়তর করেছেন। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয় এই যে আঞ্জুমানের মঞ্চ ক্রমেই রূপান্তরিত হল গ্রামীণ আশরফ, জোতদার এবং শিক্ষিত জনের অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক প্রকাশ-পথ হিসেবে– আর এদের সবারই সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ভদ্রলোকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে খর্ব করা। গ্রামবাংলায় পরবর্তীকালে মুসলিম রাজনীতির পল্লবিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় আঞ্জুমানগুলোর প্রারম্ভিক কাজ অপরিমেয়ভাবে সহায়ক হয়েছে, আর এ-কাজের জমিটিও আগেই পুনরুজ্জীবনবাদীরা তৈরি করে রেখেছিলেন।

দেশভাগে যার পরিসমাপ্তি, বাংলার সেই মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ক্রমবৃদ্ধির বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিপুলায়তন ইতিহাস রচনা বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিধি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই, আর আমার তা অভিপ্রায়ও নয়। এ-সম্বন্ধে যে-সব প্রকাশনা দেখা যায় তাদের উৎকর্ষ সমান নয় আর লেখকরা সকলেই মুসলমানও নন। রাজনৈতিক পরিবর্তনে সংক্রান্ত সাহিত্যের অন্য বৈশিষ্ট্য হল বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর– বিশেষত বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর– গবেষণাকর্ম। বাংলাদেশের দেশভাগ-পরবর্তী ঘটনাবলির পর্যালোচনায় তাঁরা দেশভাগের পূর্বের বছরগুলোর দিকেও অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করেছেন। অনেক সময় এ কাজে তাঁদের নিজেদের শাস্ত্র থেকে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টির সহায়তা পেয়েছেন।

এইসব বহু লেখকের রচনা থেকে বোঝা যায় যে ব্রিটিশ শাসননীতির বিরাট অবদান এবং সেইসঙ্গে হিন্দু ভদ্রলোকদের অবস্থান ও নীতির অনমনীয়তা ও অপর্যাপ্ততা ছাড়া বাঙালি মুসলিম সমাজ কেবল নিজস্ব প্রকৃতির ফলে এক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারত না। জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক রাজনীতির বিকাশে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির খুবই গুরুত্ব, কারণ সরকারের হাতে রয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাক্ষিণ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের বিপুল ক্ষমতা। বাংলায় ও ভারতের অন্যত্র মুসলিম জাতিস্বার্থের পিছনে অনেকাংশে কাজ করেছিল বাঙালি ভদ্রলোকরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল জাতীয়তাবাদী লড়াই শুরু করেছিলেন তার মোকাবেলার উদ্দেশ্য মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক পরিচিতি সংগঠনে ব্রিটিশদের আগ্রহ। ১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থান ভারতীয়দের সম্পর্কে ব্রিটিশদের ধারণায় বড় পরিবর্তন এনেছিল এবং এর ফলে ভারতে ব্রিটিশদের সামগ্রিক অবস্থানের একটা বড় রকমের পুনর্মূল্যায়ন হয়েছিল। বৈচিত্র্যময় ভারতের সহজাত নেতৃবৃন্দ ছিলেন অভিজাত ও ভদ্রসমাজ। তাঁদের ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দৌলতে বিভেদের মধ্যেও ভারত এক ঐক্যসূত্রে বাঁধা ছিল। ব্রিটিশরা এবার উপলব্ধি করল যে ভারতীয় উপনিবেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নির্ভরশীল। ব্রিটিশ শাসকদের রাজনৈতিক কৌশলের এই সামগ্রিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালে মুসলমানদের সম্পর্কিত ব্রিটিশ

দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি রচিত হয়েছিল। মুসলিমদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত "বিশেষ" প্রশ্ন ও সমস্যাদি নিয়ে সরকারের ক্রমবর্ধমান উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে "ভারসাম্য রক্ষা" নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। নিপীড়িত ও বঞ্চিত নিম্নবর্ণ ও ব্রাত্য হিন্দুদের বিষয়ে পরবর্তীকালের উৎকণ্ঠাও অনুরূপ চিন্তাভাবনা থেকেই দেখা দিয়েছিল।

ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে ব্রিটিশদের এই নতুন আগ্রহের অনেকটা সমান্তরাল ছিল ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে মুসলিম উচ্চবর্গের কিছু সদস্যের আগ্রহ– যেমন বাংলায় নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলির। দীর্ঘকালীন "ইঙ্গ-মুসলিম" সমঝোতার এক পরিম-ল তৈরি হল– এটিই মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক চেতনাকে পুষ্ট করেছিল। এ-সমস্ত শক্তি ও চাপের পুঞ্জীভূত ফল বাংলায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির রূপরেখা স্থির করে দিল, যার ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ শাসককুলের সঙ্গে মুসলিমদের কৌশলগত সহযোগিতার নীতি এবং একই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী শক্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা বা তার বিরোধিতা।

সাত.

ঔপনিবেশিক পর্বে আধুনিক বাঙালি মুসলমান মেলকরা: বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রতিবাদ

অধিকাংশ লেখক সরল রেখায় যে-চিত্র এঁকে বার বার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেয়া গেল। চিত্রটি কিন্তু আসলে অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদের রাজনৈতিক সিদ্ধিলাভ নিয়ে বিস্তৃততর ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন, বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগতে বিদ্যমান দ্বৈত-র প্রেক্ষিতে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে মাতৃভাষার সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালি মুসলিম রাজনীতির বিশদ আলোচনা করলে মুসলমানদের মধ্যে এমন ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্ভুল উপস্থিতি ধরা পড়ে যা বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বা তার বিরোধী। তেমন সব ভাবনা যতই সীমিত, ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক ও অকার্যকর মনে হোক না কেন, অবিচ্ছিন্নতাবাদী সামগ্রিক জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণা অনেক সময়ই রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা রূপে অনুপ্রবেশ করত। প্রাদেশিক কংগ্রেস, ভারত সভা, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫) এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ও পরবর্তীকালের সমাজবাদী ও সাম্যবাদী আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানদের সীমিত সমর্থন দান ও অংশগ্রহণের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী এবং কংগ্রেস-সমর্থক বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে, যা

এসেছিল প্রায় একই সময়ে স্থাপিত মুসলিম লীগের "প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক সমিতি" হিসেবে। আবার প্রমাণ মেলে "ইয়ং মোহামেডান"-দের জাতীয়তাবাদ-ঘেঁষা উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল রাজনীতিতে, যার ফল হিসাবে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) সম্পাদিত হয়েছিল, এবং স্বল্পকালীন কিন্তু সম্ভাবনাময়তায় তাৎপর্যপূর্ণ, হিন্দু ও মুসলিম বাংলার ঐক্যসূচক খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং পরে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজপার্টির হিন্দু-মুসলিম চুক্তিতে। এমনকি বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু ভদ্রলোকদের আধিপত্যের স্থানে "মুসলিমদের" আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও দুই দশক ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদ আঞ্চলিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান্তরাল হিসেবে ক্রিয়াশীল বলে দেখা গেছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রাক্‌কালেও এমনটিই ঘটেছিল : কয়েক জন দিকপাল বাঙালি রাজনীতিক– হিন্দু ও মুসলিম– তাঁদের নিজ নিজ জাতীয় নেতৃবৃন্দের অগোচরে "এক ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন বাংলা" গঠনের সম্ভাব্যতা নিয়ে সতর্ক আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন।

প্রশ্নাতীতভাবে, বাংলার মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদের বিরুদ্ধবাদী কণ্ঠস্বর সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান-নামক ঐস্লামিক স্বপ্নরাজ্য প্রাপ্তির হৈ-চৈ ও উত্তেজনার মধ্যে। বিচ্ছিন্নতাবাদী মতের সাংস্কৃতিক বিরোধীরা কিন্তু নিজেদের অধিকতর সঙ্কল্পবদ্ধ, অনমনীয়, এমনকি দুঃসাহসিক বলে পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ বাঙালি মুসলিম জনগণের কাছে রাজনীতি তাদের প্রাচীন পরম্পরাগত সংস্কৃতির চাহিদার তুলনায় পরিবর্তন ও প্রয়োগের পক্ষে বেশি উপযোগী বলে দেখা দিয়েছিল। আমরা আগেই বলেছি যে মুসলিম বাঙালির সংস্কৃতি-কাঠামো দুই স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল– একটি ইসলাম, অন্যটি স্থানীয় বাঙালি সংস্কৃতি। দুটিই তাদের সাংস্কৃতিক আত্ম-পরিচয়ের অখ- ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রইল। মৌলবাদী কট্টরপন্থীরাই হোন বা বাংলার আশরাফ বহিরাগতরাই হোন, যাঁরা বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐস্লামিকীকরণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা ঐতিহাসিক দিক থেকে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক অবস্থানের এই মুখ্য দ্বন্দ্বের– অর্থাৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার "আশরফীকরণ" ও "বাঙালিকরণের" পরস্পরবিরোধিতা অথবা (বিকল্প দুটি কথা ব্যবহার করলে) একদর্শিতা ও "সমন্বয়বাদ"-এর পরস্পর বিরোধিতা– এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ঐতিহাসিক বিচারে যোগ্য ছিলেন না। দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাংলায় ঐস্লামিকীকরণের কাজে এ-দুটি বিকল্প দুই মডেল হিসেবে দেখা দিল। উপরের আলোচনায় বলা হয়েছে যে প্রাক্‌-পুনরুজ্জীবনবাদী শতকগুলোতে সমন্বয়বাদী মডেলেরই ছিল প্রাধান্য, অন্ততপক্ষে বিপুল সংখ্যাগুরু ধর্মবিশ্বাসীদের দিক থেকে। পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারের সময়ে ভারসাম্যের বড় পরিবর্তন ঘটল,

ঝোঁকটা গেল প্রথম মডেলের অনুকূলে। এটাই হল সেই বিষয়টি যা নিয়ে আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের ব্যাপারটি অত্যন্ত সযত্নে ও সমালোচকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রথম মডেলের আপাত সাফল্যকে দ্বিতীয়টির বর্জন হিসেবে দেখা বা ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। যা ঘটেছিল তা হল দুয়ের ভিতর আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া; শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক উচ্চকোটি সমগ্র সম্প্রদায়কে নিজেদের পক্ষে আনতে পেরেছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতিবাদের পক্ষ নিয়ে নতুন এবং উদীয়মান বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা– আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, বাংলাভাষী এবং মুখ্যত মধ্যবিত্ত চাকুরে ও পেশাদার গোষ্ঠীর মানুষরা– সোদ্যমে লড়াই করে গেছেন। বাংলার মুসলিম ইতিহাসে এই দ্বিতীয় বার "সাংস্কৃতিক মেলকদের" কাছে সুযোগ ও আহ্বান এল বাঙালি মুসলিম সাংস্কৃতিক উপলব্ধিতে "বিদেশি" ও "দেশির" মধ্যে বিরোধের মাত্রাকে কমিয়ে আনার জন্য। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের আধুনিক বাংলা গদ্যে মুসলিম রচনাসমূহে আশা ও স্বপ্নের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়– তা শুধু তাদের বাঙালি সত্তার জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত স্থান লাভ সম্বন্ধেই নয়, ধর্মের বাধা অতিক্রম করে যাবে এমন একটি বাঙালি "জাতিসত্তা" সম্বন্ধেও।

মুসলমানের বাঙালি পরিচিতির উপর আশরফদের বিদেশি বংশপরিচিতি ও সংস্কৃতিভিত্তিক সামাজিক প্রতিপত্তির যে অশুভ প্রভাব পড়েছিল নতুন মেলকদের দৃষ্টি তার দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁরা লিখেছেন : "ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষা বর্জিত" আশরফরা "মানবজাতির জঞ্জাল ও লজ্জা" স্বরূপ; "অশিক্ষিত, সংস্কৃতিবর্জিত ও বুদ্ধিহীন" তথাকথিত আশরফ বিদেশাগতদের তুলনায় বাংলায় জাত বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ধার্মিক ও সংস্কৃতিবান মুসলমান "নিজেদের হীন বলে কেন মনে করবে"? ওই "আশরফ নামধারী জীবরা" "ইসলামকে নিচে নামিয়েছে" এবং "আল্লাহ্‌র আদেশ ও পয়গম্বরের আদর্শকে উপেক্ষা করেছে"; বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অনেকে "তাঁদের মোহজাল থেকে মুক্ত হতে পারেননি"। "বাঁশবন আর আমবাগানের মাঝখানে খড়-ছাওয়া কুটিরে তাঁরা ঘুমান, কিন্তু তথাপি বাগদাদ, বুখারা, কাবুল ও কান্দাহারের স্বপ্ন দেখেন ... এক অধঃপতিত জাতি অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে, ঠিক যেমন দুর্বল-মানুষ অতিপ্রাকৃত বস্তুর স্বপ্ন দেখে।"

আশরফদের আক্রমণ করে বাঙালি মুসলমান মেলক অনিশ্চিত পদক্ষেপে এক আঞ্চলিক পরিচিতির অন্বেষণে রত হলেন। অঞ্চলের গ-ি অতিক্রম-করা ঐস্লামিক "জাতীয়তাবাদের" প্রভাবশালী ধারণা তাঁর পথকে দুর্গম করে তুলেছিল। বাংলার প্রথম সারির এক মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও প-িত জোরদার ভাষায় এর রূপরেখা দিয়েছেন : "মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে" "বিশিষ্টতা" রয়েছে; এই

বিশিষ্টতাই মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিন্ন সত্তা সূচিত করে এবং এর নিরাপত্তা বিধানের কাজ করে"; মুসলিম জাতীয়তাবাদ "জাত-পাত, বৃত্তি বা ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি; এটি সম্পূর্ণত ধর্মীয় ব্যাপার"। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা সবাই মিলে "এক অখ- ও অবিভাজ্য জাতির" অন্তর্ভুক্ত। অঞ্চলের গি- অতিক্রমকারী ঐস্লামিক জাতি-পরিচিতির অন্য এক প্রবক্তা লিখেছেন : "জাতি" শব্দটি কখনও একজন বাঙালি মুসলমানের মনে "শুধু বাংলার অধিবাসী হিসেবে তার প্রতিচ্ছবি জাগায় না, এমনকি শুধু ভারতের অধিবাসী হিসেবেও নয় : সে তখন সারা দুনিয়ার সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পায়"; আরবি-ভাষায় রচিত কোরান "সকলকে সৌহার্দ্য, সুখ ও প্রেমের বন্ধন ধরে রাখে। এই বন্ধন ছিন্ন করে জাতীয় জীবনের নিরাপত্তা বিধানের আশা আমরা করতে পারি না"।

এ-কারণে মেলকদের প্রারম্ভিক ভাবনা-চিন্তায় খানিকটা সংশয় ও অপরাধবোধের দ্বিধা ছিল : "পাঁচশ বছর এদেশে বাস করার পর" এটা বলা "অতিকথন নয় যে এখন আমরা এদেশেরই লোক"; অন্ততপক্ষে "এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে বাঙালি মুসলমানদের সকল পূর্বপুরুষরা আরব দেশ, ইরান, তুরান বা তুরস্ক থেকে বাঙলায় আসেননি"। অন্য কয়েকজন অধিকতর আস্থা ও প্রত্যয় নিয়ে "বাঙালিত্ব" সম্বন্ধে লিখেছেন : তাঁদের পূর্বপুরুষরা আরব দেশ, পারস্য, আফগানিস্তান ও তুরস্ক থেকেই আসুন অথবা স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সন্ততিই হোন," বাঙালি মুসলমানরা "সকলেই এখন বাঙালি"। এমনকি যাঁদের পূর্বপুরুষরা "সত্যিই বিদেশ থেকে এসেছিলেন" তাঁদেরও এখন "নিজেদের সেসব দেশের লোক মনে করার কোনো কারণ থাকা উচিত নয়"। এর চেয়ে অধিকতর "অদ্ভুত ও পরিতাপের বিষয়" আর কিছু হতে পারে না যে "এদেশে বিগত সাত শতক ধরে বাস করার পরও এদেশকে স্বভূমি হিসেবে মেনে নিতে আমরা অক্ষম"। আমরা আগেই বলেছি, অঞ্চলের গণ্ডি অতিক্রমকারী সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিও মেলক-লেখকদের কটু শ্লেষের বিষয় হয়েছিল। "কেউ কখনও ভাববে না" "যে দেশে লোক হাজার বছরেরও বেশি সময় থেকেছে এবং সমানভাবে তার শীত-গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সমৃদ্ধি-মন্বন্তর ও সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে তার বাইরেও কারও স্বভূমি থাকতে পারে"। তাই "বাংলা দেশ, তার ভাষা ও তার জাতি" সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বাঙালি মুসলমানদের অভিমত প্রকাশের "শতকরা একশ' ভাগ অধিকার রয়েছে"। এই নতুন-পাওয়া অধিকারবোধের সময়বিশেষে খানিকটা অধিকতর মাত্রায় প্রকাশ দেখা গেছে : "... সকল সময়ে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবেই যে 'বাঙালি' কথাটার উপর আমাদের দাবি আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ... বাংলা মায়ের সন্তান আমরা সমগ্র ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ।"

"মাতৃভূমি"-র ধারণাটিকে ঘিরে একটা অঞ্চলভিত্তিক দেশপ্রেম কিছু মেলকের উপলব্ধিতে স্থান পেয়েছিল বলে মনে হয়। "সারা পৃথিবীর মুসলমানরা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ" এই উক্তিটির অর্থ এমন বলে ধরে নেয়া ঠিক নয় যে "তাদের নিজস্ব দেশ বা জন্মভূমির" প্রতি "তাদের অনুরাগ বর্জন করতে হবে"। নিজের দেশ সম্বন্ধে অনাগ্রহ "ভবঘুরে"-র ধর্ম। "প্রতিবেশী"-র প্রতি দয়া প্রদর্শন "কোরানের নির্দেশ"। যে-দেশে আমার "প্রতিবেশী" ও আমি বাস করি তার কল্যাণ সম্পর্কে "ঔদাসীন্য" "স্বধর্মচ্যুতির" সমতুল। মাতৃভূমি "হিন্দুদের কাছে যতটা মুসলমানদের কাছেও ততটাই প্রিয়"। বাঙালি মুসলমানদের শিরায় "বিদেশি ও দেশি দু-ধরনের রক্তই রয়েছে ... উচ্চ ও নীচ উভয় সামাজিক বর্গের হিন্দুদের রক্ত রয়েছে", এবং মুসলিমদের "এসব নিয়ে গর্ব করা উচিত" এবং ভাবা উচিত যে "আমরা বাঙালি" এবং "বাংলার কল্যাণ ... আমাদের আদর্শ"। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান "বাংলার অংশ বা বৃহত্তর ভারতের অংশ ছাড়া কিছু নয়", এবং সে-কারণে "তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণতা-প্রাপ্তির পথ হল সেই বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে ঘটে"। এবং যখন এই সত্য "সঠিকভাবে আমাদের মনকে সিঞ্চিত করবে তখনই হিন্দু-মুসলিম সঙ্ঘাতের অবসান হবে।"

বাঙালি মুসলমানের আনুগত্যে আভ্যন্তরীণ সংঘাতের মূল উৎসকে কয়েকজন মেলক স্পষ্টভাবে শনাক্ত করেছেন। "ধর্ম" ও "জাতি" এ-দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে মুসলিম মানসে বিভ্রান্তির দিকে তাঁদের দৃষ্টি সরাসরি নিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁরা মুসলমানদের আহ্বান জানালেন এ-দুই শব্দের "অর্থ ও তাৎপর্যের" পার্থক্য উপেক্ষা করে তাদের "সহজ সমীকরণ" করার ভ্রান্তি বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য। একটি জাতি "অঞ্চল-নির্বিশেষে এক ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়– বরং তার সকল অধিবাসীদের নিয়ে এটি একটি দেশ তাদের ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও"। ইসলাম ধর্মের "বৈশ্বিক" দিকটি "নিঃসন্দেহে এই জাতিসত্তাকে অতিক্রম করে যায়" কিন্তু তা "মুসলিমদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের" বেশি কিছু নয়। মুসলমানরা "ভারতের হিন্দু, খ্রিস্টান, পার্শি বা বৌদ্ধদের সঙ্গে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত"। "ভারতে হিন্দু নামে কোনো জাতি নেই, মুসলিম নামে কোনো জাতি নেই, কিন্তু এখানে ওইসব নামের কিছু ধর্ম রয়েছে।" মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তখন চিৎকার করে বলেছেন যে বাঙালি মুসলমানরা "একটি মুসলিম জাতি" তাঁদের এ-কথাটা মনে থাকেনি যে ইসলাম "একটা ধর্ম, কোনো জাতি নয়"। ফলে বাংলার মুসলমান "হাজার বছর ধরে বাংলার জল-হাওয়ায় পুষ্ট হয়ে" দেখতে পেল তাদের নিজেদের দেশেই তারা "একঘরে" হয়ে আছে। বাংলা তাদের কাছে এখনও "ধাই-মা" হয়ে থাকল, আসল মা নয়। এইভাবে "জাতিসত্তা ও শিকড়" তারা খুঁজতে লাগল "বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে"। "বুখারা ও সমরখন্দে তাদের

সমধর্মী ভাইদের দুর্দশায়" তারা সহজে "বিচলিত হয়"। কিন্তু তাদের নিজেদের দেশে, "তাদের একেবারে চোখের সামনে দুর্দশা ও বঞ্চনার যে-চিত্র রয়েছে তা তাদের মনে কোনো ছায়া ফেলে না"। "বাগদাদের ভাইরা যে তাদের খোঁজ নেয় না" এ-সত্যটি নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা ছিল না। এই "ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতি দেশোত্তর অনুরাগ" দেশের "বিকাশ ও নিরাপত্তার পক্ষে নিশ্চিতভাবে অনিষ্টকর" বলে বিবেচিত হয়েছিল :

> হায়, ভারতের স্বপ্নবিলাসী মুসলমানবৃন্দ : তোমাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমাদের ঠিক চোখের সামনে; দারিদ্র্যের করাল মূর্তি তোমাদের চারদিকে ধ্বংসের তা-বলীলায় মত্ত। কিন্তু তোমরা তোমাদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ, সে-স্বপ্ন বিশ্ব-ইসলামের সংহতির স্বপ্ন।

"দেশপ্রেমের" প্রশ্নে মুসলমানরা "এক রুদ্ধ দ্বারের সামনে" দাঁড়াত। দেশপ্রেম "আধুনিক যুগের প্রাণবন্ত ও বিশ্বজনীন আদর্শ", কিন্তু তারা দেশপ্রেম বর্জন করতে চাইত, কারণ তারা দেখতে পেত "এই আদর্শ ও নিজেদের সামাজিক স্বার্থের মধ্যে" একটা সংঘাত রয়েছে"। সাধারণ মানুষদের মধ্যে "জাতীয়তাবাদী আদর্শ সঞ্চারের" প্রয়াস করা সকল দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব, আর "মুসলমানদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ধারণা" সঞ্চার করার "বিশেষভাবে প্রয়োজন" ছিল।

ধর্ম ও ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার ধারণাটি "যুগের প্রাণসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন" বলে মেলকদের তা অপছন্দ ছিল। ধর্মীয় রাষ্ট্র "ইউরোপে লোপ পেয়েছে" এবং বাঙালি ও ভারতীয়দের সামনে "সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলা ছাড়া বিকাশ ও সিদ্ধিলাভের অন্যতম উপায়" ছিল না। ধর্মীয় মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে এবং হিন্দুদের মধ্যে "সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ববোধ" প্রসারের উপযোগী ছিল। কিন্তু সে-যুগে প্রয়োজন ছিল "অনেক ব্যাপকতর পরিধির, দৃঢ়তর, অধিকতর প্রগতিশীল ও অধিকতর সময়োপযোগী" একটি মতবাদের, যার ভিত্তিতে "ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণিসমূহ পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশে সক্ষম হতে পারে"। "শুধু জাতীয়তাবাদী মতবাদই" এ-উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সাধন করতে পারত। "এ-যুগে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংগঠন করতে গেলে" "বিপদ" দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইতিহাসে "রাজনৈতিক ঐক্য বিধানের কাজে ধর্মীয় ঐক্য বিধানের কাজে ধর্মীয় মতবাদ জাতীয়তাবাদী মতবাদের কাছে 'পরাভূত' হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাখ্যা মেলে কী কারণে পৃথিবী জুড়েই ইহবাদী রাষ্ট্র গড়ে উঠছে"। কোনো ধর্মীয় মতবাদের "বড় ত্রুটি" হল এই যে "বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা উৎপাদনের এর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে"। এমন রাষ্ট্র আবার "গোষ্ঠীস্বার্থকে রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়"। তাই "অন্য সকল সভ্য জাতির মতো" বাঙালি ও অপর

ভারতীয়দের উচিত "রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ধর্মের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা"।

> আমরা সকলে সত্যিই যদি নিজেদের প্রথমে ভারতীয় ও বাঙালি হিসেবে এবং পরে হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে দেখতে পারতাম এবং এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে শিখতাম, তাহলে সময়োপযোগী এই মতবাদ অচিরেই ভারতে একতা ও সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারত।

যে অবিভাজ্য বাঙালি পরিচিতিবোধ ধর্মের ভেদাভেদ অতিক্রম করে যায় তার পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছিল সার্বজনীন মানবতাবাদে আস্থা স্থাপনের মধ্য দিয়ে। "উদ্ভিদের সাধারণ প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করে গোলাপের চারা সার্থক গাছ হয়ে উঠতে পারে না।" একইভাবে সাধারণ মানবপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে কেউ "আদর্শ মুসলমান, বা ভারতীয়, বা বাঙালি" হয়ে উঠবে না। অনুরূপ মনোভাব আরও জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বলতম রত্ন। ঢাকা শহরে বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম ও মুসলমান সমাজে "বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন" সূত্রপাতের সাহসিক কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াসে জড়িত হয়েছিলেন পথ-প্রদর্শক যে একদল বাঙালি মুসলমান, ওদুদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম পুরোধা। "বাংলার যুবসমাজের উদ্দেশে" তিনি আহ্বান জানিয়েছেন :

> আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল ... জন্মাধিকারে স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রথমত একজন মানুষ, দেশ কাল জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে আমি সকল মানবজাতির আত্মীয়; তারপর বল, আমি এই বঙ্গভূমির সন্তান– আমি এই ভূমিকে ভালোবেসে নিজেকে শক্তিমান করেছি এবং আকাশের নিচে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি– আমি বাংলার সন্তান, আমি বাঙালি; আর সবশেষে বল, আমি মুসলমান– আমার মনুষ্যত্ব ও বাঙালিত্বের গুণ ও সৌষ্ঠব ... এক পরম রূপ গ্রহণ করবে ঈশ্বরের একত্বের (তৌহিদের) এবং সাম্যের চিরসত্যের মধ্যে...। এই পরম প্রাপ্তির কথা ভুলে বাংলা তথা ভারতের মুসলমানরা, যাদের মধ্যে বুদ্ধির অভাব নেই, দেশকালের দাবির প্রতি চোখ বুজে থেকে এতদিন সব কিছুর আগে মুসলমান হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছে– যে মুসলমান নাকি বিগত যুগের এবং ভিন্ন পরিবেশে উদ্ভূত ধর্মীয় বিধি ও বিশ্বাসের বোঝা বহন করবে। এর অনিবার্য পরিণতি অস্বস্তি ও মোহভঙ্গ।

আট.
উপসংহার

মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির জোয়ারে, যার পরিণতি হল দেশভাগ, ওদুদ ও ওয়াজেদ আলির মতো সাংস্কৃতিক মেলকরা তলিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বালির স্তূপের তলায় চাপা পড়ে থাকতেন যদি-না পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ-রূপে পুনরাবির্ভাব ঘটত। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে প্রায় চব্বিশ বছরের এক অ-সম ও শোষণমূলক সম্পর্কের মধ্যেই বাংলাদেশের ইতিবৃত্ত সীমিত নয়। এ-ইতিবৃত্তের মূল সে-দেশের দীর্ঘ অতীত ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। প্রকৃত অর্থেই বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস এক চিরন্তন পরিচয়-সঙ্কটের ইতিহাস। আশরফ-প্রধান বঙ্গ-বহির্ভূত ঐস্লামিক মতবাদ এবং আঞ্চলিক বাঙালি সংস্কৃতির শক্তিতে সিঞ্চিত ইসলামি মতবাদের তীব্র মেরুমুখিতা তাদের ইতিহাসের একটা স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে আছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাংলায় মুসলমান সাংস্কৃতিক মেলকদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সাধারণ বাঙালি ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য এক সমন্বয়বাদী ঐস্লামিক ঐতিহ্য নির্মাণ করে দুই বিরোধী সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। দুয়ের মধ্যবর্তী খাদটি এভাবে সেতু দিয়ে ঢাকা ছিল। কিন্তু উনিশ শতকে ঐস্লামিক মৌলবাদী, পুনরুজ্জীবনবাদী ও সংস্কারপন্থীরা বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতিতে এ-দেশীয় চরিত্রলক্ষণের বিরুদ্ধে প্রবল ও বিষোদ্‌গারী প্রচার চালাবার ফলে খাদটি আবার প্রকট হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল আশরফদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন, যার পিছনে কাজ করেছিল ব্রিটিশ নীতি ও পশ্চিমি শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের কাছ থেকে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের বাসনা; অন্যদিকে ছিল উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিমদের অনুরূপ স্বার্থ, তারা বাঙালি মুসলিম সমাজের "নয়া আশরফ" হয়ে উঠতে চাইছিল। এ-দুয়ের সমাবেশ ঐস্লামিক পুনরুত্থান প্রক্রিয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির অবমূল্যায়নে মদদ দিয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের বাঙালি সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা ও অবিচ্ছিন্নতার উপর অত্যধিক চাপ তৈরি হয়েছিল। মুসলিম বাংলার জীবনযাত্রার ঐস্লামিকীকরণের ব্যাপক তাগিদ গড়ে উঠেছিল এবং মুসলমানের ভাষা, সাহিত্য, পোশাক-আশাক, নাম, ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ, বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি সব কিছুতে তা প্রসারিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার তাদের নিজেদের চরিত্রের বাঙালি লক্ষণগুলোর সুরক্ষা ও জোরের সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল এবং সাংস্কৃতিক মেলকরা এই ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার জন্য পুনরায় আবির্ভূত হলেন। তাঁদের মধ্যযুগীয় পূর্বসূরিরা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন তার তুলনায় এবারকার চ্যালেঞ্জ ছিল আরও বেশি গুরুতর এবং কঠিনতর। পূর্বসূরিদের নিশ্চয় নানা প্রতিকূল শক্তির এমন বিপুল

সমাবেশের সম্মুখীন হতে হয়নি– যেসব শক্তি বাঙালির স্থানীয় শিকড় ছিন্ন করায় ও তার বিকল্প তৈরি করায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিল। আধুনিক মুসলিম মেলকরা তাঁদের অবস্থানে অবিচল রইলেন এবং প্রত্যয়ের বিপুল সাহস নিয়ে আপন মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা হয়তো পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। স্পষ্টতই, তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য– ধর্মাতীত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা, অপূর্ণ রইল। এই ব্যর্থতার কারণ অবশ্যই নানাবিধ ও জটিল। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাফল্য বহুগুণ বৃহত্তর ও জটিলতর কাহিনীর অংশ। ঐস্লামিক শক্তিগুলোর এক দুর্বার সমন্বয়ের কথা আমরা আগেই বলেছি। তাছাড়া ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজে "আশরফীকরণের" সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার নিরন্তর শক্তি অর্জন; নবোন্মেষশীল আধুনিক "বাঙালি" সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান হিন্দু রূপ ধারণ; শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত; এবং সবশেষে চতুর ও হিসাবি ঔপনিবেশিক শক্তির সদা-বর্তমান ক্ষমতা-জাল। এইসব মিলে বাঙালি পরিচিতির পরিবর্তে ঐস্লামিক পরিচিতিকে প্রধানতর করে তুলল।

তথাপি মেলকরা স্পষ্টতই "মেলক" হিসেবে তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন– মুসলমান-বাঙালি সম্পর্ক থেকে "বাঙালিত্বের" সম্পূর্ণ বিতাড়ন প্রতিরোধে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের সুকৃতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকল বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার স্থান সুনিশ্চিত করা ও তার উন্নয়ন সাধনে তাঁদের অবদান। বাঙালির ইতিহাসে এ-অবদানের পরবর্তীকালে অসীম গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় ও দুঃখবহ প্রকাশ ঘটল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখের ভাষা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের আবির্ভাবের পক্ষে এ-ঘটনার গুরুত্ব সুপরিজ্ঞাত এবং প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে এটি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের ঘটনাবলির পর্যবেক্ষকদের অনেকে এ-ঘটনাকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি এবং নতুন জাতির জন্মের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষপাতী। নিচের মন্তব্যে এই অভিমতের এক সাধারণ প্রকাশ লক্ষ করা যায় :

> পাকিস্তানের খ-িত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত এ তারই স্বাভাবিক পরিণতি। বস্তুত এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে পাকিস্তানের জনগণের এক নতুন পরিচিতি লাভের অভিপ্রায়ের বীজ নিহিত ছিল।

নবগঠিত ঐস্লামিক জাতি পাকিস্তানের জন্মকালের এমন অত্যল্পকাল পরেই এই বিস্ময়কর ঘটনার প্রতীকী শক্তি সন্দেহাতীত। কিন্তু আশরফ-আতরাফ বিভেদের

দীর্ঘ ইতিহাসে ভাষার বিষয়টির গুরুত্ব মনে রাখলে, শহীদ দিবসের ঘটনাটির এই বিশেষ ব্যাখ্যা অত্যন্ত সীমিত ও অনৈতিহাসিক ঠেকে। ভুললে চলবে না যে প্রাক্-ঔপনিবেশিক শতকগুলোতে বাঙালি মুসলমান সাংস্কৃতিক মেলকরা সমস্যার একটা সাহসিক ও সার্থক মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন, যদিও ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সমস্যাটি নতুন করে দেখা দেয়। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন ওঠে : কাহিনীর আরম্ভ কোন্ খানে, আর কেমন করেই-বা আমরা এর উপস্থাপনা করব?

আমরা এই প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম বাঙালি মুসলমানের নিরবচ্ছিন্ন আত্মপরিচিতি অন্বেষণের বিষয় নিয়ে। এর ইতিহাসের সম্পূর্ণ দৃশ্যপটের নানাবিধ বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নমুখী ও পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলির মধ্য থেকে যে-প্রতিচ্ছবিটি বেশি করে ফুটে ওঠে তা হল সর্বজনগ্রাহ্য একটি আত্মকল্প আবিষ্কারে এখনও সন্ধানরত এক জনগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি। আমরা আগে দেখেছি কোনো জনবহুল জাতির চক্রিল ইতিহাসে এমন সঙ্কটের মীমাংসায় প্রচুর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। ধর্মীয় এবং ইহমুখী উপাদানগুলো কতটা কার্যকর হয়েছে? ধর্মীয় প্রতীক ও স্লোগানের আড়ালে স্পষ্টত ইহবাদী প্রচারের মধ্যে ইসলামের প্রাধান্য কতটা থেকেছে? এটা কি সমাজ-সংগঠনের দুই পরস্পর-বিরোধী নীতির সঙ্ঘাত ও বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার এক দিকে দেশোর্ধ্ব ধর্মীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং অন্যদিকে ভাষাভিত্তিক এক পরিপুষ্ট আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, এই দুই-এর দ্বন্দ্বের পরিণতি? এর কতটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে শ্রেণি-চেতনায় লালিত, আর কতটা ছিল এমন সব সীমানা অতিক্রমকারী সামূহিক সাম্প্রদায়িক ভাবনা দ্বারা সিঞ্চিত? কোনো যাদুমন্ত্রবলে এর সহজ উত্তর মিলবে না। বিতর্ক এড়াবার জন্য আমরা শুধু কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করতে পারি।

কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষেই বিচ্ছিন্নভাবে তার ভাগ্য নির্ণয় ও তার রূপদান সম্ভব নয়। বস্তুত গোষ্ঠী নিজেই তার আত্মসংজ্ঞা নির্দেশ ও আত্মকল্প নির্মাণের জন্য তার এক "বিকল্প সত্তা" অন্বেষণ করে এবং নির্মাণ করে নেয়। বাঙালি মুসলমানের আত্মান্বেষণের ক্ষেত্রে তার "আত্মার" ধারণা ও "বিকল্পের" ধারণার মধ্যে সম্পর্কের বারবার পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। পরম্পরাগত পূর্ব-ঔপনিবেশিক পর্বে, বাঙালি মুসলমানের অন্বেষণ আরম্ভ হয়েছিল প্রভাবশালী অবাঙালি-মুখীন আশরফ দ্বারা প্রবর্তিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভাষাগত বিভাজন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন এবং তার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্য দিয়ে। বিশদ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সাংস্কৃতিক মেলকরা এক সম্ভাব্য গুরুতর সঙ্কটের সমাধান পেয়েছিলেন এবং সমন্বয়বাদী ধারায় বাঙালি মুসলিম পরিচিতির গতানুগতিক রূপটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই সমন্বয়বাদী সাংস্কৃতিক ধারাটি বাঙালি মুসলমানকে কয়েক শতক ধরে তাদের দ্বৈত "বাঙালি" ও "মুসলিম" পরিচিতি বহন করে চলতে দিয়েছে।

পরে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এটি "নিষ্ক্রিয়" হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসন এ-পরিবর্তনে একাধিক ভাবে সাহায্য যুগিয়েছে। আধুনিক বাংলার প্রায় সকল ঐতিহাসিকই, বিশেষত বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির বিকাশ যাঁরা পর্যালোচনা করেছেন, বারবার ব্রিটিশ শাসনের বিভেদমূলক ও শোষণাত্মক নীতির কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন এর ফলেই শহর-গ্রামে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের আগ্রাসী ধর্মান্তকরণ প্রয়াস, ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে উনিশ শতকী "উদারপন্থী" ও "প্রগতিশীল"-দের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা এবং বর্ণ, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জটিল জাল থেকে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার তীব্র প্রবণতা– এসবের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এসবের ফলেই ধর্মীয় ও ইহবাদী নেতাদের পরিচালনায় "সাম্প্রদায়িক" উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কৃষক ও কারুশিল্পীদের দ্বারা অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন সংগঠনে জমি তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক "প্রতিপক্ষ", যা সাধারণের ঘৃণা ও বিরোধিতার বস্তু ছিল, বাংলার গ্রামীণ শ্রেণিও ধর্ম-ভিত্তিক ভেদাভেদের প্রেক্ষিতে ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে এক "সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষ"-তে পরিণত হল। আমাদের অধিকাংশ ইতিহাসবিদ্‌ই এই সমস্যাটির পর্যালোচনায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তবে একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তাঁদের পদ্ধতি ভ্রান্ত; তাঁরা সাধারণভাবে ধরে নিয়েছেন যে "বাংলার মুসলমানরা স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক"। তাঁদের আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে সম্পূর্ণত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উপর, ফলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। এ-বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের প্রশ্নটি অনস্বীকার্যভাবে তিনটি মুখ্য উপাদানের মিশ্রণে উদ্ভূত এক যৌগিক : মুসলিম, হিন্দু ও ঔপনিবেশিক শক্তি। মুসলিম ও হিন্দু উপাদান দুটির ভূমিকা মনে হয় প্রায় বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় ও বাংলাদেশী ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেছেন। প্রথম গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা জোর দিয়েছেন মুসলমানদের দায়িত্বের উপর, যা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। অন্যদিকে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা প্রায়শই ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলিমদের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করার জন্য বাঙালি হিন্দুদের দায়িত্বের উপর জোর দিয়েছেন। মুস্তাফা নুরুল ইসলাম একটি বহু-সমর্থিত অবস্থানের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, যেখানে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে উনিশ শতকের শেষার্ধের হিন্দু নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও এ-দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র ছিল অত্যন্ত বাস্তব, এদের কালানুক্রমিক সম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। এ-যুক্তিরেখা ধরে চললে দুটি সমস্যা দেখা দেয়। কালানুক্রমে যদি বিচার্য হয়, তবে আমরা এ-কথাটা উপেক্ষা করতে পারি না যে মুসলিম পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন– যেখানে

মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল ইসলামকে হিন্দু প্রক্ষেপণ থেকে মুক্ত করার জন্য– উনিশ শতকের পরবর্তী অংশের আগেই হয়েছিল। তার চেয়েও বড় কথা, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ যদি মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার সপক্ষে ওকালতি করে থাকে– তা নিঃসন্দেহে করেছিল– বাংলায় ইসলামের বিদেশি গুণাবলির আশরফ সমর্থকরা কিন্তু তার আগেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের ঘৃণার মনোভাব নিয়ে বাঙালি মুসলমানদের এক আত্মনির্বাসনের অবস্থান গ্রহণে এবং নিজভূমে পরবাসী হতে বাধ্য করেছিলেন। বাঙালি হিন্দুরা যদি বাঙালি মুসলমানের পরিচিতির ঐস্লামিক অংশটির চাহিদা উপেক্ষা করে থাকেন, বাঙালি মুসলমানরাই কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সহায়ক হননি, কারণ তাঁরা তাঁদের বাঙালি পরিচিতি এমনভাবে প্রক্ষেপণ করেছেন যার ফলে অমুসলিমদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এবং ইতিহাসবিদদের পক্ষেও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁরা হিন্দু "ধাক্কার" কথা যতটা মনে রাখবেন ততটাই মনে রাখবেন মুসলিম "টানের" কথা– অর্থাৎ তার অবাঙালি সাংস্কৃতিক অভিমুখিতা সহ "আশরফীকরণের" সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপের প্রতি আকর্ষণের কথা। উপরের আলোচনা আমরা দেখেছি যে বাঙালি মুসলমান মেলক বা সেতুনির্মাতারা– যাঁরা বাঙালি মুসলমান পরিচিতির ঐতিহাসিকভাবে বিপরীত মেরুমুখী বাঙালি ও মুসলিম ধারা দুটিকে মেলাবার কাজ করেছেন– প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক উভয় যুগে সমস্যার সমাধান হাজির করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের হার মানতে হয়েছে। ইতিহাসে তাঁদের সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়ই সীমিত ও স্বল্পকালীন বলে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার মধ্যেও এই ঐতিহাসিক ধারার অবিচ্ছিন্নতা সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই "ধাক্কা" ও "টান" উপাদান দুটি আর নেই, এ কথাটা মনে রাখলে আশা করা যায় যে বর্তমান সাংস্কৃতিক মেলকরা এখন নিজেদের সার্বভৌম রাষ্ট্রে অধিকতর স্থায়ী কৃতি রেখে যেতে পারবেন। কিন্তু খুব একটা আশা করা যায় কি? সেতু-নির্মাতাদের উপর পুরনো বাধা-নিষেধ বহিঃশক্তির চাপের আকারে এখনও রয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তি ও বাংলার বাইরের অন্যতম সর্বভারতীয় শক্তিগুলোর কূটচালের স্থান নিয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিককালে ঐস্লামিক দেশগুলোর সংগঠন ওওঈ-র ক্রমবর্ধমান শক্তিলাভ ও আর্থিক প্রভাব। পেট্রো-ডলারের দৌলতে এ-সংগঠন এখন বাংলাদেশের ঐস্লামিকীকরণে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত। আবার ঐস্লামিকীকরণের যারা সমর্থক তাদের কাছে ভারত-নামক বিরাট দেশটির ছোট্ট মুসলিম দেশটির পাশে দৈত্যের মতো ভীতিপ্রদ উপস্থিতি একটা সুবিধাজনক হাতিয়ার। প্রয়োজন-মাফিক তা ব্যবহার করা যায়। বাঙালি মুসলমানের পরিচিতি-সঙ্কটের দীর্ঘ ইতিহাসের সমকালীন পর্যায়ের ফল কী দাঁড়াবে তা শুধু মহাকালই বলে দিতে পারে।

উল্লেখপঞ্জি

১। Rafiuddin Ahmed : (i) "Conflict and Contradictions in Bengal Islam : Problems of change and adjustment", in Katherine P. Ewing (ed), *Shariat and Ambiguity in South Asian Islam*, Berkeley, 1988.
(ii) "Islamization in Nineteenth Century Bengal" in Gopal Krishna (ed), *Contributions to South Asian Studies, 1*, Oxford, 1979.
(iii) *Bengal Muslims*, 1981.

২। Syed Ahmed Khan : (i) *Tarikh-i-Hindustan*, Delhi, 1846.
(ii) *Causes of the Indian Revolt*, Delhi, 1859.
(iii) *An Account of the Loyal Mohammedans of India*, Delhi, 1860.
(iv) *Essays on the Life of Mohammed*, Delhi, 1870.

৩। Syed Ameer Ali : (i) The *Life and Teachings of Mohammad of the Spirit of Islam*, London, 1891.
(ii) *A Short History of the Saracens*, London, 1899.

৪। S. Khuda Baksh: (i) *Studies : Indian and Islamic*, London, 1927.
(ii) *The Arab Civilization*, Lahore, 1943.
(iii) *Contributions to the History of Islamic Civilization*, 2 vols. Calcutta, 1959.

৫। Muhammed Waliullah : *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৬৯।

৬। J. N. Sarkar (ed.) : (i) *History of Bengal, Vol. II, Muslim Period*, Dhaka, 1948.

৭। Javed Iqbal : *The Ideology of Pakistan and its Implementation*, Lahore, 1959.

৮। Asim Roy : (i) "Bengali Muslims and the problem of identity", *Jour, Asiatic Soc, Bangladesh*, 22 : 3 (1947).
(ii) *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Princeton, 1983. (Special South Asian edition, New Delhi, 1987.)
(iii) *Islam in South Asia : A Regional Perspective*, New Delhi, 1996.

৯। Muinuddin A. Khan (ed.) : (i) *Selections from Bengal Government Records on Wahabi Trials, 1863-70*, Dhaka, 1961.
(ii) *History of the Faraidi Movement in Bengal, 1818-1906*, Karachi, 1965.

(iii) "Research in Islamic Revivalism of The Nineteenth Century and its Effect on The Muslim Community in Bengal", in P. Bassaignet (ed.), *Social Research in East Pakistan*, Dhaka, 2nd revised edn., 1974.

১০। Mustafa Nurul Islam : *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press, 1901-1930*, Dhaka, 1973.

১১। Q. A. Wadud : (i) *শাশ্বত বঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৫১। (ii) *হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ*, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৬। (iii) *আজকের কথা*, কলকাতা, ১৯৪১। (iv) *নব পর্যায়*, কলকাতা, ১৯৩৬।

১২। Sumit Sarkar : *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, New Delhi, 1973.

১৩। A. R. Mullick : *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856*, Dhaka, 1961.

১৪। Muinuddin A. Khan (ed.) : *Bengal Muslim Records : Faraidi Movement*.

১৫। G. H. Broomfield : *Elite Conflict in a Plural Society, Twentieth-Century Bengal*, Berkeley, 1968.

১৬। Kenneth McPherson : *The Muslim Microcosm : Calcutta 1918 to 1935*, Wiesbaden, 1974.

১৭। P. Sinha : *Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History*, Calcutta, 1965.

১৮। Rajat K. Roy : *Social Conflit and Political Conflict in Bengal 1875-1927*, Delhi, 1984.

১৯। Hardy, P. : *The Muslims of British India*, Cambridge, 1972.

২০। S. Wajed Ali : (i) "বাঙালি মুসলমান : অভিভাষণ", *জীবনের শিল্প*, কলকাতা, ১৯৩৯। (ii) *ভবিষ্যতের বাঙালি*, কলকাতা, ১৯৪১।

২১। Anisuzzaman : (i) *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪। (ii) *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*, ঢাকা, ১৯৬৯।

২২। Rafiq Zakaria, *Raise of Muslims in Indian Politics : An Analysis of Developments from 1885 to 1906*, Bombay, 1970.

উৎস: গ্রন্থ: *ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ*।

[লেখক: দ্র. আমরা চেষ্টা করে এই লেখকের পরিচয় খুঁজে পাইনি। এটুকু বোঝা যাচ্ছে কোলকাতার লেখক উনি এবং শিক্ষাবিদ ও গবেষক হবেন। এই লেখকের পরিচয় উদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব ছিল না তবে সময় স্বল্পতার কারণে এখানে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নিচ্ছি।]

বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস

আ বু ম হা মে দ হ বি বু ল্লা হ

হিন্দুস্তান-পাকিস্তান পরিবেষ্টনীতে হয়তো বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্যও যাবে কমে। তবুও গ্রামাশ্রয়ী, নদীমাতৃক বাঙালির আমূল রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা দেখি না। বাঙালি বাঙালিই থাকবে; ইতিহাসের উজান বেয়ে মানসিকতা ও জীবন-ধারার যে ঐতিহ্যের নাম বাঙালি, তার তিরোধান অসম্ভবই মনে হয়।

এই বাঙালিত্বের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাই আজও ফুরিয়ে যায়নি। কবে হতে আমরা বাঙালি বলে নিজেকে চিনেছি? কোন্ প্রক্রিয়ার ফলে এখানকার মুসলমান, উত্তরাপথের সাংস্কৃতিক চিন্তা থেকে আলাদা হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে উঠল? উত্তর-ভারতের ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিবর্তনের প্রভেদ কেন? আকৃতিগত পার্থক্যেরই-বা কী কারণ? এরূপ বহু প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার, কারণ আত্মপরিচয় না হলে আত্মনিয়ন্ত্রণ নিরর্থক; নিজের সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রতি সচেতন না হলে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অরক্ষণীয় হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের, বিশেষ করে বাঙলায় মুসলমান যুগের ইতিহাসের চর্চা তাই আজ একান্ত প্রয়োজন। প্রাক-মুসলিম বাঙলার ইতিহাস ও মুসলমানের পক্ষে প্রায় সমান প্রয়োজনীয়, কারণ কোনো কিছুই অতীতকে এড়াতে পারে না। আমাদের মধ্যে অনেক কিছুই আছে যার গোড়া প্রাক-মুসলিম এমনকি অনার্য বাঙলায় খোঁজা চলে। যেমন ইসলামের বিধানে ও আচারে প্যাগান (Pagan) আরবের স্বাক্ষর আজও সুস্পষ্ট আছে। কাজেই বাঙলার মুসলিম ইতিহাস মানে গঙ্গার নিম্ন উপত্যকারই সম্পূর্ণ ইতিহাস।

কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় ঐতিহাসিক মাল-মশলার যে পরিমাণ উদ্ধার ও গবেষণা হয়েছে তার তুলনায় মুসলমান আমলের তথ্যগুলো একেবারে অবহেলিত হয়ে আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে আজকের বাঙালি মুসলমানের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কাহিনী অজানা তো বটেই, বাঙালি-হিন্দুর আত্মপরিচয়ও

অসম্পূর্ণ থেকে যায় যতদিন-না মধ্যযুগের এই প্রায় ৮০০ বছরের বিবর্তনীয় ধারাগুলো সুস্পষ্ট হয়। আমরা ইংরেজের মারফত মোগল শক্তি ও ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারের সঙ্গে বেশি পরিচিত বলে বাঙলার মুসলমান সমাজের ঐতিহাসিক রূপ সম্বন্ধে খাপাছাড়া ধারণা পোষণ করি, মনে করি, এদেশের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও তার বর্তমান রূপনির্দেশ মোগল আমলেই হয়েছে। উত্তর-ভারতে রচিত ফার্সি ইতিহাসগুলোতে বাঙালির বিবরণ বিশেষ নেই বলে মনে করি যে বাঙলার মুসলমান সমাজ মোগল যুগেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ভুলে যাই, কারণ জানবার সুযোগ আজও সৃষ্টি হয়নি, যে প্রায় ৩০০ বছর ধরে এদেশে একটা স্বাধীন সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র ছিল মোগলদের পূর্বে এবং যে রাষ্ট্র ছিল উক্ত ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রসূত। মনে রাখা উচিত যে, বাঙলার হিন্দুর ও মুসলমানের ভাষা মোগলদের পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং যে ঔদার্য ও ধর্ম-সমন্বয় চেষ্টার জন্য সম্রাট আকবর বিশ্ববিখ্যাত, তার দৃষ্টান্ত এই বাঙালি মুসলিম রাষ্ট্রে প্রায় ১০০ বছর পূর্বেই পাওয়া যায়। বাঙলা সমুদ্রমুখী এবং আমরা রক্তসম্পর্কে Tibeto-Mongoloid-Dravidian ও Austric জাতির নিকটআত্মীয় এ কথাও আমরা মনে রাখিনি।

এইরূপ আরো অনেক ব্যাপার আছে যার ঐতিহাসিক প্রভাব বাঙালির জীবনে ও মনে অজানিতভাবেই বর্তমান। মোগল আমলের জেরও এখনও জীবন্ত হয়ে আছে আমাদের মধ্যে, ইংরেজিয়ানার খোলস সেটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলতে পারে কিনা, চিন্তার বিষয়।

বাঙলার মুসলিম আমলের কোনও লিখিত ইতিহাস নেই। ভারতীয় মুসলিম সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও বহুমুখিনতার কথা মনে রাখলে এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হয়। গত ৫০ বছরের মধ্যে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের উদ্ধার ও অনুশীলন যে আশ্চর্য দক্ষতার ও সফলতার সঙ্গে হয়েছে, তা মনে রাখলে অনুরূপ চেষ্টায় বাঙলার মুসলিম যুগের কাগজপত্রও যে কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না তা বিশ্বাস হয় না, যদিও পুরাতন মুসলমান বংশ অনেক লোপ পেয়েছে এবং হিন্দু যেভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের মতো প্রাচীন পুঁথিগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে, মুসলমান সেভাবে করতে পারে না।

ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ডস কমিশনের উদ্যোগে বাঙলায় সম্প্রতি যে প্রাদেশিক অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে, তাদের চেষ্টায় এরূপ মুসলমানি পত্রাদি কিছু কিছু উদ্ধারও হয়েছে। মুসলমান সমাজের এদিকে নজর দেয়া কর্তব্য। বাঙলার আবহাওয়া কাগজ রক্ষার অনুকূল নয়; যা বাকি আছে যত্নের অভাবে তা-ও প্রতিদিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এরূপ অনুসন্ধানের কাজে অবশ্য অর্থ চাই; কিন্তু তার চেয়েও বেশি চাই সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম (Direction ও organization) পূর্ব

পাকিস্তানে এরূপ কাজে ব্রতী কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কল্পনাও করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি এদিকে না পড়লে কোনো আশা দেখি না। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির এখন কী অবস্থা, জানি না; তাদের প্রোগ্রামেও এ কাজের অনেকাংশ ঢোকান চলে। চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহেবের শুনেছি বিরাট পুঁথিসংগ্রহ আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে নাকি কিছু তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। এ পুঁথির মধ্যে মুসলমান ইতিহাসের যে তথ্যগুলো নিহিত আছে তার সংকলন করা দরকার।

সমগ্র পাকিস্তানে যে কয়টি Museum আছে তার মধ্যে দুইটি লাহোর ও পেশোয়ারে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে। অন্য দুইটির মধ্যে একটি ঢাকায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ট্রাস্টির পরিচালনায়। ভূতপূর্ব Curator ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মৃত্যুর পর হতে ঢাকা মিউজিয়ামও শুনেছিলাম বন্ধ ছিল; আশা করি এতদিনে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ভট্টশালী মহাশয়ের উৎসাহে ও অক্লান্ত চেষ্টায় মুসলিম বাংলার ইতিহাসের প্রচুর উপাদান এই মিউজিয়ামে সংগ্রহ করা হয়েছে; মুদ্রার collection এখানে সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে অতি অল্পেরই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ মিউজিয়ামটি রাজশাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী হিন্দু জমিদারের আনুকূল্যে বহুদিন হতে উত্তর-বাঙলার ইতিহাসোদ্ধারে এই সোসাইটি কাজ করে আসছে। এঁদেরই উৎসাহে ও নেতৃত্বে পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক মাল-মশলা আবিষ্কৃত হয়। সুখের বিষয়, এই সোসাইটি এখনও সক্রিয়তা হারায়নি– যদিও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে কিছুটা আড়ষ্টপ্রায়। মুসলমান বাংলার ইতিহাসোদ্ধারে এঁদের উৎসাহ কোনও কালে কম ছিল না; এঁদের নেতৃত্বে গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণের উৎসাহে বাঙালির ইতিহাসের বিরাট অংশ উদ্ধার হতে পারে।

পূর্ব-বাঙলায় পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের (Archaeological Survey) একটি প্রাদেশিক অফিস আছে। তার অধ্যক্ষের পদে একজন বাঙালি ছিলেন, সম্প্রতি তাঁকে সরিয়ে একজন অবাঙালিকে বসানো হয়েছে শুনেছি। বাঙলার মুসলিম রাষ্ট্রের কেন্দ্রভূমি **গৌড়-পাণ্ডুয়ার** ভগ্নাবশেষগুলোরও ভাগ হয়েছে শুনেছি– এই ইমারতগুলোর মধ্য দিয়েই পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সীমারেখা টানা হয়েছে। যুক্ত বাঙলাতেও এই অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যোগাযোগ ছিল না, এখন হয়তো আরও কমে যাবে।

ইমারতগুলোকে রক্ষা করা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি কর্তব্য; হয়তো সে কর্তব্য পালন হবে কিন্তু এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মালদহ-দিনাজপুর জেলায় মুসলমান আমলের যে সব স্থানগুলো এখন মাটির ঢিপিতে পরিণত হয়েছে সেসব স্থান খনন করে প্রাচীন মাল-মশলার অনুসন্ধানে, বোধ হয় এখন কোনো বাঙলারই উৎসাহ নেই। গৌড়ের দুর্গপ্রাকারের আশেপাশেই অনেক ঢিপি আছে যার ভেতর বহু শিলালিপি চাপা পড়ে থাকা সম্ভব। এরূপ একটা স্থানে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় যেসব মূর্তি, স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি আবিষ্কার হয়েছিল সেগুলো নিয়েই একটা ছোট মিউজিয়াম গঠন করা চলে এবং সেই উদ্দেশ্যে সেখানেই একটা ভাঙা ঘরে এলোমেলোভাবে স্তূপীকৃত হয়ে ছিল, দেখেছিলাম। দিনাজপুর জেলায় একডালা নামে এককালে একটি বিরাট পরিখাবেষ্টিত শহর ছিল– আয়তনে প্রায় কলকাতার সমান। এখন সে স্থানের কিছুই নেই, নাম পর্যন্ত লুপ্ত– কিন্তু ইতস্তত অনেক মাটির ঢিপি ছড়ানো আছে, যার নিচে চৌদ্দ শতাব্দীর এই শহরের নাগরিক জীবনের বহু পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের অপেক্ষায় আত্মগোপন করে আছে।

যুক্ত-বাঙলার গভর্নমেন্টের একটা ঐতিহাসিক রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট ছিল– পুরাতন কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদির বেশ বড় সংগ্রহ এখানে ছিল। বঙ্গবিভাগের ফলে সে ডিপার্টমেন্টের কাগজপত্রও ভাগ হবার কথা ছিল। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের আন্দোলনের ফলে কাগজপত্রের স্থানান্তর বন্ধ হয়েছে– নকল নেবার অধিকার পূর্ববঙ্গ সরকারকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যতদূর শুনেছি পূর্ববঙ্গে রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে ঐতিহাসিক কাগজপত্র বিশেষ নেই– বর্তমান গভর্নমেন্টের প্রয়োজনীয় ফাইল নিয়েই নাকি তাঁদের রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট চলবে। পুরনো অকেজো কাগজপত্র নিয়ে তাঁরা অফিসটি ভারাক্রান্ত করতে চান না। এরূপ মনোবৃত্তি সত্যিই উদ্বেগজনক।

সম্প্রতি পাকিস্তান ইতিহাস পরিষদের বৈঠকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ এবং কাজটি অতি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানীর ধৈর্য ও সাধনা ব্যতীত এটা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস লেখার অর্থ প্রোপাগান্ডা, যার ফলে সুঃয সৃষ্টি হয়, ইতিহাস নয়।

এ কথা সর্বভারতীয় ইতিহাসে যতটুকু খাটে তার শতগুণ বেশি খাটে মুসলিম বাঙলার ইতিহাসে, যার কাঠামো নির্মানের মাল-মশলারই অভাব। ঢাকা ইউনিভারসিটি কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ইবহমধষ-এর দ্বিতীয় খ-পড়লেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। রাজবংশের উত্থানপতন ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা ইতিহাসের কাঠামো মাত্র, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণে। কিন্তু মুসলিম বাঙলার ইতিহাসে সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, স্থূল কাঠামোরও অনেকাংশ অসম্পূর্ণ। করাচির একজন উচ্চপদস্থ অবাঙালি অফিসার এই ইতিহাসটি পড়ে কিছুদিন পূর্বে আমার কাছে আক্ষেপ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন: It is such a grim sort of history. Did not the Bengali muslims have any worthwhile social or cultural history?

এ প্রশ্নের জবাব বাঙালি মুসলমান ছাড়া আর কে দেবে?

[লেখক: গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ।]

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

ইতিহাসে উল্লেখ্য যে, আর্যভাষাভাষীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় করেছে নদীর গতিপথ ধরে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজন্যবর্গের দেশবিজয়ও অনুরূপ। অতঃপর, বিভাষী মুসলমান শাসকদের বাংলাদেশ বিজয়ও এর অন্যথা হয়নি। বাংলাদেশের উপর পাকিস্তান সেনাদের আগ্রাসী অভিযানও চলেছিল প্রথমে নদীর গতিপথের চারপাশ ধরে। স্বাধীনতাসংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আক্রমণও শুরু হয় নদীর গতিপথ ধরে ঢাকা অভিমুখে। জনগণনা সম্পৃক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যাবে, তপসিলি সম্প্রদায়ের বেশি বসবাস সমুদ্রের তীরে, জঙ্গলাকীর্ণ প্রত্যন্ত গ্রামে। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আর্যরা মাটির সন্তানদের বিতাড়িত করতে পারেনি, (শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ, *পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস*, ১৩৬২, বিশ্বভারতী, পৃ-৪ ও অন্যান্য)। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ মানুষের নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনাহীন কৌম-সমাজের গ্রামজীবন, তারই উত্তরাধিকার নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের আগমন ও বাঙালির ক্রমউত্থান; তাকে কোনোভাবে ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। মধ্যযুগের ইউরোপ ছিল চার্চের সঙ্গে ব্যক্তি উপলব্ধ দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজ-ভাবনার দ্বন্দ্বমুখরতায় আকীর্ণ। কিন্তু বাংলার সমাজ-ভাবনায় ব্যক্তিত্বের সংকট, নতুন চিন্তা-চেতনার উত্থান নেই বললেই চলে। যা উজ্জীবিত হয়েছে, তা প্রায়শ ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে আপোসসূত্রে। বিশেষত শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। মূলত মানুষ ইহলৌকিক-পারলৌকিক চিন্তা-চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রে দেহতত্ত্ব ছাড়া কোনো নতুন চিন্তার প্রকাশই করতে পারেনি। অঞ্চলভেদে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জনজীবনে ব্যাপক ভাঙাগড়া হয়েছে সত্য, কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক ও ধর্মভাবনার পরিবর্তনে তারা ছিল মুখ্যত নিস্পৃহ। এই চলমানতা কোথাও গুরুত্বপূর্ণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানা যায় না। তাই দেখা যায়, মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে ১৭৪৫ সালের দিকে নবাব আলিবর্দি বর্গিদের পিছন ধাওয়া করতে গিয়ে বর্ধমান থেকে কাটোয়া যাওয়ার পথে নিদারুণ খাদ্যাভাবে যখন মাত্র তিনপোয়া খিচুড়ি ও সামান্য সাত টুকরা মিঠাই খেয়ে সাতজন আমিরসহ চার দিন কাটিয়েছিলেন, তখন কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসী কর্তৃক তাঁদের খাদ্য দিয়ে সাহায্যের সংবাদ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, এই ঘটনার মাত্র দেড়যুগ পরে যখন সামান্য সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে (১৭৫৭) প্রহসনমূলক যুদ্ধে হারিয়ে শহর মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন,

তখন তৎকালের লন্ডন শহরের থেকে বড় এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত শহর মুর্শিদাবাদের নাগরিকরা যদি ক্লাইভের দিকে একটা করেও ইট নিক্ষেপ করত, তাহলেও ক্লাইভের মুর্শিদাবাদে প্রবেশ সহজসাধ্য হত না। অথচ, নবাব সিরাজের পলাশীর প্রান্তরে পরাজয়ের সংবাদ জানা সত্ত্বেও কোনো প্রতিবাদ না করে, রাজপথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে তারা ইংরেজদের উল্লাস দেখেছে মাত্র। যদিও, যদুনাথ সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিক এই ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন, দুর্বিনীত নবাবি শাসনের কারণে সমসাময়িক জনগণের বিপর্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে। কিন্তু প্রথমে আলিবর্দি সম্পর্কিত তথ্যে উদ্ধৃত জনগণের নিস্পৃহতার সঙ্গে শেষোক্ত সিরাজদ্দৌলার পরাজয়-উত্তর ক্লাইভের মুর্শিদাবাদে প্রবেশের প্রাক্কালের জনগণের নিস্পৃহতার তাৎপর্য এই সূত্রে বিশ্লেষণ বা বিচার করলে ভুল হবে। কেননা, নবাব আলিবর্দি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বৃদ্ধ বয়সে বর্গি তাড়াতে গিয়েছিলেন। আরো পরে, সম্প্রতিকালে এই নিস্পৃহতা বিষয়ে আর একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে। ঘটনাটি হল : ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রীরূপে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ সফরে গমন করেন। তখন ওই অঞ্চলের কৃষকরা, এমনকি মুসলিম লীগের সদস্যবৃন্দও তাঁর কাছে পাকিস্তান বিষয়ক কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন তুলেননি, শুধু দাবি জানিয়েছিলেন পাটের মূল্যবৃদ্ধি ও মহাজনের সুদ থেকে রক্ষা করতে। অথচ তখন, পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন তুঙ্গে। অতএব, মনে হয় বিষয়টি কিছুটা বাঙালির মজ্জাগত ঔদাস্যবোধ থেকে উৎসারিত। অধিকন্তু এই ঔদাস্য বা নিস্পৃহতা যে আত্মসচেতনতার দুর্বলতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়, তা বলাই বাহুল্য।

তবু বাঙালি যে নিরন্তর আত্মসচেতনতাহীন অবস্থায় থেকেছে, তা যথার্থ নয়। সম্পূর্ণ ধর্মবিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধের উৎসধারায় প্রধানত দু'বার তাকে প্রতিবাদী হতে দেখা যায়, প্রথমে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময়। এই সংগ্রাম, এই আত্মত্যাগ, অতীতের যা কিছু ম্লানতা, আত্মকেন্দ্রিক ঔদাস্য, সমস্ত বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে বাঙালির সংগ্রামী মনোভঙ্গিমার এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এ কারণে দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস থেকে ইংরেজ ও পাকিস্তানি শাসনের মোটামুটি দু'শ বছরের ইতিহাস অনেক বেশি ঘটনাবহুল, আত্মসচেতনতাসমৃদ্ধ, সংগ্রামে বৈচিত্র্যময়– পরিবর্তনপ্রিয়, মৌলিক চিন্তার বিকাশে সমৃদ্ধ। তবে জাতীয় জীবনে সংগ্রামের এই উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টির পিছনে শুধু বাঙালি মুসলমানের একক অবদান আছে বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে প্রধানত অবদান তার হলেও সকল ধর্মাবলম্বী ও প্রকৃতিপূজারি মানুষের সহযোগিতা-ত্যাগ ব্যতীত এই সাফল্য অর্জিত হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে আত্ম-অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার শক্তি সঞ্চয় পৃথিবীতে নতুন নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের আলোকে চলতি শতকের প্রথমার্ধে কয়েকজন বাঙালি মুসলমান চিন্তাবিদ এ সম্পর্কে বিশেষ সমন্বয়ধর্মী চিন্তাচর্চা করেছিলেন, সমকালে সেই বক্তব্যের প্রতি এক শ্রেণির মানুষের যথেষ্ট উপহাস প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তাচর্চার যথার্থতা পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের সার্থকতা ও এই আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি রূপে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তার অব্যর্থ প্রমাণ। মূলত কম-বেশি হাজার বছর আগে দুর্বল বাঙালি মুসলমানের যে সত্তার শিকড় এদেশের মাটিতে প্রোথিত হয়েছিল, কালিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলমান হিসেবে দৃঢ় আত্মপ্রকাশের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ-উত্তর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তারই ঐতিহাসিক পরিণতি।

* বাংলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মৌলভী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ছাহেবের চুয়াডাঙ্গা শুভাগমন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা মুসলিম লীগের অভিনন্দন পত্র : ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৭; শান্তি প্রেস, চুয়াডাঙ্গা (নদীয়া) থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ সহ ১২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। পৃ.২।

[লেখক: গবেষক।]

বাঙালি মুসলমান: পর্যাবৃত্তের ইতিবৃত্ত

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

আবুল হুসেন ১৩৩৫ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার *প্রবাসী*তে 'বাঙালি মুসলমানের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আজ কি অর্থে, কি শিক্ষায়, কি জ্ঞানে, কি গভর্নমেন্টের চাকরিতে সব জায়গাতেই মুসলমানের ঠাঁই করতে হচ্ছে ভিক্ষা চেয়ে। পক্ষান্তরে ধর্মের দোহাই দিয়ে আস্ফালন করে বেড়ানোই হয়েছে আমাদের সকল দৈন্য লুকিয়ে রাখবার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই দৈন্যের জন্য সে তার অতীতের নির্বুদ্ধিতাকে দায়ী না করে দায়ী করছে অগ্রগামী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু সমাজকে, আর আঁকড়ে ধরছে বটবৃক্ষে আশ্রিত কাকের মতো ব্রিটিশের হাত, এই ভয়ে পাছে হিন্দুরা ঘাড় ধরে তাকে খোর্মা-খেজুরের দেশে তাড়িয়ে দেয়। এতে করে সে নিজেই যেন স্বীকার করছে, সে পরগাছা, এদেশে তার কোনো শিকড় নেই।'[১]

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতাজনিত সমাপ্তি লগ্নে উল্লিখিত প্রবন্ধটি লিখিত। মূলত সমসাময়িককালে যে বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও তার পারিপার্শ্বিক প্রভাব বাঙালি মুসলমানকে উত্তেজিত, দিশেহারা ও কখনো কখনো পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন করে তুলেছিল, আবুল হুসেনের সতীর্থ আরো অনেকের লেখাতেও তা দুর্লক্ষ নয়। একদিকে ধর্মভাবনা, মুসলমানিত্ব প্রতিষ্ঠার অপূর্ব কল্পনা, অন্যদিকে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের পাশ্চাত্যের উদার গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস, ধর্মবিকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, এই সাযুজ্যহীন চেতনাপ্রবাহ ও দ্বন্দ্ব বর্তমান শতকের বিশের দশক থেকে প্রখর হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট সত্য অন্বেষণ আদৌ সাফল্য লাভ করেছিল কিনা, এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ও বিস্তার বাঙালি মুসলমান সমাজে কিভাবে হল, এই সব জিজ্ঞাসা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে আবুল হুসেনের উদ্ধৃতি দিয়ে। উপরোক্ত প্রবন্ধটিকে যদি বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের কাল থেকে অতীতে গমনের মধ্যবিন্দু কল্পনা করি, তাহলে গাণিতিক নিয়মেই এই যাত্রা শুরুর লগ্ন চলতি শতকের প্রারম্ভকাল থেকে। কিন্তু কোনো কিছুই সাল-তারিখ ধরে সৃষ্ট হয় না। সামাজিক কার্যকারণ নিয়মের শুরুর শেষ যেমন আছে, শেষেরও শুরু আছে তেমনি।

মুঘল আমলে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরল থাকার জন্য সমাজও যে সরল আনুভূমিক ও লম্ব ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সরলতার পাশাপাশি যে সমাজ শোষণমুক্ত ছিল, তা মোটেই সত্য নয়। বরং সরল সামাজিক কাঠামোর সুযোগ যে রাজন্যবর্গের শোষণ পূর্ণ মাত্রায় চলেছিল, তা সহজেই জানা যায়। ফলে শোষণের স্বার্থে সমাজে শ্রেণি ও বর্ণ যে ক্রমাগত শক্তিশালীভাবে বিকশিত হচ্ছিল, তা অনুমান করতে প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। এই প্রেক্ষিতেই ওই সময়ের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, মুসলমানদের চিন্তাধারা, সামাজিক প্রবাহধারার প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেটুকু ছিল, তা ছিল রাজদরবারে,[২] রাজন্যবর্গের আত্মকলহের দুর্বলতার সুযোগে সাম্প্রদায়িকতা সেখানে প্রকাশিত হত, অন্য দিকে পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব যে স্থায়ী ও ক্রমচলমান হত, তা যথার্থ নয়। রাজপ্রাসাদকেন্দ্রিক ক্ষমতার লড়াইয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মবোধ কোনো প্রভেদ সৃষ্টি করেনি, তা মুঘল আমলের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শহরের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রধান দিক হচ্ছে এর প্রাসাদকেন্দ্রিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমুখিতা। হত্যা, অত্যাচার-ষড়যন্ত্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে তাকে সাম্প্রদায়িকতায় রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা যে তখন অবশ্য ছিল না, তা নয়; কিন্তু সংক্রামকের মতো তা বিস্তৃত হতে পারেনি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার কারণেই। নগরের পাশাপাশি যদি গ্রামজীবনের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব, হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র সমাজভাবনামূলক অস্তিত্ব মুঘল আমলে স্ফটিক আকার ধারণ করতে পারেনি, কারণ মুসলমান সমাজের প্রধান প্রতিভূ হিসেবে যে মুসলমান শাসকই সিংহাসনে আসীন হতেন, তিনি প্রধানত রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করে নিতে ইতস্তত করতেন না। আকবর যদিও এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তিনি এর একমাত্র অনুসারী নন এবং এটা আকবরের মৃত্যুর পরেই শেষ হয়ে যায়নি। ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমান জমিদারদের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই তাৎপর্যেই কোনো ধর্মভীরু আত্মস্বাতন্ত্র্যকামী আপাত সংখ্যালঘু শ্রেণির মুসলমানই যেমন তার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে সমকালীন কোনো মুসলমান সম্রাট বা জমিদারকে একক ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান শাসক হিসেবে দাবি করতে পারত না, তেমনি কোনো হিন্দুও কোনো মুসলমান শাসককে সামাজিক সম্পর্কের খাতিরে অস্বীকার করার প্রয়াস পেত না। সম্রাট-নবাবদের এই মিশ্র রাজনৈতিক অবস্থান অবশ্যই গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমানদের খুব বেশি চিন্তিত করত না সত্য, কিন্তু শাসকদের ব্যাপক মানুষের মনে স্থান করে নেয়ার জন্য এটাও ছিল অন্যতম পরোক্ষ উৎস। যদিও কার্ল মার্কসের মতে ভারতের তথা বাংলার

গ্রামগুলো উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং লবণ ক্রয় ছাড়া তাদের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না, তথাপি রাজন্যবর্গের, মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণের কারণেই তাদের চিন্তা-চেতনা যে যথার্থ আত্মকেন্দ্রিক ছিল না, তা-ও সত্য। উচ্চ শ্রেণির শোষণের কারণে যে নিম্নশ্রেণির বা শোষিত শ্রেণির অর্থনৈতিক ও সামাজিক আত্মস্বাতন্ত্র্যের অধিকার রক্ষার আন্দোলন সৃষ্টি হয়, ফরাসি বিপ্লব থেকে এ সত্য আমরা শিখেছি। মধ্যযুগের ভারতে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি তা সত্য নয়। হয়তো তা বিপ্লবী চেতনা বলতে অধুনাকালে যা বোঝায় তার পরিপূরক ছিল না, কিন্তু জাহাঙ্গির বা আওরঙ্গজেবের আমলে দাক্ষিণাত্যে সংঘটিত কয়েকটি কৃষক বিপ্লব থেকে এ সত্য উদ্ধার করতে পারি। গ্রামের সাধারণ মানুষের এই যে না ইতি, না নেতিবাচক অবস্থা, এই দুর্মর অবস্থান অবশ্যই সমকালে এক বৃহত্তর সামাজিক ঔদাসীন্যবোধ সৃষ্টি করেছিল, যা পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনলগ্নে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। আরো স্বীকার্য যে, গ্রামের হিন্দুদের মতো মুসলমান সমাজে বৃহত্তর একান্নবর্তী পরিবারও তেমন সৃষ্টি হয়নি। সম্পত্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিভাজনেই এর পিছনে মূলত দায়ী ছিল, তা-ও ঐতিহাসিকরা বলেছেন। ঐতিহাসিক বা অর্থনীতিবিদরা আরো বলেছেন, হিন্দুরা কাশী-বৃন্দাবনে তীর্থে গেলেও তাদের মানসিক দিগন্ত মুসলমানদের থেকে বিস্তৃত ছিল তা সত্য নয়। অন্যদিকে মুসলমানের জন্য আরবে হজ্ব করার উদ্যোগ যে চিরদিনের জন্য দুঃখজনকভাবে আত্ম-পরিজন, স্বদেশত্যাগের নামান্তর, তা-ও বলা প্রয়োজন। অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিতগত সীমাবদ্ধতা ছিল নানাবিধ এবং দৃঢ়।

সমকালীন লোকসাহিত্যে, রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে পোষিত কবি কর্তৃক রচিত কাহিনীকাব্যে চরমভাবাপন্ন অন্ধ ধর্মমত যে খুব বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল, তা বলা চলে না। আসলে তখন বাংলার জনমানস ছিল স্থূলবদ্ধ প্রযুক্তি ও শ্রেণিবদ্ধ উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লোকজ ধর্মভাবনা ছিল এই শ্রেণিবদ্ধ সমাজে আত্মভাবনা আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ যখন এদেশে শাসনক্ষমতা দখল করল, তখন জনজীবন প্রথম অভিঘাত সৃষ্টি হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনে– ইংরেজের ক্ষমতাদখলের প্রায় তিন দশকের বেশি সময় পরে। যদিও মুঘল আমলের জমিদারের সঙ্গে ইংরেজ আমলের জমিদারের শাসন ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ছিল, তথাপি তাঁরা ছিলেন 'ধনী, ক্ষমতাবান ও সংখ্যায় প্রচুর' এবং সরকারের সঙ্গে এঁদের সম্পর্কের বিষয়ে জন শোরের বক্তব্যানুযায়ী বলা যায়, 'সরকারের সঙ্গে জমিদারের এবং জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্পর্ক মালিকেরও নয়, অনুচরেও নয়, বরঞ্চ এই দুয়ের এক সংমিশ্রণ'।[৩] মুঘল আমলে যে হিন্দু জমিদার অল্প ছিল তা যথার্থ নয়, অন্য দিকে ইংরেজ শাসনামলে যে মুসলমান

জমিদার একবারে অল্প ছিল না, তা-ও সত্যের অপলাপ মাত্র। আবার নবাবি শাসনামলে যে হিন্দু জমিদারের সংখ্যাধিক্য ছিল, তা-ও মিথ্যা নয়। জমিদারের এই সম্প্রদায়গত অবস্থার হ্রাস-বৃদ্ধি, তা যে রাজনৈতিক কারণে তা বলা বাহুল্য হবে না।

এই পর্যাবৃত্তেই ইংরেজ শাসন-উত্তর বাঙালি মুসলমান সমাজ খুব বেশি আলোড়িত হয়েছে তা বলা যায় না। অন্তত ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ ইংরেজদের নিয়ে খুব বেশি ভেবেছে, তেমন কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। সত্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ও কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা প্রায় কাছাকাছি সময়ে হয় এবং উভয়বিধ উদ্যোগই ছিল ইংরেজ শাসনব্যবস্থা সম্পৃক্ত তাবেদারি শ্রেণি সৃষ্টির অন্তর্গরজে। তবে, লর্ড হেস্টিংসের স্থানীয় সমাজ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবিকৃত রেখে শাসন করার নীতি অবিলম্বে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং কলকাতা মাদ্রাসার গুরুত্ব আপাতত হ্রাস পেয়ে ১৮১৭ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের প্রতি ইংরেজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ইতোমধ্যেই কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষিত একটি মুৎসুদ্দি শ্রেণি তৈরি হয়েছে, যারা ইংরেজ শাসনানুকূল্যে স্বীয় সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধিতে তৎপর। এই শ্রেণির সবাই বাঙালি হিন্দু; পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে যাদের প্রায় অকুণ্ঠ সমর্থন। মূলত তাদের নিয়েই ইংরেজ শাসক শুরু করল তাদের নতুন শোষণ নির্মাণের পরিকল্পনা। এই ভারতের নাগরিকরা হবে উইলিয়াম রেবিংটন মেকলের নীলনক্সা অনুযায়ী চামড়ায় কালো, কিন্তু সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজদের মতো, এবং যারা সুদূর গ্রাম থেকে করের টাকা তুলে এনে অম্লান বদনে ইংরেজদের কোটের পকেটে রেখে দেবে। ইংরেজদের এই পরিকল্পনা যে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল, তা পরবর্তীকালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়।

উপরোক্ত উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে মুসলমানদের স্বীয় সৃষ্ট আত্মকেন্দ্রিকতা খুব বেশিদিন যে ছিল তা নয়। ওহাবি ও ফারায়েজি আন্দোলন এই আত্মকেন্দ্রিকতা সৃষ্টির মূলে অন্যতমভাবে কাজ করলেও সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকেই প্রথমে কলকাতাকেন্দ্রিক মুসলমানদের আত্মজাগরণ শুরু হয়,[৪] অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর-ভারতে। উত্তর-ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের আন্দোলন কলকাতার নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর আন্দোলনের সমধর্মী হলেও কার্যপদ্ধতিগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির বিধায় নেতৃত্বগত দ্বন্দ্বও অপ্রকট থাকেনি।

এই সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও ইংরেজিশিক্ষিত কেরানিকুল সৃষ্টি, যারা মোটামুটি আত্মসচেতন কিন্তু ইংরেজ শাসকদের সহায়তা করার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির এই যে আকাঙ্ক্ষা এবং আরবি-ফারসি শিখে যে এই

আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় হিন্দুর মতো অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করা, এই বোধোদয় হতে মুসলমানদের সমগ্র উনিশ শতক লেগে যায় এবং এটা যখন তারা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে পারল, তখন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করেছে, মধ্যযুগের গঠিত একান্নবর্তী পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে, হিন্দুসমাজের চারপাশে মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভাঙনের সমূহ শব্দে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত।

অধিকাংশ গবেষকই লিখেছেন, সাম্রাজ্য হারানোর কারণেই ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমানরা প্রথম পর্যায়ে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে সুযোগ পেয়ে হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়ে যায়; তারা নিজেদের গঠিত করে নেয়, পিছনে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে থাকে মুসলমানরা। কিন্তু পাশাপাশি এ তথ্যও বলা প্রয়োজন, বাঙালি মুসলমান ও শাসক মুসলমান কি একই শ্রেণি থেকে উদ্ভূত? মোটও তা নয়, এবং উভয় শ্রেণির মধ্যে রয়েছে মেরু-বিপরীত ব্যবধান। শাসকের সঙ্গে সাধারণ বাঙালি মুসলমানের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সম্পর্কই-বা কতটুকু ছিল তা নিয়েও তেমন বিস্তারিত বিশ্লেষণ এখনো হয়নি। এই শ্রেণিগত ফাঁক, এটাই রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যবহার করেছে ইংরেজরা, কিংবা কখনো হিন্দু ধনিক শ্রেণি। বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হয় না। অন্তত তাঁদের চোখেও যে বিষয়টি ধরা পড়েছিল, সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তার কোনোরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং তখন অনেকেই বুঝেছিলেন যে, বাঙালি মুসলমানের বড় দুর্দিন যাচ্ছে, অতএব এ থেকে উদ্ধারের পথ হচ্ছে ধর্মচর্চা; ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আত্মিক জীবনকে উন্নত করা ছাড়া জীবনকে প্রাথমিকভাবে সুখমণ্ডিত করা যাবে না। ইহকাল অপেক্ষা পরকালই মুসলমানের প্রধান লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত। এ প্রেক্ষিতেই ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ও সৎ না হলে সমাজ সৎ হবে না, এবং ব্যক্তিগতভাবে সৎ না হলে পারলৌকিক উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। এই চিন্তার মধ্যে অবশ্য সত্য ও আদর্শের কল্পনা বিদ্যমান, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের জন্য গঠনমূলক। তবে এর প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে, এর মধ্যে অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা ক্রিয়াশীল নয়। অর্থ হয়তো অনর্থের মূল, কিংবা পারলৌকিক জীবনের শান্তি অর্জনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে ভেবেই তাঁরা যে অর্থনৈতিক বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি, তা হয়তো সত্য না-ও হতে পারে। তবে বিষয়টিকে যে তাঁরা সচেতনভাবে হোক আর অসচেতনভাবে হোক উপেক্ষা করেছিলেন, তা সত্য।

ইতোমধ্যে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ বুঝতে পেরেছেন– তাঁরা এককভাবে ইংরেজদের সহায়তা করে ভুল করেছেন। লর্ড রিপন (১৮৮০-'৮৪) থেকে যে মুসলিম-বন্দনা শুরু হয়েছে, তা উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে ক্রমশ দৃঢ় হতে হতে

চলতি শতকের প্রথমেই বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেলে তা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়। তখন হিন্দু মধ্যবিত্তের তরুণ একাংশ কংগ্রেসের উপর আর আস্থা না রেখে সক্রিয় বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ বিতাড়িত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মুসলমান সমাজের নব গঠনোন্মুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে যদি হিন্দু মধ্যবিত্তের সহযোগী করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে ভালো ছাড়া মন্দ হবে না, ইংরেজ সরকারও 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি সম্যকভাবে সফল করতে পারবে না। কিন্তু সে পরিস্থিতি যে বিগত হয়েছে, তা-ও বোঝা গেল কংগ্রেসের নেতৃত্বে খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। তাহলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠবে বা উঠতে পারে– এই সব চিন্তাচর্চা কি জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে ঋদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোনোই মূল্য রাখবে না? সমাজের এই যে টানাপোড়েন, সবই কি শুধু নিষ্ফলতায় ভরা? বাঙালি মুসলমানের প্রকৃত অভীপ্সা কী এবং নেতৃত্বগত স্বার্থই-বা কী? বাঙালি মুসলমান তার প্রকৃত চাওয়া-পাওয়ার কাছাকাছি কেন পৌঁছতে পারেনি?

এ সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনায় রেখে বলা যায়, বাঙালি মুসলমানের আগে বাঙালিত্ব না আগে মুসলমানিত্ব এ নিয়ে দ্বন্দ্বের যেমন শেষ ছিল না, তেমনি তাদের লক্ষ্য বা অভীপ্সা নির্ণয়ের ব্যাপারও তারা দ্বন্দ্বহীন ছিল না। বাংলার মাটি ছেড়ে বাঙালি মুসলমানের অন্যত্র শিকড় অন্বেষণের অগ্রসরসূচক এই দ্বন্দ্বের পরিচয় আমরা পাই নবাব আবদুল লতিফের ১৮৮২ সালে হান্টার শিক্ষা কমিশনের সাক্ষ্যে বাঙালি মুসলমানের বিদ্যা-অর্জনের ভাষা উর্দু হিসেবে বিবেচিত করার প্রশ্নে কিংবা, নিজ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান মোহামেডান লিটারারি সোসাইটিতে (১৮৬৩) বাংলা ভাষায় আলোচনা করার বিষয়ে নিস্পৃহ মনোভাব প্রদর্শনে; এই দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই মওলানাদের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মধ্যে উর্দু ভাষায় ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা করা থেকে; এই দ্বন্দ্ব আমরা বুঝতে পারি, এদেশের সমস্ত মুসলমান আরব-ইরান থেকে এদেশে এসে স্থায়ী হয়েছে, তারা ভারতীয় রক্ত বা বর্ণসংকর নয় বিষয়ক জোরালো বক্তব্য প্রদান থেকে। এ রকম অজস্র উপমা আছে। কিন্তু এগুলো যে যথার্থ বা সত্যনিষ্ঠ নয়, কিংবা এইসব বক্তব্য সত্য হলেও তা আংশিক, তা হয়তো কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত বক্তব্যসমূহে এমন একটা দ্ব্যর্থহীন রোমান্টিকতা, আভিজাত্যের স্পর্শ এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যা আছে, তা হল উচ্চ বংশীয় হিন্দুদের মতো নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশের নিদারুণ অবকাশ, তা সমকালীন নেতৃবর্গ অনেকাংশেই উপেক্ষা করতে পারেননি। এই সব প্রতীপ-বিপ্রতীপ দ্বন্দ্ব সরলীকরণের মধ্য থেকে আবার অনেক নেতা, ধর্মপ্রচারক বাঙালি মুসলমানের উদ্ধারকল্পে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা করেছেন বাংলা ভাষায়, শরিয়তি আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বংশের বদলে, পীরপ্রথার বিপরীতে নৈতিকতা ও সততাকে ধর্মের প্রধান অবলম্বন হিসেবে প্রমাণের

চেষ্টা করেছেন, জাতিভেদ তুলে দেয়ার প্রস্তাব রেখেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে নারীশিক্ষা ও নারীর স্বতন্ত্র অধিকারের প্রতিষ্ঠাও কামনা করেছেন আন্তরিকভাবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে বিখ্যাত মুন্সীদ্বয় মেহেরুউল্লাহ ও জমিরউদ্দিনের কথা। ধর্মপ্রচার যে মাতৃভাষায় না হলে মঙ্গল থেকে অমঙ্গল বেশি, তা তাঁরা নিজেদের নিম্নবিত্ত সামাজিক অবস্থা থেকেই ভালোভাবে বুঝেছিলেন। অন্যদিকে মওলানা আকরম খাঁ'র নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মুসলমান সমাজ থেকে দূরে অবস্থানের কারণে বিষয়টি বুঝতে তাঁর সময় লেগেছিল। কিন্তু তাঁর বুঝতে সময় লাগেনি যে, আর্য সমাজের (১৮৭৫) ন্যায় মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতির জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯১৩ সালে বগুড়া জেলার বানিয়াপাড়া গ্রামে *আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা* গঠন করেন। পক্ষান্তরে 'বিধবা-গঞ্জনার' মূল দুর্বলতা ও নারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে, সামাজিকভাবে মুসলমান, বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা যে 'এক পাখা ভাঙা পাখির মতো' হবে– তা বুঝতে মুনসী মেহেরুল্লাহ বা ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সময় না লাগলেও তৎকালীন বিখ্যাত পীর মৌলানা আবদুল্লাহ হেল বাকী (১৮৯০-১৯৫২) ও আবদুল্লাহ হেল কাফী (১৯০০-'৬০) তা অনুধাবনে সমর্থ হননি। সে পরিচয় পাওয়া যায় মাসিক 'আহলে হাদিস' (১৯১৫-'২৭) পত্রিকায়। নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে এই পত্রিকার মন্তব্য ছিল : 'পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতির অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাধারণ মোসলেম রমণীগণকে যে পর্দার অন্তরালে গৃহের অভ্যন্তরে থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা যে কোমল কণ্ঠে কথা বলিতে গেলে পাপমতির পাপ-প্রলোভন যারপরনাই বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? তাহাদিগকেও পয়গম্বর-পত্নীগণের ন্যায় অন্য পুরুষের সহিত কর্কশভাবে কথা কহিতে হইবে' (আষাঢ়, ১৩২৪; পৃ. ৪৪১)। অতঃপর ইসলামে নারীদের যে স্বাধীনতা রয়েছে, তার উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা হয়, 'মলমূত্র ত্যাগের জন্য, রান্না কাজের জন্য বিশেষ অনুমতি ছাড়াই বাইরে যাওয়া যায়', (পৌষ ১৩২৪ পৃ. ২০৬)। বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের রূপরেখা সম্পর্কিত এসব 'ফতোয়া'-বক্তব্য যখন বিশেষ দশকে প্রকাশিত হয়, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, সমাজ নিয়ে চিন্তা করা বা উপদেশ দেয়ার জন্য লোকের অভাব না থাকলেও, সমাজে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তির অভাব ছিল। এই অভাবের প্রেক্ষিতেই, সময়ের অভিঘাতে সমসাময়িককালে একদল তরুণ যুক্তিবাদী লেখক চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে।

১৮৯০ সালে মৌলবী মেয়ারাজ উদ্দিন ও শেখ আবদুর রহিম 'সুধাকর গোষ্ঠী'র পক্ষ থেকে যে কথা প্রায় অগোচরে বলেছিলেন যে, সকল স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার না করতে পারলে একাধিক বা চার বিবাহ করা অনুচিৎ অর্থাৎ 'যদি আশা কর যে,

ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে তোমরা বিবাহ করিবে।'[৫] সেই একই কথা এবার আবার বললেন কাজী ইমদাদুল হক, বর্তমান শতকের প্রথম দশকে (ঐস্‌লামিক যৎকিঞ্চিৎ (ক), *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলি*, ১৯৬৮, ঢাকা, পৃ. ৩৮৩)। নারী যে সমাজেরই অনিবার্য অংশবিশেষ, সমাজের সার্বিক উন্নতির অন্যতম মৌলিক শর্ত নারীসমাজের উন্নতি, তারাও 'মানুষ', তা মনে করিয়ে দিতে চাইলেন বেগম রোকেয়া, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধসমূহে। 'মাসিক মহিলা'র ১৯০৩ সালের মে, জুন ও জুলাই ত্রয়ী সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'অলঙ্কার বা Badge of slavery?' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে নারীস্বাধীনতার বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। ফলে, শুধু মুসলমান সমাজ নয়, সমসাময়িক ব্রাহ্ম সমাজের কোনো কোনো সদস্য তাঁর প্রবন্ধের বিষয়ে কুপিত হয়ে ওই পত্রিকায় একাধিক চিঠি পাঠিয়েছিল।[৬]

মুসলমান সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক উল্লিখিত তর্ক-বিতর্কের পাশাপাশি আরেকটি জিজ্ঞাসা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল– বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী? উর্দু অথবা বাংলা? তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রভাবশালী সমাজনেতৃবৃন্দ বাঙালি মুসলমান সাধারণের ওপর উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার কর্মে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রতিবাদ এসেছিল তরুণদের পক্ষ থেকে। তাঁরা ছিলেন চিন্তায় সংস্কারমুক্ত এবং বক্তব্যে বলিষ্ঠ। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন, 'বঙ্গভাষা এখন কেবল বঙ্গীয় হিন্দুর মাতৃভাষা নয়, ইহা বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা বটে। উচ্চপদ বিশিষ্ট অনেক মুসলমান ইহা স্বীকার করিতে না চাহিলেও আমাদের ন্যায় গরিব-দুঃখীদের এ সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই বা মতান্তর নাই। ... বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কী হইতে পারে? যাহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।' (মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান', সম্পাদকীয়, 'নবনূর', পৌষ, ১৩১০, পৃ. ৩৪৮)। তারপরে তিনি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'হে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ, একবার নিজেদের প্রমোদ-আগার ও বিলাসশয়ন পরিত্যাগ করিয়া বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখ তোমরা কোথায় দাঁড়াইয়া আছ। তারপর নিজেদের জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চয়ার্থ বদ্ধপরিকর হও' এবং আরো বললেন, 'এস, আমরা এই 'বঙ্গদেশকে মাতৃভূমি বলিয়া বরণ করিয়া লই।' (পূর্বোক্ত পৃ. ৩৫৩)।

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা যে 'বাংলা ভাষা ব্যতীত আর কী হইতে পারে' পূর্বে উল্লেখিত 'আহলে হাদিসে'র প্রবন্ধেও সেই বক্তব্য বিধৃত হয়েছে এবং বিষয়টি

যে ত্রিশের দশক পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান সম্পর্কিত আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল, তা জানা যায়। এই সময়ে একাধারে স্বদেশ-প্রীতি ও আত্মজাগরণের প্রয়াস এবং অন্যদিকে ধর্মের মূল লক্ষ্য যে 'সততা', এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ মুক্তবুদ্ধিনির্ভর, বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। আবুল হুসেন প্রবন্ধ লিখলেন 'সুদ ও রেবা'। তিনি সুদকে হালাল করবার প্রস্তাব করছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বললেন যে, সুদ ও রেবা এক নয়। তিনি আরো বললেন, সুদ ইসলামের অপ্রচলিত প্রথা নয়। এই সব বক্তব্যের জন্যে তাঁরা বিশেষভাবেই সমালোচিত হয়েছিলেন। আবার এই সমালোচনা যে 'অনুচিত হয়েছিল' এবং তাঁদের উপর 'বিশেষ অবিচার' করা হয়েছিল, তা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'সুদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'য় (বৈশাখ, ১৩৩৫, ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃ. ৮৯২-৮৯৫; আলোচনা) ব্যক্ত হয়েছে। যদিও এই আত্মোপলব্ধি অনেক দেরিতে হয়েছিল, তথাপি, বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি যে ক্রমান্বয়ে অর্থনীতি বিষয়ক ভাবনার দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, তার পরিচয় এখানে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

বাঙালি মুসলমানের বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাতের এই সূচনালগ্নে তথাকথিত লোক-দেখানো 'বক-ধার্মিকতার' প্রতিও যে যুক্তিবাদী লেখকদের দৃষ্টি পড়েছিল, তা আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ', মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'বাঙালি মুসলমান', 'মোল্লারাজ্য', কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রবন্ধ, কাজী মোতাহার হোসেনের 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ', মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লেখক' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ পাঠে জানা যায়। প্রসঙ্গত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লিখেছেন, 'কার্যক্ষেত্রে কী দেখতে পাই– মুসলমান হয়ে আছে জগতে কাপুরুষ, পাপাসক্ত, ভীরু, লম্পট, মূর্খ, কু-তার্কিক, মিথ্যাবাদী এবং হৃদয়হীন,– এক কথায় সে একটা বেহদ্দ অমানুষ!.. এক রোজা-নামাজ ছাড়া মুসলমানদের যেন আর কোনো কিছু করবার নেই, ভাববার নেই– দরদ, সেবা, মনুষ্যত্ব, ... শুধু রোজা-নামাজের চরম সার্থকতার সর্বনেশে অন্ধ বিশ্বাস মুসলিম নর-নারীকে পশুত্বে পরিণত করেছে।' (*মোয়াজ্জিন*, আষাঢ়, ১৩৪০, ৩য় সংখ্যা, পৃ: ৬৯-৭০)। এই বক্তব্য সমকালীন বাঙালি মুসলমানকে সচকিত করেছিল সন্দেহ নেই। পাশাপাশি কাজী নজরুল ইসলামের ব্যতিক্রমী ও চমৎকৃত লেখা ও গান তো ছিলই। বর্তমান শতকের সেই কালে বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে আত্তীকরণের আহ্বানের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের সচেতন একাংশের মানসচেতনার এই উদ্বোধন, তার যদি চল্লিশ দশকের শুরুতেই 'লাহোর প্রস্তাবে'র আঘাতে অপমৃত্যু না হত, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-উত্তর

বাঙালি মুসলমান তথা পূর্ব পাকিস্তানিদের ভাষা ও জাতীয়তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সব জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা সম্ভবত আদৌ সৃষ্টি হত না। মূলত সদ্য উদ্ভূত যুক্তিবাদী ধারার অপমৃত্যুর পিছনে যে তাৎপর্য ক্রিয়াশীল ছিল, তা হল লাহোর প্রস্তাব-উত্তর পাকিস্তান সৃষ্টির বদ্ধমূল ধারণা ও আবেগ। পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের পরোক্ষ প্রভাবে হিন্দু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের তুলনায় স্বল্পতর শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিবর্গ এবং বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ঢাকাকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন প্রতিবাদহীন একটা উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্র লাভ করবেন। নিঃসন্দেহে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ঘটবে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন হবে মুসলমান এলিটদের অনুকূলে। অতএব, জ্ঞানে-পেশায় ও সামাজিকভাবে কোনো প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নয়, প্রতিযোগিতাবিহীন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যসম্পৃক্ত জীবন ও নেতৃত্ব পরিচালনার স্বার্থে যাবতীয় কর্মকা- সংগঠিত হতে থাকে। লক্ষ্য করা যাবে, এর ফলে সৃষ্ট হল কলতাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪২) এবং ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪৩)। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ও ইউরোপীয় আদর্শপ্রসূত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে এক নয়, তা তাঁরা ভুলে ধর্মীয় আবেগের রঙে গণতন্ত্রকে রঞ্জিত করতে চাইলেন। ফলে সাহিত্য-পদবাচ্য হিসেবে তাঁদের হাতে যা সৃষ্ট হয়েছিল তার অধিকাংশতেই পরবর্তীকালে তাৎক্ষণিকতার এক কৃত্রিমতা ব্যতীত আর কিছুই থাকেনি। যুক্তি, মূল্যবোধ, পরিশ্রম, ঔদার্য ও সংস্কৃতির চাকা পিছনে ঘুরতে শুরু করল। অর্থাৎ যথার্থই বাঙালি মুসলমান সমাজে-সাহিত্যে দেখা দিল মনন-দারিদ্র্যের চিহ্ন। রাজনৈতিক কারণে আশা-অতিরিক্ত দ্রুততার লব্ধ হল পাকিস্তান। আর আড়ালে চলে গেল দুঃখী সাধারণ বাঙালি মুসলমান এবং তার প্রকৃত সমাজ-সমস্যা ও দ্বান্দ্বিক-চেতনাপ্রবাহ থেকে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের আগ্রহ। বর্তমান শতকের সূচনা থেকেই বাঙালি মুসলমানের যে আকুল মাতৃভাষা-প্রীতির উৎসরণ ও বাঙালি হিসেবে নিজেকে আবিষ্কারের যে প্রচেষ্টা, তা পরিণত হওয়া ও সাফল্য লাভের পূর্বেই 'পাকিস্তানি' হওয়ার মধ্য দিয়ে তার আপাতবিলুপ্তি ঘটল। শুরু হল, 'নানা অবস্থা, ঘাতপ্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট' 'পাকিস্তান সারা দুনিয়ার অদূরাগত ভবিষ্যতের বাণী'র[৭] বাহক হিসেবে অধিকাংশ 'পূর্ব পাকিস্তানি' সাহিত্যিকের লেখনী-প্রয়াস। এই প্রয়াসের অন্যতম আহবায়ক হিসেবে ১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সমিতির সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বললেন, 'সাহিত্যিক উন্নতির পাশ্চাত্যে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলমানেরা সেই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যই হারিয়ে বসল। রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নিস্পৃহতার সৃষ্টি করে সামন্ত সমাজদেহকে আড়ষ্ট করে তুলল।' সংসদের প্রথম

বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনায় 'যুক্তিবাদী লেখকদের প্রতিষ্ঠান মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে বলা হল, ইতিপূর্বে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের কথা প্রায়ই শোনা যাইত। ... মুসলিম সমাজ ... ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার প্রতি এই সাহিত্যসমাজের প্রধানগণের লেখায় এমন সব কটুমন্তব্য মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত যে ... ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ ধারণাই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মনে হয় এই কারণেই সাহিত্য সমাজ ঢাকার সাহিত্যিকদের সমর্থন ও সহানুভূতি ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলে।' অতঃপর আলোচনার শেষ মন্তব্য হল, সাহিত্যসমাজ আর ঢাকার মুসলিম সাহিত্যিকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না– সাহিত্য সম্পর্কে নতুন LEAD-এর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বলাবাহুল্য নয় যে, এই নতুন LEAD যে পাকিস্তানি আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টির আহ্বান, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না এবং এই প্রয়োজনেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের কার্যাবলি তারা অপব্যাখ্যাত করতে দ্বিধা করেনি। অতঃপর হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য বিভাজিত হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে 'হিন্দু-সাহিত্য' ও 'মুসলিম-সাহিত্য' অভিধা'র শ্রেণিকরণে। এই প্রবন্ধের প্রথমেই উদ্ধৃত আবুল হুসেনের প্রবন্ধে 'যে ভয়ের' কথা বলা হয়েছে, সেই ভয় অবশেষে সত্যি হল। 'পরগাছার দুর্বল শিকড়' স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবেষ্টনের মাধ্যমে বাঁচানোর প্রচেষ্টা আপাতত হল সফল।

কিন্তু এই কৃত্রিম অবস্থা যে বেশিদিন স্থিতিশীল ছিল না, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। পূর্ব পাকিস্তান যে পাকিস্তানের শোষণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত, ছাত্র-তরুণ সমাজের তা অনুধাবনে বিলম্ব হয়নি। শোষকের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ঘোষিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সূত্রে। এবং আমরা অবগত যে, পরবর্তী সেই ইতিহাস '৪৮-'৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে' '৬৮-'৬৯-এর গণআন্দোলন এবং '৭১-এর সমগ্র দেশব্যাপী মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল হুসেন, 'বাঙালি মুসলমানের ভবিষৎ', *মাসিক প্রবাসী*, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৫; পৃ. ২৩০- ২৩১। উল্লেখযোগ্য, এই প্রবন্ধটি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'আবুল হুসেনের রচনাবলিতে' (ঢাকা ১৯৭৬, ২য় সংস্করণ) সংযোজিত হয়নি। প্রবন্ধটি *মাসিক জাগরণ*, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল;

২. শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, 'বাংলার অর্থনৈতিক জীবন'; কলিকাতা ১৯৬৭; পৃ. ১১৯; এবং অন্যান্য পৃষ্ঠা;

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম ও শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য;

৪. ওয়াকিল আহমেদ, 'বাংলার বিদ্বৎ সমাজ; আঞ্জমন ইসলামী'; *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*; ষষ্ঠ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৭; পৃ. ৬৯-৭৪;

৫. গ্রন্থটির নাম: 'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ সংস্কারক', কলিকাতা ১২৯৭; প্রবন্ধ 'ইসলামে বহুবিবাহ', পৃ. ১২০-১২৫;

৬. বিশদ দ্রষ্টব্য: 'মাসিক মহিলা'; ৮ম ভাগ, বৈশাখ ১৩১০, ১০ম সংখ্যা; পৃ. ২৭৩-২৭৭;
ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১১শ সংখ্যা, পৃ. ৩১১-৩১৪,
ঐ, আষাঢ়, ১২শ সংখ্যা, পৃ. ৩৩৯-৩৪৪,
ঐ, ৯ম ভাগ, শ্রাবণ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৩-২৪,
ঐ, ভাদ্র, ১৩১০, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৪২-৫২;

৭. সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত, 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য; বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ পৃ. ১০৫, ১২৭; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'সাহিত্য আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি', পৃ. ৬৭, ও আবুল মনসুর আহমেদ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতি প্রদত্ত ভাষণ, পৃ. ১৪১। উদ্ধৃত-'মাসিক মোহাম্মদী', শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১।

[লেখক: গবেষক।]

হো সে ন আ লী (মা ও লা না)

আত্মপরিচয় নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে থাকা কোনো জাতি কখনোই বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম নয়। আত্মপরিচয় মানুষের ব্যক্তিজীবনের এবং জাতীয়জীবনের সবচেয়ে বড় সম্বল। আমরা বাঙালি জাতি, আমাদের আত্মপরিচয়ে বিব্রত বা বিভ্রান্ত এমনটা আমি স্বীকার করছি না। তবে নিজেদের আত্মপরিচয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি এটা বলা সম্ভব নয়। আমরা আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বে ন্যুব্জ একটা জাতি। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে, সমাজজীবনে এবং ব্যক্তিজীবনে আমরা প্রতিনিয়ত আত্মপরিচয়হীনতা জনিত আত্মপীড়নের স্বীকার।

আমরা নিজেদের বাঙালি বলব না বাংলাদেশী বলব এ বিতর্ক এক সময় বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। শব্দের এই মারপ্যাঁচে খুব বেশি মাতামাতি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমরা নিজেদেরকে বাঙালি বলি আর বাংলাদেশী বলি তাতে খুব কিছু যায়-আসে না। আসল সমস্যা অন্য জায়গায়। আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা আমাদের দেশ এবং আমাদের ধর্মকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ফেলি। এটাই আমাদের আত্মপরিচয়ের মূল সংকট। আমরা মুসলমান, না বাঙালি? কোনটা আমাদের পরিচয়?

আমাদের এই সংকট সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত করেছে আমাদের স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা। এখনো রাজনীতিকদের একটা অংশ এই সংকট নিয়েই টানাটানি করছেন যেন জাতিকে বিভ্রান্ত করে হলেও নিজেদের পক্ষ ভারি রাখতে সক্ষম হন। আর শুধুমাত্র রাজনীতিকদের উপর দায় চাপিয়ে আমরা অব্যাহতি পাই না এ জন্য যে আমাদের শিক্ষা সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের মধ্যেও এর একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। আত্মপরিচয়ের সন্ধানে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের দেশ থেকে এক হাজার মাইল দূরে আরেকটা জনপদের সঙ্গে এক রাষ্ট্র গঠন করতে। দেশটা ছিল আমাদের কাছে একেবারেই গৌণ, আমাদের বাঙালিত্ব ছিল ঘুমন্ত অথবা বিভ্রান্ত। আমরা ধর্মের কাছে অতিরিক্ত চেয়েছিলাম। যদিও ধর্মের কাছে অতিরিক্ত চাওয়া ধার্মিকের লক্ষণ নয়। সবাই মিলে হৈচৈ করে পাকিস্তান নামক একটা রাষ্ট্রের কোলে

চেপে বসে আমরা সেদিন বাঙালি হিসেবে অযোগ্য এবং মুসলমান হিসেবে দুর্বলের পরিচয় দিয়েছিলাম। এই অযোগ্যতা এবং দুর্বলতাই আমাদের আত্মপরিচয়ের সমস্যা।

অনেক মূল্য দিয়ে আমরা পাকিস্তানের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্তু বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের যে সমস্যা দিনে দিনে ঘনীভূত হয়েছিল সেই সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি। আমরা সেই আগের মতো না হলেও আত্মপরিচয়ের সংকটে দারুণভাবে ন্যুব্জ হয়েই আছি। এখান থেকে আমাদের সামনে এগোনো দরকার। আত্মপরিচয়ের সংকট আমাদের সংস্কৃতির নয়, আমাদের ধর্মের নয়, আমাদের ঐতিহ্যেরও নয়। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু আমরা হীনমন্যতার দ্বারা আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি করেছি।

বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ বিশ্বের সেরা ধার্মিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্যতম। আবহমান কাল ধরে এ ধার্মিক জনগোষ্ঠীর বড় অংশ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীও। ইসলাম যদিও যথেষ্ট শাস্ত্রবদ্ধ শিক্ষাসমৃদ্ধ ধর্ম তবু এদেশের মুসলমান সমাজের সংখ্যাগুরু অংশ যথার্থ অর্থেই অনুভূতি-আশ্রিত ধার্মিক। অপরদিকে ধর্মের শিক্ষা যেটুকু প্রসারিত হয়েছে তা এক প্রকার রক্ষণশীলতা গ-িবদ্ধ আরবি, ফার্সি ও উর্দু প্রভৃতি বিদেশি ভাষা-আশ্রিত শিক্ষা। সর্বসাধারণের কাছে এই ধর্মীয় শিক্ষা দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট এবং শুধুমাত্র আবেগাশ্রিত ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে লালিত হয়েছে। সুতরাং এদেশে ইসলামের শাস্ত্রীয় ধর্মশিক্ষা স্বদেশি হতে পারেনি, ইসলামের ধর্মবেত্তা শ্রেণিও স্বদেশি হওয়ার শিক্ষা বা প্রেরণা লাভ করেনি। ওলামা শ্রেণি নামে একশ্রেণির অ-স্বদেশি ধর্মশাস্ত্রবিদদের হাতে ধর্মীয় শিক্ষা ও শাস্ত্র প্রায় বন্দি হয়েই থেকেছে। আর সাধারণ মানুষ ইসলামের ধর্মচর্চা করেছে তাদের অন্তরের আবেগ-অনুভূতি আর আন্তরিকতা দিয়ে। সাধারণ মানুষের ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি স্বদেশি হয়ে উঠলেও বিদেশি ভাবাপন্ন শাস্ত্রবিদদের প্রতি এবং আরবি-ফার্সি-উর্দু ভাষার ধর্মীয় ভাবাপন্নতার প্রতি তাদের দুর্বলতা ধর্মের অংশ হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতি এদেশের মুসলমানদের আপন ভাষা ও সংস্কৃতি হওয়া সত্ত্বেও বিজাতীয় সংস্কৃতিতুল্য হিসেবে তুলে ধরার একটা প্রয়াস সবসময় সচল ছিল। আর এ প্রয়াস সচল ছিল প্রধানত ধর্মের মোড়কে হলেও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। এইভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মপরিচয়ের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠতে থাকে।

ধর্মের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংকট অত্যন্ত গভীর। এটা এত গভীর যে পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বড় সংকট আছে বলে মনে হয় না। সমস্যার মূল দৃশ্যপটটা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে মননশীলতার তীব্র অভাব এবং ধর্মীয় শিক্ষার

নামে মননহীন, বিকাশহীন বদ্ধচিন্তা চর্চার প্রসার। এই বদ্ধচিন্তা আশ্রিত মননহীন, মূল্যবোধবিহীন শিক্ষা বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় বিকাশের এক প্রধান প্রতিবন্ধক। মুসলমানের আত্মপরিচয় অবশ্যই হবে তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধও কোনো বিমূর্ত স্থবির বিষয় নয়। দেশ-কাল-পাত্রের সীমানায় এই মূল্যবোধ কী রূপে প্রতিফলিত হল সেটা মূর্ত করার উপরই জোর দিয়েছে ইসলাম। কোরান মজিদ এবং হাসিদশরীফে এই কথা করবার উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহর রাসুলের জীবনাদর্শই মানুষের জন্য উত্তম মূর্ত আদর্শ। আর এটাও নির্দেশ করা হয় যে এই আদর্শ লেবাস, ভাষা এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে। অথচ আমাদের দেশের তথাকথিত ইসলামি শিক্ষার প্রাধান্য লাভ করেছে বহিরাগত লেবাস, বিদেশি ভাষা এবং কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণসহ মননবিহীন বহিরাগত আচার-আচরণ। ইসলামের নামে এই ধরনের পরনির্ভরশীল মননবিমুখ শিক্ষা মুসলিম সমাজের মনন ও মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

না বুঝে ধর্মচর্চা মানুষকে ধার্মিক করতে পারে কিন্তু আত্মবিশ্বাসী বা মূল্যবোধসম্পন্ন করে তুলতে পারে না। না বুঝে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মচর্চার আধিক্য বাঙালি মুসলমানের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য। আজকের অগ্রসর যুগেও এই বৈশিষ্ট্য প্রায় অক্ষুণ্নভাবেই বিদ্যমান। এটা অবশ্য ধর্মের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা নয়। কারণ আল্লাহতালা দেখেন অন্তঃকরণ। ধর্ম ধার্মিক মানুষের অনুভূতির ব্যাপারে হয়ে অন্তরে ও বিশ্বাসে অবস্থান করলে এর প্রাসঙ্গিকতা ও পবিত্রতার কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটে আত্মপরিচয়ের, ব্যত্যয় ঘটে মূল্যবোধের। মননবিমুখ ধর্মের শিক্ষা এবং লেবাসসর্বস্ব ধর্মাচরণ বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় চেতনা এবং আত্মচেতনাকে সমানভাবে দুর্বল করতে সহায়তা করেছে। সমাজের নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব হয়েছে মিশ্র। এরা কখনো ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অত্যন্ত দুর্বল, আবার কখনো নিজস্ব স্বভাবজাত আত্মচেতনায় বলীয়ান। রাজনীতিকরা এই অসহায় ধার্মিক জনগোষ্ঠীর মিশ্র চৈতন্যকে আরো তছনছ করে দিয়ে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার প্রয়াসে ব্যাপৃত রয়েছে নিরন্তর। এইভাবেই এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বে হাবুডুবু খেয়ে আসছে।

বাংলাদেশ আবহমানকাল ধরে হিন্দু-মুসলমানের বাসস্থান। এখানে কারা সাবেক আর কারা বহিরাগত এ প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গিয়েছিল আরো বহুকাল আগে। ইতিহাসেও আমরা এই বিতর্কের সাক্ষাৎ খুব একটা পাই না। কিন্তু আধুনিক কালে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের রাজনীতিকরণ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়কে আরো দারুণভাবে ঘোলাটে করে তুলেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ স্পষ্ট করে তোলার মধ্যদিয়ে মুসলমানের আত্মপরিচয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহকে চিহ্নিত করে তোলার মতো

জাহেলিয়াত যুগের চিন্তাভাবনাকে ও উস্কানি দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে। এর ফলে মুসলমানের আত্মপরিচয়ের অন্বেষা বিভ্রান্ত হয়েছে দারুণভাবে।

এদেশের অভিজাত মুসলমান শ্রেণি এদেশের সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান হওয়ার মানসিকতা চাপিয়ে দিয়েছে এবং নিজেরা এদেশের দ্বিতীয় শ্রেণির বাসিন্দা হয়ে থাকার মানসিকতা অর্জন করেছে। ফলশ্রুতিতে বাঙালি মুসলিম সমাজ দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান এবং দ্বিতীয় শ্রেণির বাঙালি হওয়ার নিকৃষ্ট মানসিকতা অর্জনে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। এটা বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নয়। এটা বাঙালি মুসলমানের বিকৃত পরিচয়। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় খুঁজতে হলে আমাদেরকে সেই বাঙালি মুসলমানকেই অনুসন্ধান করতে হবে যে চিন্তায়, চৈতন্যে স্বদেশি এবং মননে মূল্যবোধে ইসলামের অনুসারী ধার্মিক। বাঙালি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই প্রবণতার প্রাধান্য ছিল আবহমান কাল ধরে এবং এখনো তা বর্তমান; কিন্তু নেতিবাচক প্রবণতাসমূহের চর্চা দ্বারা আক্রান্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় বাঙালি মুসলমান পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে: "আমি মানুষ; আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, মানুষ একবার মরে, দুই বার মরে না..." বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্পষ্ট কথাটা তিনি বলে দিয়েছেন এমন সহজ ভাষায়। বাঙালি মুসলমানের এটাই আত্মপরিচয়। তার দেশ আছে, তার ভাষা আছে, তার ধর্ম আছে, তার সংস্কৃতি আছে, তার ঐতিহ্য আছে, তার আত্মত্যাগের অহংকার আছে, তার গৌরব আছে। সে মুসলমান, সে বাঙালি, সে মানুষ। যে মানুষ তার দেশকে নিয়ে গৌরব করতে জানে না, তার ভাষাকে নিয়ে গর্ববোধ করে না, যে মানুষ তার নিজের সংস্কৃতিকে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে, যে মানুষ তার জাতির ঐতিহ্যকে অনুভব করতে জানে না, যে মানুষ তার নিজের ধর্মকে নিজের চৈতন্যে ধারণের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতরতায় জর্জরিত সেই মানুষ আর যাই হোক পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারে না, বাংলার সন্তান হয়েও সে বাঙালি হতে পারে না।

দুই

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে হীনমন্যতা। কেন এই হীনমন্যতা? তার কারণ খতিয়ে দেখতে গেলেই আমরা পাই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতা। বঙ্গ ভারত হিন্দুদের আদি বাসস্থান, হিন্দু সমাজের এই অনুভূতি অস্বীকার করার তো কোনো উপায় নেই। সুতরাং হিন্দুদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করে বা বঞ্চিত করে এদেশকে মুসলমানদের একেবারে নিজের করে পাওয়ার ন্যায্য অধিকার তো চিন্তা করা যায় না। অথচ আমরা ভাগের মা-তে বিশ্বাস করতে চাই না। বিশ্বসভ্যতা যখন রাজনীতির একটা

উন্নত স্তর তথা গণতান্ত্রিক স্তরে উত্তরণ লাভ করতে যাবে তখন আমরা একটা মুসলিম দেশের স্বপ্নে আরো বেশি বিভোর হয়ে উঠতে যাচ্ছি। বাংলাদেশকে মুসলিম দেশ বানাবার স্বপ্ন থেকেই মূলত হীনমন্যতার পালা শুরু। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো এক শতাব্দীব্যাপী এদেশের একশ্রেণির উচ্চাভিলাষী মানুষের একটা অসঙ্গত দাবি হল আমরা বাংলার মাটি চাই, বাংলার সংস্কৃতি চাই না। এদেশের সম্পদ হবে মুসলমানের আর সংস্কৃতি হবে হিন্দুদের— এ জাতি কাঙাল না হয়ে তো পারে না। অবশ্য এ দাবির পিছনে দীর্ঘকাল ব্যাপী উদ্ভূত কিছু যৌক্তিক পটভূমিও রয়েছে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা তো অবাস্তব এবং অসঙ্গত। বাংলাদেশ হবে বাঙালির, বাংলাদেশ হবে হিন্দু-মুসলমানদের এটা হচ্ছে স্বাভাবিক। বাংলাদেশে বাংলার সংস্কৃতি থাকবে, বাংলা ভাষা থাকবে, বাংলার মাটি-মানুষের আর ঐতিহ্য নিয়ে গৌরব থাকবে, আর এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে মুসলমানের ধর্ম ইসলামের বাস্তব বা মৃত রূপ। সে-ই হবে বাঙালি মুসলমান। আর এই মুসলমান কোনো অবস্থাতেই দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান নয়। অর্থাৎ আরবের মুসলমান বা ইরানের মুসলমানের চেয়ে যে কোনো অবস্থাতেই অসম্পূর্ণ মুসলমান নয়। আরবে জন্মগ্রহণকারী ইসলামের মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' বাঙালি মুসলমানকে ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য আরব বা ইরানি; আফগানি হওয়ার ভান করতে হবে এটা একেবারেই ইসলামসম্মত নয়। একজন বাঙালি মুসলমানকে অবশ্যই উত্তম বাঙালি হতে হবে, তবেই সে উত্তম মুসলমান হতে পারবে। অথচ আমরা সত্যিকার বাঙালি মুসলমান হওয়ার সাধনা থেকে বিরত হয়ে পড়ি হিন্দুদের মতো হয়ে যাওয়ার বা হিন্দুদের মতো থেকে যাওয়ার ভয়ে। এই ভয় বা হীনমন্যতা অতদূর পর্যন্ত যে, এদেশের মাটি, এদেশের সংস্কৃতি এবং আমাদের আবহমানকালের বাঙালিত্বকে ঝেড়ে-মুছে আরব ইরান বা অন্য কিছুর বানানোর আগ পর্যন্ত নিজের করে ধারণ করতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি। কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট করা। এই বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিভূমি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক দীনতাও প্রকট করে তুলে।

বাংলাদেশে প্রায় সাতশ বছর পর্যন্ত মুসলমান নৃপতিরা রাজত্ব করেছেন। সংখ্যালঘু হয়ে এই দীর্ঘকাল কিভাবে তারা রাজত্ব করলেন? কারণ তাঁরা দেশটাকে ভালোবেসে ছিলেন, দেশের মানুষকে ভালোবেসে ছিলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কারণ তাঁরা হীনমন্যতায় নিপতিত ছিলেন না। দুশ বছরের পরাধীনতার জীবন বাঙালি মুসলমানদেরকে যে হীনমন্যতা উপহার দিয়েছে তা দু'শ বছরের শোষণের তুলনায় কম ক্ষতির কারণ

হয়নি। মানুষ যখন নিঃস্ব হয় তখন সবচেয়ে স্পর্শকাতর হয় তার ধর্ম ও সম্ভ্রম। বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় হীনমন্যতা এবং বিমূর্ত জাত্যাভিমান (মুসলিম জাতি অর্থে) পরাধীনতা যুগের সৃষ্ট ব্যাধি যা থেকে আরোগ্য লাভের কোনো সুস্থ ধারার সূচনা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

আমাদের পাশে বিশাল রাষ্ট্র ভারত। বাংলার একাংশও তার অন্তর্ভুক্ত। স্পষ্টত হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে ভাগ হয়ে যাওয়া এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার নীতিকেই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এর ফলে বাঙালির সমস্যাই সবচেয়ে বেশি জটিল হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েও এক্ষেত্রে কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছে কি? পারেনি। ভারত রাষ্ট্র গোড়া থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছে যতটা-না হিন্দু-মুসলমান সংকট নিরসনের জন্য তার চেয়ে বেশি ভারতের বর্ণবাদী পশ্চাৎপদ সমাজব্যবস্থা মোকাবেলার জন্য। ভারত এক্ষেত্রে কতখানি সফল হয়েছে সে মূল্যায়নে আমরা যাচ্ছি না। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার জন্য ভারত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হয়ে আছে এবং থাকবে। বাঙালি মুসলমানের হীনমন্যতা জিইয়ে রাখার জন্য ভারতভীতি, ভারতবিরোধিতা আমাদের রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এক মোক্ষম হাতিয়ার হয়েই থাকবে। ভারতের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতার প্রসার এবং বাংলাদেশের ভারতবিরোধিতা বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়কে আরো খ-িত ও খর্বিত করবে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভারতের বহু দূরে, বহু গভীরে বিস্তৃত। হীনমন্যতা আর হিংসার দৃষ্টি দিয়ে সেটা আবিষ্কার করা কঠিন।

বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই ইতিহাসের সূচনা নয়। এই ইতিহাসের সূচনা হয়েছে বাঙালির আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে। আরব ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুফি ধর্মপ্রচারকগণ বাংলাদেশে আসেন ধর্মপ্রচারের ব্রত নিয়ে মানুষকে শিক্ষা ও সৎ পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। এদেশের মানুষ তাঁদের শিক্ষার উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যবাদী ধর্মাচারের প্রতিবাদে ইসলামের বিপ্লবী সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে থাকে। বাঙালি মুসলমানের আবির্ভাব খিলজির ঘোড়ার লেজ ধরে নয়। বরং তৎকালীন বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে। বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস এদেশের বঞ্চনাদগ্ধ ও অগ্রসর চিন্তার মানুষের আত্মজাগরণের ইতিহাস। বাঙালির চিত্তবৃত্তির বিপ্লবী বিকাশের সেটাই একটা মাইলফলক। সেদিন ইসলাম তাদের কাছে শুধু ধর্ম ছিল না শুধু সৎ উপদেশের বাণী ছিল না, ছিল এক বিপ্লবী মন্ত্র, এক অগ্রসর জীবনবোধ। মানবিকতায় মসৃণ আর চৈতন্যে তীক্ষ্ণ ছিল এই জীবনবাদী বিপ্লবের ধারা।

দীর্ঘকালব্যাপী শান্তিময় সামাজিক পরিবেশে এই সমাজবিপ্লব বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিবৃত্তে গণমানুষের অংশগ্রহণে তেমন কোনো যুদ্ধবিগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের এটা এক বৈশিষ্ট্যমি-ত দিক।

মুসলিম সুফি সাধকরা এদেশের মানুষকে শিষ্যত্বে বরণ করতেন। ধর্মান্তরিত করে সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুফি সাধকগণ মানুষকে ধর্মান্তরিতকরণের অভিযান চালাননি, বরং তাঁরা সমাজসংস্কারের অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বাংলাদেশের জনসাধারণই সেই মধ্যযুগে ভারতীয় বর্ণবাদী হিন্দু সমাজসংস্কারের জোরালো সমর্থক হিসেবে ব্যাপকভাবে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। এ ভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজের আবির্ভাব। বাঙালি মুসলমানের বীরোচিত ঐতিহ্যের বুনিয়াদ এই দেশজসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের উত্তরাধিকারের বুনিয়াদও সেখানেই প্রোথিত।

বাংলার মুসলিম নৃপতি সামন্তপ্রভুদের অনেকে বহিরাগতও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বাঙালি হয়েছেন বাংলাকে ভালোবেসে, তাঁরা বাংলায় মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন, বাংলায় সমাহিত হতে চেয়েছেন, তাঁদের বংশধরদের জন্য বাংলাকে রেখে যেতে চেয়েছেন আপন করে। সাতশ বছর ব্যাপী সামন্তবাদী যুগে বাংলার বহিরাগত অভিজাত শাসক ও ধর্মপ্রচারক শ্রেণির ইতিহাস বাংলাকে ভালোবাসার ইতিহাস, বাঙালি হওয়ার সাধনার ইতিহাস। এর পরই আসে বাঙালি মুসলমানের চিত্তবৃত্তিতে হীনমন্যতার যুগ। অক্ষম পরাধীন বাঙালি মুসলমানরা একদিন যেন হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, বাঙালি হওয়া নয়, মুসলমান হতে হবে– খাঁটি মুসলমান, যে মুসলমান বাঙালির মতো নয়, যে মুসলমান হিন্দু আর খ্রিস্টানের চেয়ে একেবারে ভিন্ন আকৃতি আর প্রকৃতির হবে।

এর পর তো সময় এসেছে অক্ষমতা আর পরাধীনতাজনিত হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি মুসলমানের সত্যিকার আত্মপরিচয় উপলব্ধি করার। কিন্তু আমরা বিভ্রান্তির ঘোর কাটাতে পারছি না।

তিন

এটা আমাদের সবারই জানা যে, একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব। এর আগে চব্বিশ বছরের স্বাধিকার আন্দোলন; এরও আগে শতাব্দীব্যাপী উপনিবেশবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস বাঙালির ঐতিহ্যের অংশ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ছিল একটি সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে এক নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর যুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম যুদ্ধের নজির বিরল। এই রকম একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী বাঙালি জাতি নিঃসন্দেহে একটি গর্বিত জাতি। স্বাধীনতাসংগ্রাম আমাদের গর্বের মাইলফলক; আমাদের বীরত্বের অমর গাথা। এর পরও আমাদের কিছুটা ব্যর্থতা আছে, হতাশা আছে আমাদের জাতি একটা প্রশ্নে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত না হলেও স্পষ্ট বিতর্কে অবতীর্ণ। প্রশ্নটা স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নয়; তবে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ-বিপক্ষ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা– জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের (অগণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র নয়) প্রশ্নে আমরা ন্যূনতম ঐক্যমতের ভিত গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ যখন আমরা করছিলাম তখন সারা জাতিকে মূলত ঐক্যবদ্ধই দেখা গেছে। মুষ্টিমেয় দালাল-রাজাকার-আলবদর যারা প্রধানত মৌলবাদী ইসলামি রাজনীতির ধারক এবং মুসলিম লীগের কিছু অন্ধ অনুসারী স্বার্থবাদী লোক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। এ ছাড়া স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে তেমন কোনো বিতর্ক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের তিন দশক পরও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে এবং প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নে বিতর্ক ও বিভ্রান্তির আমরা অবসান ঘটাতে পারিনি। মত ও পথের ভিন্নতা অবদমিত করে যেমন কোনো জাতি এগোতে পারে না, তেমনি আত্মপরিচয় নিয়ে আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে কোনো জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। বাঙালির স্বাধীন জাতিসত্তার মূল ভিত্তি সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর বিভ্রান্তি কেন এর জবার আমাদের খুঁজতেই হয়।

খুব সাদামাটা দু-একটা লক্ষণের কথা বলি, যেখানে কিছু গৌণ কারণের আলামত পাওয়া যাবে; তারপর আসল কথায় যাওয়া যেতে পারে। গত নির্বাচনগুলোতে প্রায়ই শোনা গেছে যে, মহিলারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় খুব কম। কারণটা অনেকেই বলছেন এভাবে যে, সরলপ্রাণ শান্তিপ্রিয় মহিলারা মনে করে আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে দেশে আবার একটা যুদ্ধ আসতে পারে। যুদ্ধ যে এভাবে আসে না এটা একটা শিশুকে বুঝানোও সহজ। কিন্তু নিরীহ মানুষের যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী মনোভাবকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী মনোভাবে পরিণত করার ষড়যন্ত্র বুঝানো ঢের কঠিন হল আমাদের বাস্তবতায়। স্বাধীনতার জন্য একটা নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়ার অভিযোগ উঠল মুক্তিযুদ্ধের

বিরুদ্ধে। আর স্বাধীনতার অর্থ যা কিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নামক কঠিন তাৎপর্যের মধ্যে নিহিত সেটা জাতির এক বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে এখনও অস্পষ্ট। শুধু অস্পষ্ট নয়, কিছুটা বিতর্কিতও। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর সেক্যুলারিজম দিয়ে আমরা কী করব– এটা কিভাবে পাওয়া যায় বা ভোগ করা যায় এ সম্পর্কে ধারণার অভাব ছিল অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর। আর গোঁড়া মুসলিম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিশ্বাসের মধ্যে ছিল প্রকট আত্মদ্বন্দ্ব। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বস্তুনিষ্ঠ সারবত্তার বিরুদ্ধেও ঠুনকো আভিজাত্যের ফুটানির কমতি ছিল না অশিক্ষিত বাঙালির। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উচ্চতর বিকাশের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জোরালোভাবে ধারণ করার আগেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আমাদের চলে যেতে হয়েছিল। আর আগেই বলা হয়েছে, এই যুদ্ধ ছিল একটি সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে এক নিরস্ত্র জাতির সম্মুখসমর। এখানে দেশপ্রেমবিবর্জিত বিভ্রান্তিকর অভিযোগের ক্ষেত্র থাকতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং বঙ্গবন্ধু-বিদ্বেষীরা সমালোচনা করে থাকেন যে, বঙ্গবন্ধু জাতিকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়ে শত্রুর নিরাপদ জেলখানায় চলে গিয়েছিলেন। এ সমালোচনাটা যে কতখানি অযৌক্তিক তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। বঙ্গবন্ধু তো আর তাঁর বত্রিশ নম্বরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতেন না। ধরা না দিতে হলে তাঁকে ভারতে যেতে হত এবং পালিয়েই যেতে হত। তিনি তা করেননি। তিনি শত্রুর হাতে ধরা দিয়েছিলেন এবং জীবন বাজি রেখেই ধরা দিয়েছিলেন। স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর প্রতি তাঁর সীমাহীন আস্থা এবং অনাগত স্বাধীনতার প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তিনি এ পথ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এর পেছনে তাঁর অনেক রাজনৈতিক বিবেচনাও ছিল। তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করতে না পারলে পাকিস্তানিদের হিংস্রতা আরো কত ভয়াবহ হত সেটা এখন শুধু কল্পনার বিষয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি সেনাবিদ্রোহের মতো অরাজনৈতিক ঘটনা ছিল না এবং বাঙালির নেতা একজন সন্ত্রাসী বা ষড়যন্ত্রকারী নেতা ছিলেন না। তবু নিন্দুকেরা তাঁর এ অবস্থানের সমালোচনা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বলাভের পর তো আর মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ থাকে না; তাই একটা নিরস্ত্র জাতিকে একটা সশস্ত্র যুদ্ধের মুখোমুখি করার দায়ে মুক্তিযুদ্ধের আহ্বায়ক বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক রাজনৈতিক শক্তিকে আজো বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে মনে রাখার বিষয় হল; মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঙালি জাতি তখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের পর চরম প্রতিকূল পরিবেশ থেকেই মুক্তিযুদ্ধকে ডিমোরালাইজ করার জন্য এর দুর্বলতার দিকগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত

করার চেষ্টা করে। মুক্তিযুদ্ধকে গ্লোরিফাই করার জন্য আমাদের শিল্প-সাহিত্যে আর রাজনৈতিক প্রচারণার প্রচেষ্টা যতই হোক; মুক্তিযুদ্ধ বীর বাঙালির গৌরব আর নিরীহ বাঙালির বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার স্মৃতিও বটে– এই বাস্তবতাটাও স্মরণ রাখাই দরকার।

আমরা যখন হতাশার সুরে প্রায়ই বলি, 'তিরিশ লাখ তাজা প্রাণ আর দু লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার ফসল মানুষ কী পেল?' তখন আমরা এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে আরো কঠিন কথাই বলি। অথবা কঠিন কথার মুখোমুখি হই। এর অর্থ এরকম: এক. এই স্বাধীনতা অর্জন করতে আমাদের অনেক উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে। স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু এত উচ্চ মূল্য দিতে চেয়েছিলাম কি? নাকি নিরাপদ দূরত্বে বসে থাকা নেতৃত্বের অযোগ্যতার জন্যই এই মূল্যদান? এ প্রশ্নটাই নানা আঙ্গিকে তুলে আনা হয়।

দুই. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন বিমূর্ত ধারণা নয় তেমনি ডাল-ভাতের আকারে বা দুধ-ভাতের আকারে তাৎক্ষণিক বিরতণযোগ্য বস্তুও নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যত- না পাওয়ার তারচেয়ে বেশি দেয়ার এবং অর্জন করার। যত- না বৈষয়িক তার চেয়ে বেশি চৈতন্যবৃত্তিক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের জনগণকে অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ না করে ভোগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই বিভ্রান্ত করেছি এবং জাতীয় সংখ্যালঘু চেতনায় পরিণত করে ফেলেছি। চৈতন্য আর মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বহুধাবিভক্ত এক জাতি আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে বলে হয়রান হচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে কী– এ ব্যাপারে জাতি স্পষ্ট ও সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে এখনো অনেক বাকি।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' কথাটা আমরা বলি, তবে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেনি, চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর খোদ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের যে চেতনাটুকু শাণিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে সেটি হচ্ছে, 'কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্য জীবন নয়, জীবন মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য।' এই গর্বিত জীবন-দর্শনের দীক্ষা বাঙালির অনেক পুরনো। তবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি এই গৌরবময় জীবনবোধকে বাস্তবে ধারণ করার সুযোগ লাভ করেছিল। ঐক্যবদ্ধভাবেই জাতি এই গৌরবকে ধারণ করেছিল। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই চেতনায় জাতির সচেতন অংশ যে যথাযথভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি বাস্তবতাটা ঠিক এরকম নয়। বাস্তবতাটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ একটা পশ্চাৎমুখী চৈতন্যের ধারা প্রবহমান ছিল। আর এর দ্বারা প্রভাবিত ছিল বাঙালি জাতির এক বিরাট অংশ। বাঙালির চৈতন্যের এই বিভেদ দুই বাংলার বিচ্ছেদের মতোই বাস্তব। দুই বাংলার ভিন্ন অস্তিত্বের বাস্তবতা বাঙালি

জাতির মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জটা ছিল আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। রাজনীতির সৃষ্টি তো বটেই তবে শুধু রাজনীতির মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙালি মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম এবং মূল্যবোধের প্রাত্যহিক অনুশীলন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে যা তৈরি করা হয়েছিল তার মধ্যে বৈচিত্র্যের চেয়ে বিরোধ এবং আধুনিকতার চেয়ে পশ্চাৎগামিতার ধারাই হয়ে উঠেছিল প্রবল। আমরা ভেবেছিলাম একটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই সব সমস্যার সমাধান হল। কিন্তু তা হয়নি। না হওয়াটাই অনেকটা স্বাভাবিক। স্বতন্ত্র পূর্ববাংলার অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবেই বাঙালি মুসলিম ভাবাদর্শের স্বতন্ত্র চৈতন্যের দ্বারা চিহ্নিত। আমার বিবেচনায়, মুসলমান সমাজের শতাব্দীব্যাপী ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, সাম্প্রদায়িক শক্তির ভারসাম্যের রাজনীতিকায়ন, বঙ্গভঙ্গ এবং পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি এসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ ভারত, পাকিস্তান এবং হিন্দু সমাজ থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত এক বাঙালি জাতীয়তাবোধ অর্জন করেছে।

ভারত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি সেক্যুলার ভারত এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এক জাতি গঠনের প্রয়াসে সক্রিয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ভারত এখনো হিন্দু ভারত এবং চিরকালের হিন্দু ভারত। ভারত রাষ্ট্র সেক্যুলার হওয়ার চেষ্টা করছে। কতটা হতে পেরেছে সেটা বড় কথা নয়, চেষ্টা করছে এটাই বড় কথা। কিন্তু বিপুল বৈচিত্র্যময় বিশাল ভারতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদের অধিক তেমন কিছু নয়। এখন ভারত নাকি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার জন্য হিন্দু হতে চায়।

আমাদের জাতীয়তাবাদ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে মুসলিম ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আমরা বাঙালি নাকি বাংলাদেশী এই শব্দগত মারপ্যাঁচ নিয়েও বিতর্ক জমেছে। কিন্তু এখানে বিতর্কের তেমন কিছু নেই। আমরা কতখানি বাঙালি আর কতখানি মুসলমান এটা পরিমাপ করার জন্য মানদ- স্থাপন করারও দরকার নেই। দরকার যেটা সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ আত্মপরিচয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্পষ্ট করে রেখে যাওয়ার মতো আত্মপরিচয়। বাংলার মুসলমান তো অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আবহমানকালের বাংলা– এর সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী। বাঙালি মুসলমান সমগ্র উত্তরাধিকারকে ধারণ করেই বাঙালি। হিন্দু থেকে বা বৌদ্ধ খ্রিস্টান থেকে তাকে ভিন্ন অস্তিত্বে রূপান্তরের জন্য মুসলমান সাজানোর চেষ্টা বা মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অন্যের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য অন্ধ জাত্যাভিমান ও আত্মশ্লাঘার চর্চা উত্তরাধিকার নয়। বাঙালির দুর্ভাগ্য এই যে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য

বাঙালি মুসলমানের মুসলমানিত্ব এবং বাঙালিত্বের মাঝখানে একটা কৃত্রিম বিরোধ দাঁড় করিয়ে বাঙালি মুসলমানকে উত্তরাধিকারহীন– আত্মপরিচয়হীন করে তোলার একটা আত্মঘাতী চর্চা সচেতনভাবেই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙালি মুসলমান তার জাতীয়তার ভিত্তিভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরাধিকারহীন, আত্মপরিচয়হীন এক উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না বা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সামর্থ্য লাভ করবে না। মুসলিম পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র হোক বা ইসলামি আন্তর্জাতিকতাবাদের স্লোগান হোক, মুসলিম ঐতিহ্যের বড়াই হোক বা ইসলামি আদর্শের উৎকর্ষ হোক, কোনো কিছুতেই বাঙালি মুসলমান তার ঠিকানার সন্ধান পায় না, তার শিকড়ের সন্ধান পায় না। সুতরাং বাঙালি মুসলমানের জন্য তার জাতীয়তা, তার বাঙালিত্বকে আবিষ্কার এবং ধারণ করতে হবেই– এই উপলব্ধির মধ্যেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বুনিয়াদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হিন্দু বাংলায় মুসলমানের হারিয়ে যাওয়ার মন্ত্র নয়, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সৃষ্টি করার প্রয়াসও নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালি মুসলমানেরই আত্মপরিচয়ের ভিত্তিভূমি। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আজন্ম অনুষঙ্গ হয়েছে যেমন আধুনিক রাজনীতির দাবি মেটাবার জন্য তেমনি বাঙালি মুসলমানের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্যও। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা যে ইসলামকে কিছুটা পাশ কাটিয়ে বা মুসলমানিত্বের কিছুটা ছাড় দিয়ে কিছুটা প্রো-ভারতীয় বা প্রো-হিন্দু হয়ে থাকার একটা ফর্মুলা নয় এটা সাধারণ মুসলমানের বোধগম্য হলেও রাজনৈতিক মুসলমানদের বোধগম্য হতে একটু সময় নেবেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সেদিকেও এগোচ্ছি কি-না।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা যারা করেছিল সেই রাজাকার, আলবদরদের মতবাদ ও মৌলবাদী ইসলামি রাজনীতি ইসলাম ও জাতীয়তা থেকে সমান ভাবেই ভিন্ন জিনিস। দেশের সাধারণ মুসলমানদের থেকে এমনকি রাজনৈতিক মুসলমানদের থেকেও তাদের ধ্যানধারণা অনেকাংশেই ভিন্ন। এই ধরনের মৌলবাদী গোষ্ঠী পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আছে। তারা সমাজকে খুব একটা প্রভাবিতও করতে পারে না। তবে রাজনীতিক হিসেবে তারা জনবিচ্ছিন্ন হলেও তারা মুসলমান হিসেবে মুসলিম সমাজের ভেতরের মানুষ এবং মুসলিম সমাজকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা থাকে। এই আন্তর্জাতিকতাবাদী মৌলবাদী গোষ্ঠী যে আমাদের জাতিসত্তার এক বিচ্যুত উপাদান একথা বলারই অপেক্ষা রাখে না। কিছু অমৌলবাদী মুসলিম জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শক্তির সমর্থনে এরা ধর্মের নামে যে তাত্ত্বিক সমর্থন যোগায় তা এখনো পর্যন্ত সমাজকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাবিত করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে

এই সরাসরি আক্রমণের জবাব দেয়ার কোনো পথ যে আমরা এখনো খুঁজে পেলাম না এটা আমাদের এক চরম ব্যর্থতা। ইসলাম আমাদের পরম সম্পদ, কিন্তু ইসলামেরই নামে আরো কত যে দুঃসহ বোঝা বহন করে যেতে হচ্ছে এটা এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবচেয়ে সস্তা এবং সহজ প্রণোদনা ছিল ভাত-কাপড়ের সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। ভাত-কাপড়ে সমৃদ্ধ এক সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্নে গরিব হয়ে যাওয়া এ দেশের মানুষ ছিল উদ্বেলিত। কিন্তু এই চেতনা ছিল সত্যি সত্যিই এক হতাশাব্যঞ্জক চেতনা। কিভাবে এই বাংলা শ্মশান হল তার ইতিবৃত্ত উপলব্ধি না করে শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করার স্বপ্ন আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। সোনার বাংলার চেতনা বাঙালির অধিকার-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। আর এর অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছে আধুনিক এক বাংলা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে সোনার বাংলা ফিরে পাওয়ার এক সস্তা স্লোগান নয়, আধুনিক বাংলা গড়ে তোলার এক রক্তিম প্রতিশ্রুতি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা এক আধুনিক বাংলা গড়ে তোলার অগ্রযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যাত্রা আমাদের শ্লথ হয়ে গেল, কারণ আমরা সোনার বাংলা ফিরে পাওয়ার স্বপ্নেই বিভোর থাকলাম বেশি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কিত বিতর্কটা আসলে এখানে। আমাদের জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হলফনামা। অথচ এগুলোতেই আমরা বিতর্কে লিপ্ত হলাম।

বাঙালির আত্মপরিচয় আর উত্তরাধিকার অনুসন্ধানের তাৎপর্য আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অতীতমুখীন, আত্মশ্লাঘাদর্শী এক জনগোষ্ঠীকে অবাস্তব সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখানোর জন্য যুদ্ধ লাগে না, উত্তরাধিকার লাগে না– লাগে না আত্মপরিচয়ের বস্তুনিষ্ঠ ঠিকানা। কিন্তু বাঙালি জাতির এসবই আছে। আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রস্তুতি বাঙালির একেবারে অপ্রতুল নয়, তবে অসম্পূর্ণ। বাঙালির স্বপ্ন বাঙালি সমৃদ্ধ হবে– সোনার বাংলা গড়ে তুলবে। কিন্তু বাঙালির কর্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশকে আধুনিক বাংলাদেশ রূপে গড়ে তোলা।

চার

বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান অবলম্বন ভাষা। বাঙালি জাতির এই ভাষাকেন্দ্রিক আত্মচেতনার তাৎপর্য নিয়ে বহির্বিশ্বের অনেকে বিস্মিত হন। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের ইতিহাসে দেখা যায় একই ভাষাভাষী মানুষ বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন : আবার বহুবিধ ভাষাভাষী মানুষ অভিন্ন ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু

বাঙালি জাতির জাতিরাষ্ট্র গঠন তথা স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান প্রেরণা বাংলা ভাষা। আর এই ভাষাকেন্দ্রিক ঐক্যচেতনার স্ফুরণ ঘটল এমন এক পরিবেশে যেখানে ঐতিহাসিক বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাভাষীর একাংশ ভিন্ন রাষ্ট্রে একীভূত। এপার-বাংলা ওপার-বাংলার বিভেদ অতিক্রম করে পূর্ববাংলার মানুষ যে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হল এটা বিস্ময়ের ব্যাপার তা বটেই। এর মধ্যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার প্রচ- লড়াই হয়েছে বাঙালির চৈতন্যজগতে।

প্রথমে প্রতিক্রিয়ার কথাটাই বলি। পাকিস্তানের প্রতি বাঙালির কখন কিভাবে মোহভঙ্গ ঘটেছিল, বা আদৌ মোহভঙ্গ ঘটল কি ঘটল না এটাই বড় কথা নয়; পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মূলে আসলে কোনো আধুনিক চৈতন্যগত ভিত্তিই ছিলো না– এই উপলব্ধি বাঙালি মুসলিম জাতিকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। পাকিস্তান নামক এই চৈতন্যগত ভিত্তিহীন জাতীয়তাবোধের চাপিয়ে দেওয়া ঠুনকো আবরণ বাঙালিকে তার শেকড়ের অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রবলভাবে।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তিকে আমরা বলে থাকি দ্বিজাতিতত্ত্ব। কিন্তু এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যেই দিয়েই পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধ এবং মূল্যবোধের আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। বিষয়টা দ্বিজাতিতত্ত্বের চেয়ে বেশি কিছু। পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের মূল কথা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের আত্মসম্পদের কোনো অভাব নেই। পাকিস্তান মুসলমানদের এবং মুসলমানদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ সোনার সিড়িতে বাঁধানো। এই রকম পশ্চাৎমুখিন আত্মশ্লাঘাপূর্ণ মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ এক রাষ্ট্র পাশ্চাত্যকে হার মানিয়ে দিতে চাইল বহিরঙ্গের আধুনিকতায়। পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের সব চেয়ে নিকৃষ্ট দিক হল, সে কোনো ভাবেই স্বীকার করতে চাইল না বা স্বীকার করার উপলব্ধি অর্জন করতে পারল না যে সে পশ্চাৎমুখিন মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ। দ্বিজাতিতত্ত্ব শুধু হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির ভিন্ন অস্তিত্বের কথাই বলে। কিন্তু পাকিস্তান একটা রাজনৈতিক মুসলিম জাতির অভ্যুদয়ের স্বপ্নে বিভোর হল, যে জাতিতে ইসলাম ধর্মের সারবত্তা বিপন্ন করে অপরিবর্তনীয় জীবনবিধানরূপী ইসলাম আবিষ্কারের চর্চা চলল একটা রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধ সুসংহত করার জন্য। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে শুধু পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই উদ্ভব হয়নি, ভারত রাষ্ট্রের উদ্ভবও দ্বিজাতিতত্ত্বেরই ফসল। কিন্তু পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের মূল বৈশিষ্ট্য হল, এই জাতীয়তাবোধ মুসলমান সমাজকে বোঝাতে চেয়েছে যে, পাকিস্তানের সবকিছু আছে যেমন ভারতের অনেক কিছু নেই। পাকিস্তানের আছে ইসলাম যা ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারতের হিন্দুধর্ম সাত সমুদ্র তের নদীর

ওপার থেকে ইংরেজ এসে যার সংস্কার করে, আর ইসলামের জের-জবর পরিবর্তন করার ক্ষমতা বিশ্বের কোনো শক্তির নেই।

এইভাবে পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধকে একটা অনড়-শাস্ত্রবদ্ধ ধর্মের অবয়বের সঙ্গে যুক্ত করে একটা প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবোধের মিথ্যা স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হল মুসলমান সমাজকে। এই প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবোধ যে একেবারেই বিকাশহীন পশ্চাৎমুখিন সে উপলব্ধি যেমন আধুনিক রাজনৈতিক ভাবনাকে কাতর করল তেমনি এই জাতীয়তাবোধ যে ইসলামি আন্তর্জাতিকতার নামে মুসলমান সমাজকে নিজেদের শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে এক আত্মপরিচয়হীন উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে ফেলতে চাইছে সে উপলব্ধিও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে। বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয়হীন উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার সরাসরি প্রস্তাবটা আসে উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষায় পরিণত করার অভিপ্রায় মধ্য দিয়ে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কনফেডারেশন-ধর্মী রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি সচরাচর ঘোরতর আপত্তির কারণ হয়ে উঠে না। কিন্তু পাকিস্তান যেখানে কোনো প্রকার আধুনিক জাতীয়তাবোধের অস্তিত্বহীন একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবোধের উপলব্ধিতে বাঙালির ভাষার উপর আঘাত করে সেখানে আঘাতটা শুধুমাত্র ভাষার উপর সীমাবদ্ধ না থেকে বাঙালি জাতিসত্তার তাৎপর্য বোধটাকেই নতুন ভাবে নাড়া দেয়। পাকিস্তানের তথাকথিত সেই ইসলামি রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনবাদী জাতীয়তাবোধ মুসলিম সমাজকে এমন আত্মদ্বন্দ্বে ফেলেছিল যে, মুসলমানকে অবশ্যই রাজনৈতিক মুসলমান হতে হবে অন্যথায় বাঙালি বা রাষ্ট্রীয় অমুসলিম। বাঙালি মুসলমানের স্বীকৃতি পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের দর্শনে ছিল একেবারে অগ্রাহ্য। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান নিজেকে ইসলামি রাষ্ট্র বলে দাবি করেছিল। আর কবি ইকবালের সেই ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী গান, 'মুসলিম হ্যায় হাম, সারে জাহান, ওয়াতন হ্যায় হামারা' পাকিস্তানের রাজনৈতিক রণধ্বনি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তানের এই ফ্যাসিবাদী জাতীয়তাবোধের ছায়াতলে পূর্ববাংলার মুসলমান তখন নিজেদের মুসলিম অস্তিত্বের ভারেই দারুণ অসহায়। ব্যক্তিমানুষের গায়ে আধুনিক জাতীয়তাবোধের তুলনায় ধর্মের গন্ধ বিশ্বের সর্বত্রই উগ্র। বাঙালির বেলায় এর ব্যতিক্রম ছিল না। বাঙালি মুসলমান তার মুসলমানিত্ব খাটো করার ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধকে তো প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এটাই ছিল বাঙালির আত্মদ্বন্দ্বের মূল কথা। কিন্তু পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবির সমসাময়িক বাঙলার কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন? কা-রী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মোর।'

বাঙালি মুসলমান বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে যে আত্মদ্বন্দ্বে নিপতিত ছিল এর অবসানের সুস্পষ্ট পদক্ষেপ সূচিত হয় ভাষার উপর তার অধিকারের ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। ভাষাকেন্দ্রিক আত্মোপলব্ধি এবং ঐক্যচেতনা বাঙালি মুসলমানকে 'হিন্দু না সে মুসলিম' এই ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করার শক্তি যোগায়। পাকিস্তানের উদ্ভাবিত প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎমুখী বিমূর্ত মুসলিম জাতীয়তাবাদ যেখানে রক্ত-মাংসের বাঙালি-জাতীয়তাবাদের জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসে ছিল সেখানে বাংলা ভাষার মতো শক্তিশালী ঐক্য মাধ্যম ছাড়া বাঙালির জাতীয়তাবোধ পুনরুদ্ধার আদৌ সম্ভব ছিল কিনা বা গঠনমূলক সহজসাধ্য ছিল কিনা তা ভাবাই কঠিন। পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষাভাষীরা ও হয়তো বিস্মিত হন এই কথা ভেবে যে পূর্ববাংলার মানুষের কাছে বাংলা ভাষা কেন এমন উজ্জীবনী মন্ত্ররূপে আবির্ভূত হল! বাঙালি মুসলমানের জন্য বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য একরকম নয়। বাঙালির স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের জন্য বাংলা ভাষার তাৎপর্য অপরিসীম হয়ে আছে শুধু ভাষার কারণেই নয়, একটা পশ্চাৎমুখিন জাতীয়তাবোধ থেকে আধুনিক জাতীয়তাবোধে উত্তরণের প্রয়োজনেও। ভারতীয় বাংলা ভাষাভাষী বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছাড়াও ভারতীয়। কিন্তু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছাড়া আত্মপরিচয়হীন উদ্বাস্তু এক জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এই উপলব্ধি বাঙালি মুসলমান সমাজকে আলোড়িত করতে পেরেছিল। বাঙালির ভাষা-চেতনা এবং স্বাধীনতা-চেতনায় খোদ ভাষা যে গৌণ তা নয়। কিন্তু ভাষাকে অতিক্রম করে আরো ব্যাপক এবং গভীরতর তাৎপর্যকে ধারণ করেছিল এই ভাষা-চেতনা। বাঙালি দুধে-ভাতে হাপুস-হুপুস করে বাঁচার জন্য যে স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাতের মতো স্থূলকায় বস্তুর কাড়াকাড়িতে পাকিস্তানকে দ্বিখ-িত করার মতো একটা ঘটনার নাম বাঙালি জাতির অভ্যুদয় নয়। দ্বিখ-িত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বসবাসের জন্য এর নাম এবং পদপদবির কিছু পরিবর্তন সাধন করে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছি বলে যদি আমরা ভাবতে শিখি তবে দুধ-ভাতের গল্পও আমাদের জোর করেই ভুলতে হবে। পশ্চাৎমুখিন আদর্শের বোঝা মাথায় নিয়ে আর যা-ই করা যাক জীবনের গল্প বলা যায় না। পাকিস্তানের অন্তঃসারশূন্য পশ্চাৎমুখিন জাতীয়তাবোধের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য এদেশের সচেতন মুসলমান সমাজ আত্মপরিচয়ের যে অনুসন্ধান শুরু করে সেখাইে তার পাশে এসে দাঁড়ায় বাংলাভাষা। আর ভাষার উপর সরাসরি আক্রমণ বাঙালিকে জাগিয়ে দিল ভোর হওয়ার আগেই।

শুধু পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে হিসেবেই বাঙালির ভাষা-চেতনা তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি, এর নিজস্ব বিকাশের তাৎপর্য এর চেয়েও

গভীর। ভাষা সব জাতিরই আছে, কিন্তু বাঙালি কি তার ভাষা নিয়ে বেশি উচ্ছসিত হয়েছে? হয়তো কিছুটা। তবে এর অনিবার্য কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে, বাঙালির আধুনিক যুগে প্রবেশ করার অনিবার্য তাগিদ। মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং মানুষের ভাষার ইতিহাস যতটা পুরনো মানুষের চিত্তবৃত্তির বৈপ্লবিক বিকাশের ইতিহাস অতটা পুরনো নয়। মানবসভ্যতায় রেনেসাঁর যখন সূত্রপাত বাংলাভাষা তখনো সূতিকাগারে। আর রেনেসাঁ প্রভাববলয়ের মধ্যে বাঙালি প্রবেশ করতে পেরেছিল কিছুটা উষালগ্নেই। রেনেসাঁ যে ধার করার বস্তু নয়, অনুকরণের বিষয় নয়, এই বাস্তবতা থেকে বাঙালিকেও আসতে হবে শিকড়ের সন্ধানে। না বুঝে কোরআন শরীফ পড়ে মোল্লা সাজা গেলেও না বুঝে মানুষকে যে বিশ্বাস করা বা ভালোবাসা যায় না এ উপলব্ধি বাংলার জানালা দিয়েও প্রবেশ করতে থাকে।

বাঙালির ভাষাচেতনার মূল্যে অন্যতম অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিল রেনেসাঁ-উদ্ভূত চিত্তবৃত্তির অনুশীলন। উত্তরাধিকারসূত্রে খুব সমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী ছিল না বাঙালি। কিন্তু চিত্তাবৃত্তির যোগ্যতায় এবং রেনেসাঁর ভেতরে প্রবেশ করার দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে বাঙালি একটুও পেছনে পড়তে চায়নি। আধুনিক যুগে প্রবেশ করার জন্যই বাঙালি নিজেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে আরো শিকড়মুখিন হয়ে। মুসলমানের আন্তর্জাতিক ভাষা আরবি-ফার্সির প্রতি কোনো অনীহা বা অবজ্ঞার দ্বারা বাংলার মুসলমান প্রভাবিত হয়নি কোনোদিন। উর্দুকেও বাঙালি তার ঐতিহ্যের অংশিদারিত্ব থেকে বাতিল করে দেয়নি। কিন্তু অতীতের মধ্যে নিজের চিত্তবৃত্তিকে বন্দি করে না রেখে নিজের আত্মোপলব্ধিকে চিত্রিত করার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাঙালির ভাষা-চেতনা।

অভিন্ন শিক্ষানীতি আর বাংলা ভাষার প্রতি প্রতিশ্রুতির কথা উঠলে এখনো অনেকেই মাদ্রাসাশিক্ষা আর কিন্ডারগার্টেনকে পাশাপাশি এনে দাঁড় করিয়ে ফেলেন। আসলে বাঙালির বাংলা ভাষা-চেতনা এবং বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার লড়াই বিদেশি ভাষার বিরুদ্ধে স্বদেশি ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার একটা লড়াই নয়। এটা হচ্ছে আপ্তবাক্য আশ্রয়ী ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার লড়াই, মূল্যবোধহীন চেতনার বিরুদ্ধে মূল্যবোধসম্পন্ন চেতনার লড়াই, আত্মপ্রতারণামূলক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ মূল্যবোধের লড়াই, সর্বোপরি পশ্চাৎমুখিন বদ্ধচিন্তার বিরুদ্ধে আধুনিক মুক্তচিন্তার লড়াই। পৃথিবীর অন্য যেখানে যেভাবেই হোক-না কেন বাঙালির আধুনিক যুগে প্রবেশের লড়াই এবং মুক্তচিন্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই মাতৃভাষা চেতনার মধ্য দিয়েই আধুনিক বাংলার অগ্রযাত্রার সূচনা। বাংলায় প্রথম আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে কলকাতাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু দেশবিভাগের পর বিভক্ত বাংলায় পূর্ববঙ্গের জন্য বাংলা ভাষা যেমন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঠিক তেমনটা ঘটেনি।

পশ্চিমবাংলা ভারতীয় পরিম-লের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় আধুনিক ভারতীয় জাতি গঠনের অনুশীলনে। কিন্তু পূর্ব বাংলার জন্য আধুনিক যুগে প্রবেশ করার একমাত্র দুয়ার হয়ে ওঠে বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার তাৎপর্যে আসলে পূর্ব বাংলা বা পশ্চিম বাংলা মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়। বিশেষ ভাবে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের জন্য বাংলা ভাষার তাৎপর্য মুখ্য। বাংলা ভাষার সগৌরব অস্তিত্ব ছাড়া বাঙালি মুসলমান সমাজের অস্তিত্ব ভৌতিকভাবে উদ্বাস্তু শিবির এবং চেতনাগতভাবে মধ্যযুগের আফগানিস্তানের চেয়ে বেশি কিছু হওয়া অসম্ভব। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাঙালি যুদ্ধ করেছে। তবে গৃহযুদ্ধ করেনি, কিন্তু বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি মুসলমানের লড়াই যুদ্ধে, গৃহযুদ্ধে এবং ঠা-াযুদ্ধে দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বিস্তীর্ণ। এ যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। বাংলা না ইসলাম এই বিতর্কে বাঙালি মুসলমান আজো লিপ্ত। চেতনাটা ভাষায় নয়, ভাবে। এত সব আত্মদ্বন্দ্ব আর বিপত্তির মধ্য দিয়েও মুসলমান বাঙালি জাতি প্রতি পদক্ষেপে অর্জন করেই চলে এবং সামনেই চলে এটাই বাঙালি জাতির গৌরব এবং সৌভাগ্য।

মাতৃভূমি, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

উৎস: গ্রন্থ: বাঙালি মুসলমান/আত্মপরিচয়ের সন্ধানে। প্রকাশক মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার।]

[লেখক: গবেষক।]

বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উৎস ও ক্রমবিকাশ (প্রাথমিক পর্ব)

গৌ ত ম রা য়

বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্রমবিকাশ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সমাজবিজ্ঞানীদের বিচার-বিশ্লেষণে এই অধ্যায়টি এখনও পর্যন্ত তেমন গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়নিই বলা যেতে পারে। সেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে অস্তগামী সূর্যের দিকে প্রার্থনারত মানুষদের মায়ের অভিষেক পর্বে শামিল করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তা কবিরই ভাষায় মিছে হাসি খেলা প্রমোদের ভেলা মিছে কথার ছলনাই হয়ে গেছে। বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস একা হিন্দুর ইতিহাস নয়, একা মুসলমানের ইতিহাস নয়, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈনদেরও নয়। "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"– রবীন্দ্রনাথের এই মর্মবাণী বাংলা, বাঙালি তথা ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের অন্তর্নিহিত সত্য। এই সত্যের অনুসন্ধান পর্বে একাংশের সমাজবিজ্ঞানীদের একদেশদর্শিতা শুধু বিভেদকামী শক্তিকেই উৎসাহিত করেনি, ভারতাত্মার মর্মমূলে প্রবেশ করতেও বাধার সৃষ্টি করেছে। ফলে বাংলা তথা বাঙালির তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসকেই অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। এই অসম্পূর্ণতার প্রাচীরকে সম্পূর্ণতা দেয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ব।

বাঙালি মুসলমান সমাজে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বাংলার সামাজিক আন্দোলনে একটি নব পর্যায় যুক্ত করেছে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মুসলমানের ভিতরে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তারা আধুনিক শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় ধ্যানধারণাকেও অনেকখানি বেশি গুরুত্ব দিতেন। এই পর্বে বাঙালি মুসলমানের ভেতরে যে সব

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছিলেন, যেমন; হাজি শরিয়তউল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০), দুদু মিঞা (১৮১৯-১৮৮২), তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) প্রমুখের পরিচয় ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে উঠে এলেও এঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তা-চেতনার কথা সেভাবে আলোচিত হয় না। এই ব্যক্তিত্বরা গোটা বাংলা জুড়ে যে ফরায়েজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন (এই আন্দোলনের সময়কালটা মোটামুটিভাবে ১৮১৮-১৮৭০ সালের ভিতরে ব্যাপ্ত ছিল) তা বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আন্দোলনগুলোর প্রকাশ্য ভাবনায় বিশুদ্ধ ইসলামের কথা বলা হয়েছিল। এই ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভাবনা নেতৃত্বের মনে এই কারণে এসেছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার তাগিদে ভারতবর্ষের মানুষদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করতে চাইছে। লোকায়ত ধর্মের যে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে কয়েকশো বছর ধরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে সমাজের ভূমিস্তর পর্যায়ে হিন্দু ও ইসলাম এই দুই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মিলেমিশে গিয়ে এক অপূর্ব সমন্বয়ী চিন্তাচেতনার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। উত্তর-বৈদিক যুগ থেকে এই সমন্বয়ী চেতনাই হল ভারতাত্মার মূল বিগ্রহ।

ইসলামি ধর্মাবলম্বী যেসব মানুষ ভারতবর্ষের শাসক হয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু ভারতাত্মার এই মূল চেহারা উৎখাত তো দূরের কথা অঙ্গহানি পর্যন্ত করেননি, বরঞ্চ সমন্বয়ী চেতনা ভারতাত্মার এই মূল ভাবধারাকে সুলতানি আমল বা মোঘল আমলের শাসকেরা আরো পল্লবিত করেছিলেন। আওরঙ্গজেব প্রমুখ কোনো কোনো শাসকের কথা উল্লেখ করে অনেকে মধ্যযুগের শাসকদের ভারতাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সাধনাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল আওরঙ্গজেব প্রমুখদের সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পকথা আর তথ্যপ্রমাণসহ সঠিক ইতিহাসের ভিতরে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এইসব শাসকরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় অসূয়ার যে পরিচয় রেখেছিলেন তার পেছনে তাঁদের রাজনৈতিক অভীপ্সাই বেশি সক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিন্তু প্রথম থেকেই ভিন্ন পথে হাঁটতে শুরু করে। মনে রাখা দরকার বণিকের মানদ-ের পাশাপাশি ধর্মযাজক ও ধর্মপ্রচারকদের এবং ধর্মপ্রচারকদের একটি বড় অংশ নিয়ে তারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে এসেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মদদপুষ্ট এই ধর্মপ্রচারকেরা যিশুখ্রিস্টের উদার প্রেমের বাণীকে বিকৃত করে তাকে কোম্পানির স্বার্থে তথা ব্রিটিশের স্বার্থে পরিচালিত করবার জন্যে প্রথম থেকেই ভয়ংকর রকম আগ্রাসী ছিল। তাদের লক্ষ্যই ছিল মোঘল শাসনের শেষ পর্বের চরম অবক্ষয়ী সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সম্পর্কে এখানকার মানুষদের মনে একটা ভুল ধারণা গড়ে তোলা। মোঘল

শাসনের শেষ পর্বে দীর্ঘকালব্যাপী রাজদরবারের নানান সঙ্কট হেতু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরে সামাজিক অনগ্রসরতা, অন্ধত্ব, জাতপাতের দ্বন্দ্ব একটা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। হিন্দু সমাজে জাতপাতের দ্বন্দ্ব কী প্রবল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তার স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সামাজিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বাণীর ভেতরে।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার হেতু ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ভিতরে যে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ছিদ্রপথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষায় খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারের নাম করে অধর্মের এই বাজারকে সম্প্রসারিত করতে শুরু করে খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা। হাজি শরিয়তউল্লাহ, দুদু মিঞা, তিতুমির প্রমুখেরা বিশুদ্ধ ইসলামের লক্ষ্যে যে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মূলে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষের নিজস্ব ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে নিজেদের চিন্তাকে তুলে ধরা। এই আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে তাঁরা আন্দোলন শুরু করলেও তা ক্রমশ অত্যাচারী জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। বলা বাহুল্য আন্দোলনের নেতাদের কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অত্যাচারী নীলকর সাহেব, ও তাদের সহযোগী দেশীয় জমিদারকুল হয়ে উঠেছিল কোম্পানির তথা ব্রিটিশ শাসকের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। ফরায়েজি বা ওয়াহাবি বা তরিকা-ই-মহম্মদিয়া ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে উঠলেও তাদের মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। তাই এই আন্দোলন ক্রমশ নিছক সামাজিক আন্দোলনের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে অচিরেই হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দুঃখের কথা হল দীর্ঘকাল ধরেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা তো দূরের কথা দেশভাগের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাদের চিহ্নিত করে মানুষের মনে একটা বিকৃত ইতিহাসবোধ তৈরি করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। আজ আমাদের সময় এসেছে বিকৃতির এই বেড়াজালকে ভেদ করে সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস মানুষের কাছে তুলে ধরা।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংস্কারবাদী চিন্তা-চেতনা বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছিল। মুসলমান সমাজে সংস্কারবাদী চিন্তা-চেতনার মূলে যেমন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ছিল, হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাবনার মধ্যে কিন্তু তা ছিল না। ওই সময়কালে হিন্দু সমাজের সংস্কারবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে ঘিরে গড়ে

ওঠা আন্দোলন। এই আন্দোলন রামকৃষ্ণ দেবের জীবদ্দশায় কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পরিম-লেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ তাতে 'শিব জ্ঞানে জীবসেবা' নামক কর্মকা-টি যুক্ত করেন। বিবেকানন্দের এই ভাবনার পিছনে অবশ্যই রামকৃষ্ণের পরমতসহিষ্ণু, মৌলবাদ-বিরোধী সমন্বয়ী চিন্তাধারার সবথেকে বেশি অবদান ছিল। তবে মুসলমান সমাজের সংস্কারবাদী আন্দোলনের চিন্তাধারার মতো রামকৃষ্ণ-আন্দোলন কিন্তু সামাজিক সংস্কারের পরিম-লের দিকে পা না বাড়িয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ও সেবার অঙ্গনেই। ইসলামীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ধীরে ধীরে কৃষকের আর্থ-সামাজিক স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে পরিণত করেছিল। জমির মালিক আল্লা তাই জমির ওপরে কর বসানো বেআইনি– ফরায়েজিদের এই ঘোষণা সেই সময়কালের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক ছিল (P J D O C No. 25, 29th May, 461; O C N. 99, 7th April, Page-147, এটি ফরায়েজি আন্দোলন সম্পর্কে একটি অপ্রকাশিত দলিল)। বিশুদ্ধ ইসলামের লক্ষ্যে সৃষ্ট এই আন্দোলন ক্রমে এইভাবে অত্যাচারী জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল বিরোধিতা শুরু করে। এই আন্দোলনকেই আধুনিক যুগে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা বিকাশের সুতিকাগৃহ বলতে হয়।

সংস্কারবাদী আন্দোলন বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেতরে যে প্রবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করে তা ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো বেগবান করেছিল। এই দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে এই সংস্কারবাদী আন্দোলন দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনার সলতে পাকানোর কাজটি করেছিল। সার্বিকভাবে বাঙালি মুসলমানের এই ব্রিটিশ-বিরোধিতাও কিন্তু শ্রেণিনিরপেক্ষ ছিল না। ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যে মানুষরা সমাজের নেতৃত্বে উঠে আসছিলেন তাদের বেশিরভাগ অংশটিই ছিল উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আসা। এই উচ্চবিত্তদের জীবিকার প্রধান উৎসই জমিদারি। তাই উচ্চবিত্তের মানুষদের ভিতরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা কোনোদিনই সেভাবে দানা বাঁধেনি, নিছকই শ্রেণিস্বার্থের তাগিদে। সংস্কারবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব ব্রিটিশের বিরোধিতা করে যেমন তাদের বিরাগভাজন হন, তেমনি এই আন্দোলনের সমর্থক হাজার হাজার সাধারণ মানুষও ব্রিটিশের রোষানলে পড়ে। সংস্কারবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী অংশ বা তাদের সহযোগী সাধারণ মানুষের এই ব্রিটিশের বিরাগভাজন হয়ে পড়ার বিষয়টি কিন্তু উচ্চবিত্তের মুসলমানদের নজর এড়ায়নি। এই জায়গা থেকেই উচ্চবিত্তের মুসলমানেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের বৈরীতার

মনোভাব না নিয়ে তাদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলতেই শুরু করে। নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার তাগিদে উচ্চবিত্তের মুসলমান সমাজের মানুষেরা ব্রিটিশের প্রতি যে সহযোগিতার নীতি নিয়ে চলতে শুরু করেন, তার নেতৃত্বে ওই সমাজেরই নবউত্থিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'দূরবীন' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আবদুর রউফ, সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), নবাব আবদুল লতিফ (১৮১৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর হোসেন (জন্ম ১৮৪৩)। প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের সংস্কারবাদী আন্দোলনের জেরে মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষদের ভিতরে যে প্রবল ব্রিটিশ-বিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়েছিল তার ফলে ব্রিটিশদের ভিতরেও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচ- রকমের নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কারবাদী আন্দোলনের পরে গোটা দেশব্যাপী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে (১৮৫৭) মুসলমান সমাজ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুসলমানদের প্রতি ক্ষোভ আরো প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এই ক্ষোভ উপশমের লক্ষ্যে মুসলমান সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষরা প্রয়াসী হন। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার আগেই ব্রিটিশের তল্পিবাহক উচ্চবিত্তের লোকেরা হয়তো আসন্ন সংগ্রামের কোনো পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। কারণ, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে নিজেদের সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে উচ্চবিত্তের লোকেদের ওই সময়কালের যে ধরনের কর্মব্যস্ততা লক্ষ করা যায়, তা থেকে বিদ্রোহের পূর্বাভাস সম্পর্কে তাঁদের ধারণার সম্ভাবনাকেও একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কলকাতা মাদ্রাসার আরবির অধ্যাপক আবদুর রউফ ১৮৫৫ সালে 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সংগঠনটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মৌলবী ফজলুর রহমান আর সম্পাদক ছিলেন মৌলবী মহম্মদ মজহার। নবাব আবদুল লতিফও এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মুসলিম স্বার্থরক্ষা এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের উচ্চবর্ণে, উচ্চবিত্তের লোকেদের ভিতরেই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সংগঠনটির সে অর্থে কোনো সম্পর্কই ছিল না। শ্রেণিস্বার্থের তাগিদ মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা বোঝা যায় এঁদের কার্যক্রম থেকে। দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর এই সংগঠনের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সেই মহাসংগ্রাম থেকে বিরত থাকার আবেদন জানানো হয়। শুধু তাই-ই নয়, বিদ্রোহদমনের সাফল্যের জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে ইংল্যান্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার কাছে এই সংগঠনটির পক্ষ থেকে অভিনন্দনও জানানো হয়। ফার্সি ভাষায় এই সংগঠনটির পক্ষ থেকে 'দূরবীন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আগাগোড়াই ছিল ব্রিটিশ স্তুতিমূলক। বাঙালি মুসলমানের ভিতরে

ব্রিটিশ শাসন তথা শোষণের প্রতি ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা তৈরি করার লক্ষ্যে এই পত্রিকাটি প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিল। বলাবাহুল্য তাদের সেই প্রচেষ্টা কিছুটা সাফল্যলাভও করেছিল।

উচ্চবিত্তের বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরে আধুনিক শিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সংস্কারবাদী আন্দোলনের সময়কাল থেকেই যত্নবান হতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নবাব আবদুল লতিফের কথা। মহাবিদ্রোহের অল্প কিছুকাল পরেই (১৮৬৩) তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি অফ ক্যালকাটা'। তারও আগে বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে (১৮৫৬) নবাব আমীর আলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'। এর কিছুকাল পর (১৮৭৬) সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠা করেন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংস্থাগুলো উচ্চবিত্তের মুসলমানদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার তাগিদে প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে উঠলেও ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষাসংক্রান্ত নতুন ভাবধারার সঙ্গে বিত্ত, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি মুসলমান সমাজের সার্বিক পরিচয় সাধনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। নবাব আবদুল লতিফ চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান আয়োজিত ছোট ছোট বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমান সমাজের পরিচয় সাধন করার। যেকোনো ধরনের ধর্মীয় বিতর্ক থেকে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। রাজনীতিতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না, তাঁর রাজনৈতিক পরিম-ল থেকেই তিনি দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। সেই সময়কালের প্রখ্যাত ইসলামীয় তাত্ত্বিক মৌলানা কেরামত আলী (১৮০০-১৮৭৩) আবদুল লতিফের কর্মকা-কে প্রবলভাবে সমর্থন করেছিলেন। লতিফের কলকাতার বাসভবনে ১৮৭০ সালের ২৩ নভেম্বর কেরামত আলী এক সভায় ঘোষণা করেন, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুসলমানদের জেহাদ করবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ, ভারত দারুল হারব নয়। মুসলমানদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ওই সভাতেই তিনি তাদের ইউরোপীয় ভাষা শেখার উপরে খুব জোর দিয়েছিলেন।

বাংলায় মুসলমান সমাজকে রাজনৈতিক পরিম-লে নিয়ে আসার লক্ষ্যে আধুনিক সময়ে যিনি প্রথম যত্নবান হয়েছিলেন, তিনি হলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি মনে করতেন, একজন আধুনিক মুসলমান যুবককে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি রাজনৈতিক শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। ১৮৭৬ সালে তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামক যে সংগঠনটি তৈরি করেছিলেন তা পরবর্তী পঁচিশ বছর সময়কাল ধরে অত্যন্ত সক্রিয় থেকেছে এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের ভিতরে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রসারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন

করেছে। বাংলার মুসলমানের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ব্রিটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরে সেগুলোর প্রতিকারের জন্য এই সংস্থা প্রথম থেকেই অত্যন্ত যত্নবান ছিল। তাদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় দাবিগুলো নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতে। এই সংস্থার পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করা হয় এই ঘোষণা করতে যে, দেশের সমস্ত প্রদেশগুলোতে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য, তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই যে, সরকারি চাকরির পদ পূরণের সময়ে দেশের সমস্ত প্রদেশগুলোতে মুসলমান প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (AMMER ALI: HIS LIFE AND WORK by K K Aziz, Lahore, Page 47-48, 1968) পরবর্তীকালে ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসি' তৈরি করেছিলেন। অনেকের মতে আমীর আলীর কর্মকা- বিশেষ করে সেই সময়ের লন্ডন থেকে প্রকাশিত *Nineteenth Century* নামক একটি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর লেখা 'ইন্ডিয়া এন্ড দ্য নিউ পার্লামেন্ট' নামক প্রবন্ধটি নবাব বাহাদুরকে ওই সংগঠনটি তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষরকম ভাবে উৎসাহিত করেছিল। প্রবন্ধটি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। (*Early Years of the Muslim League* by Sd Razi Wasti. *পাকিস্তান হিস্টোরিকাল সোসাইটির* মুখপত্রে ১৯৬১ সালের ৪ অক্টোবর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা: ২৪৩-২৪৫)

সৈয়দ আমীর আলী মুসলমান যুবকদের রাজনীতিতে উৎসাহ দেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন তাতে উত্তর ভারতের বিশিষ্ট সংস্কারবাদী ব্যক্তিত্ব স্যার সৈয়দ আহমেদ (১৮১৭-১৮৯৮) এবং আবদুল লতিফের সঙ্গে তাঁর একটা মতবিরোধ দেখা দেয় (এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় স্যার সৈয়দ আহমেদকে মুসলিম নবজাগরণের সূচনাকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবেই অভিহিত করা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্যার সৈয়দ আলিগড়ে তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করারও কয়েক বছর আগে অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লাতে নবাব ফয়েজুন্নেসা চৌধুরাণী প্রথম স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইদিক থেকে বিচার করে বলতে হয়, মুসলিম নবজাগরণের সূচনা কিন্তু আলিগড়ে ঘটেনি। ঘটেছিল, অবিভক্ত বাংলাতেই, এবং ঘটিয়েছিলেন এক মহীয়সী বাঙালি নারী। প্রসঙ্গত বলতে হয়, ফয়েজুন্নেসাই হলেন এক এবং একমাত্র ভারতীয় জমিদার, যিনি ইংল্যান্ডের মহারানির কাছ থেকে সরাসরি 'নবাব' উপাধি লাভ করেছিলেন)। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বেশ কিছু আগে ভারতের দেওবন্দ ও আলিগড়ে দু'টি পৃথক ভাবধারার মুসলিম সংস্কারবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৬৭ সালে দেওবন্দে ওই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মৌলানা আবুল কাশেম নানাতভী (১৮৩২-১৮৮০)। আলিগড়ের আন্দোলনের সূচনাকর্তা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ। দেওবন্দিদের চিন্তা-চেতনায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ-র (১৭০৩-

১৭৬২) গভীর প্রভাব ছিল। প্রথমদিকে তারা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেও ক্রমশ রাজনৈতিক পরিম-লের সঙ্গে তাদের একটা সংযোগ গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা প্রবলভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে ওঠে। জাতীয় আন্দোলনের সময়কালে বহু ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে অতি সাম্প্রতিককালে তারা এমন কিছু কথাবার্তা সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, যা গভীর উদ্বেগজনক। কারণ, স্বাধীনতার পরেও ক্ষমতাসীন-কংগ্রেস দলের সঙ্গে দীর্ঘকাল দেওবন্দিদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। অতি সম্প্রতি সেই সুসম্পর্কে চির ধরেছে। কিছু কিছু সামাজিক প্রশ্নে সাম্প্রতিককালে এরা এমন কিছু অবস্থান নিয়েছেন, যা আধুনিক ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে ওই সমাজেরই উপরের তলার মানুষদের ভিতরে সর্বভারতীয় স্তরে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার আঁচ কিছুটা হলেও বাংলায় এসে লেগেছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের ভিতরে প্রথম থেকেই কংগ্রেস-বিরোধিতা ছিল তীব্র। নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের কংগ্রেস-বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাঁরা মনে করতেন কংগ্রেস হল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবকে তাঁরা কোনো অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারতেন না। কারণ, তাদের সে সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের আপন স্বার্থেই ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তায় চলা। তাই কংগ্রেসের ভিতরে যে ব্রিটিশ উপনিবেশিকতা-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বিংশ শতকের গোড়া থেকে ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে উঠেছিল তা সৈয়দ আমীর আলীদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল না। কংগ্রেসের প্রথম যুগ থেকেই রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সঙ্গেই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান সমাজের উপরের তলার অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে কংগ্রেস বুঝি ব্রিটিশরাজ খতম করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেই প্রথমযুগেই কংগ্রেসের উপরের তলার নেতৃত্বের কিছু অংশের ব্যক্তিগত সততাকে ঘিরে যে ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল তা-ও মুসলমান সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের ভিতর কংগ্রেসের সম্পর্কে সন্দেহের মাত্রাকে উস্কে দিয়েছিল। এছাড়া কংগ্রেসের ভারতের মানুষদের জন্য নিয়ম-নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশের কাছে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করে ছিল। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আর এম সায়ানী এই ধরনের অভিযোগগুলো তুলে ধরলেও সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের কংগ্রেসে যোগদান করবার সাদর আহ্বান জানান। স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে

যে সব প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই সায়ানী সেগুলো শুধু খ-নই করেননি, সেগুলোর তীব্র বিরুদ্ধতা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৮৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে মোট প্রতিনিধি ছিলেন ১২৪৮ জন, এঁদের ভিতরে ২১৯ জন ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। অথচ ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ১৬৬৩ জন প্রতিনিধির ভিতরে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন মাত্র ৪৫ জন। (*Lord Minto and the Indian Nationalist Movement* 1905-10, by Sd Razi Wasti, Lahore, Page-221) অর্থাৎ, আর এম সায়ানী প্রমুখ নেতৃত্ব মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনে মূল স্রোতে প্রবেশ করানোর জন্য যতই সচেষ্ট হোন-না কেন স্যার সৈয়দ আহমেদ বা তাঁর সহযোগীদের চিন্তাভাবনার প্রভাব তখন শিক্ষিত মুসলমান সমাজের উপরে অনেক বেশি পড়েছিল। তাই সায়ানী প্রমুখের কাতর আবেদন খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

মুসলমানের রাজনীতিতে প্রবেশ করা নিয়ে জাতীয় স্তরে বিতর্ক, তাদের উপনিবেশিকতা-বিরোধী অবস্থান নেয়া উচিত কি উচিত নয় তা নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদির জেরে যে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা জেগে উঠেছিল তা উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলাকে স্বল্প পরিমাণে হলেও প্রভাবিত করেছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় ধ্যানধারণার সংমিশ্রণ প্রথম থেকেই মুসলমান সমাজের মনে একটা স্বরূপের সঙ্কট তৈরি করেছিল। পরবর্তীতে কংগ্রেস নেতৃত্বের নরমপন্থী অবস্থানের জেরে যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী ভাবধারা গড়ে উঠেছিল তাতেও প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু ধর্মের দ্যোতনা প্রবল ছিল। এই ভাবধারা অবিভক্ত বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর পাশাপাশি অবিভক্ত পাঞ্জাব, তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গাতেও উচ্চবিত্তের হিন্দু বণিকদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে ধীরে ধীরে একটা সন্দেহের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী ভাবধারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিকাশ লাভ করেছিল তার নেতৃত্বদানকারী অংশের দেশপ্রেম, সততা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় তাঁরা সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারেননি। সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতা বাঙালি মুসলমানের মনে বিচ্ছিন্নতার চিন্তাকে প্রবল করে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। বাঙালি মুসলমান কিন্তু স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্নতাবাদের ফাঁদে, স্বাতন্ত্র্যবাদের বিতত বিতংসে পা দেয়নি। প্রবল ব্রিটিশবিরোধী দেশপ্রেমী সশস্ত্র বিপ্লবীরা তাঁদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করবার অল্প কিছুকাল আগে বঙ্গভঙ্গের কালে অস্তগামী সূর্যের দিকে প্রার্থনারত মানুষদের মাতৃ-মুক্তিযজ্ঞে শামিল করবার যে

আহ্বান রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বাংলার মুসলমান সমাজকে তথা গোটা দেশের মুসলমান সমাজকে বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দেয়।

বাঙালি মুসলমানের ভিতরে বিচ্ছিন্নতার ধ্যানধারণার বিকাশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমিকা আড়াল করবার লক্ষ্যে অনেকেই ১৮৮১-৮২ সাল নাগাদ প্যান-ইসলামের প্রবক্তা জামালউদ্দিন আফগানির কলকাতা সফরের কথা উল্লেখ করেন। মনে রাখা দরকার বিশ্বমুসলিমবাদের ধারণার প্রতিনিধি জামালউদ্দিন যখন কলকাতা সফর করেছেন সেই সময়কালেই কিন্তু রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন প্রমুখ এবং ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলনের যে সূচনা করেছিলেন তা এক চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল রামকৃষ্ণ ও তাঁর অনুগামীদের ভিতর দিয়ে। ওই সময়কালেই চিরন্তন ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় রামকৃষ্ণ যে সমন্বয়বাদী ধ্যানধারণার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন তা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' এই সময়কালের ঘটনাক্রম অবলম্বনেই রচিত। রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ধ্যানধারণা কিন্তু সেই সময়ে কলকাতা শহরের বাইরে সে ভাবে বিস্তার লাভ ঘটল না। অথচ কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্র রামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই তাঁর আধ্যাত্মিকতা বা আলৌকিকতা নয়, সমন্বয়ী চেতনাকেই জোরালোভাবে তুলে ধরেছিল। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, যেমন, মুসলমান (১৮৮৪), আখবারে এসলামিয়া (১৮৮৪), ইসলাম (১৮৮৫), আহমদি (১৮৮৬), সুধাকর (১৮৮৯), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১, ১৮৯৯), মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫), হাফেজ (১৮৯৭), নূর অল ইমান (১৯০০), সোলতান (১৯০২), নবনূর (১৯০৩), দি মুসলমান (১৯০৬), মোসলেম ক্রনিক্যাল (১৮৯৫) ইত্যাদি পত্রিকাগুলো বাঙালি মুসলমান সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। *সোলতান* এবং *দি মুসলমান* পত্রিকার বিষয়বস্তুগুলোতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকলেও অন্য পত্রিকাগুলো প্রধানত ধর্মীয় ধ্যানধারণাকেই গুরুত্ব দিত। এই সময়কালে কিছু বাঙালি সাহিত্যিক যেমন ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের রচনায় মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে নেড়ে, যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় মানুষদের ভিতরে একটা বড় রকমের ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন। ওই পত্রপত্রিকাগুলোতে সেইসব ক্ষোভের বহু প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি নবাব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ১৮৯৮ সালে 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি'-তে বঙ্কিম প্রমুখ সাহিত্যিকদের মুসলিমবিরোধী শব্দপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ থেকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল মন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গান। তাতে আছে– বাহুতে তুমি মা শক্তি/হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে/ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিনী ইত্যাদি। একেশ্বরবাদী কোনো মুসলিম ছেলে কী করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারত! এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনদিন বুঝে উঠতে পারেননি। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।' (*আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*– মুজফ্ফর আহ্মদ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ১০)।

এই সময়কালেই কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের ভিতরে আধুনিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী বহু সাহিত্যিক উঠে এসেছিলেন। মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), কায়কোবাদ, মুনসী মহম্মদ মেহেররুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯৩৭), মহম্মদ রেওয়াজউদ্দিন আহমেদ (১৮৬২-১৯৩৩), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), পণ্ডিত রেওয়াজউদ্দিন আহমেদ মাশ্হাদি (১৮৫৯-১৯১৯), মুনসী জমিরউদ্দিন (১৮৭০-১৯৩৭), মোজাম্মেল হক্ (১৮৬০-১৯৩৩), দেলয়ার হোসেন আহম্মদ মীর্জা (১৮৪০-১৯১৩), সৈয়দ এমদাদ আলী, শেখ ফজলুল করিম, আব্দুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, মৌলানা আক্রাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), শেখ মহম্মদ ইদ্রিস আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কায়কোবাদ, মীর মোশারফ হোসেন, সিরাজী, আক্রম খাঁ, ইসলামাবাদী প্রমুখ সারা জীবনব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসারে লড়াই করে গেছেন। সিরাজী ও আক্রম খাঁ স্বদেশী খিলাফত আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এঁদের চিন্তাধারায় সময়ের তালে তাল মিলিয়ে অনেক বিবর্তন ঘটেছে তবু ব্রিটিশ উপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামে এঁদের ঐতিহাসিক অবদান সব সময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কঠিন সত্য হল উনিশ শতকে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বা ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের সংস্কারবাদী চিন্তাভাবনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি শব্দও খরচ করেননি। রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের চিন্তা-চেতনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের ঠাঁই ছিল না। শুধু তাই নয়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩), বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) প্রমুখ হিন্দুগৌরব, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের মিশ্রণ যেভাবে ঘটিয়েছিলেন তা মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা বিকাশে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব পুলিন বিহারী দাস তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'নিয়ম করিলাম সমিতিতে মুসলমান নেয়া

হইবে না। কেহ কেহ আপত্তি করিল, "মুসলমানগণকে গভর্নমেন্টই উত্তেজিত করিয়াছে, আমরা সদ্ভাব রাখিলে মুসলমানগণও সদ্ভাব রাখিবে।"

'কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই এই যুক্তি মানিতে পারিল না।' (*আমার জীবন কাহিনী*– পুলিন বিহারী দাস, সম্পাদনা অধ্যাপক অমলেন্দু দে, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ১২০)। প্রখ্যাত বিপ্লবী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, '... বিপ্লববাদ সনাতনী হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যেই অনেকেই আবার হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থানকারীর দলে ছিলেন, কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু জাতীয়তায় পরিণত হইল' (*ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম*– ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭)। দয়ানন্দের ১৮৭৫ সালে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা, লালা হরদয়াল প্রমুখের অবিভক্ত পাঞ্জাব জুড়ে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাধারার বিকাশ, অ্যানি বেসান্তের 'থিওজফিক্যাল সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠা, বাল গঙ্গাধর তিলকের গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব, লালা লাজপত রাই-এর (১৮৬৫-১৯২৮) উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রচার একদিকে যেমন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে জোরদার করে, অপরদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকেও উস্‌কে দেয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমযুগে যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন নেহরু পর্যন্ত তার সমালোচনা করেছিলেন। (*An Autobiography*– Nehru, 1962, Page 24)।

১৩৫৭ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "মুসলমানরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদলাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।" (*রবীন্দ্র রচনাবলি*, দশম খ-, কলকাতা ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ৫০১)। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, বিপিন চন্দ্র পালের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যেও কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। পেশাগত জীবনে, বিশেষ করে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের অনুপস্থিতি বিপিন চন্দ্রকে যথেষ্ট ব্যথিত করেছিল। বসিরহাটের মুজিবর রহমান সম্পাদিত 'দি মুসলমান' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ৮ই মার্চ বিপিন চন্দ্র লেখেন,"Where does the conflict of interest lies? Is it in rural area? Hindu and Mohamedan cultivator have no conflicting interest with each other: they live as peacefully as desirable. In commercial field there is no competition between Hindus and Mohamedans…The conflict of interest comes in the government service…The Mohamedan is weak as far as education is concerned. Mohamedan would be practically no where in open competition with the Hindus…We will ask the Hindu older brothers not to enter into competition with Mohamedan whenever any educated Mohamedan

stands as candidate for appointment. Thus the conflict would be greatly minimized if Hindus do not care for the office. Let your love for Mohamedans be based on proper appreciation of their past History…" উনিশ শতকের নবজাগরণের শেষ প্রতিনিধি অন্নদাশঙ্কর রায় বিংশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছিলেন, সমস্যাটা তত্ত্বের নয়, স্বত্বের। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে হিন্দু সম্প্রদায় যে ভয়ঙ্কর অনুদারতা দেখিয়েছিল তা বাঙালি মুসলমানের ভিতরে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারার বিকাশে অনেকখানি বড় ভূমিকা পালন করে। *মোসলেম ক্রনিকাল* পত্রিকায় ১৯০৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি হিন্দুদের তৎপরতা এবং চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের নানা ধরনের হয়রানির কথা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'নবনূর' পত্রিকায় (১৩৩২, অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা ৩৭৩) হেদায়তউল্লা 'মুসলমানের সর্বনাশ' নামক প্রবন্ধে লেখেন, 'মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনাধীনে প্রতিবেশী হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমকক্ষ হইবার জন্য আপনার যোগ্যতা বিধানে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সরকারি কার্যলাভের পথে তাহার হিন্দু প্রতিযোগীগণ কর্তৃক এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে যে মুসলমানগণের রাজকার্যে প্রবেশের আশা এখনও সুদূরপরাহত।' এরপর ছিল হিন্দু জমিদারদের মুসলমান প্রজাদের উপর অন্যায় জুলুম। হিন্দু জমিদার মহাজনেরা নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করিবার তাগিদে প্রজাদের উপর অত্যাচারকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে দ্বিধা করতেন না (এ বিষয়ে উৎসাহী পাঠক মুজফ্ফর আহ্মদের 'প্রবন্ধ সংকলন' দেখুন, ১৯৭০, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৯)। বিশ শতকের সূচনাপর্বে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৬ আগস্ট, ১৯০৭) একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, চব্বিশ পরগনার জমিদার গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁর পুত্রের বিয়ের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ছ-আনা খাজনা আদায়ের সিদ্ধান্ত নেন। প্রজারা জমিদারের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় কিন্তু খাজনা আদায়ের সময় দেখা যায় যে, হিন্দু প্রজাদের প্রতি আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে নির্মম না হওয়ার জন্য জমিদার নির্দেশ দেন। 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান নিজে এই ঘটনাটি সম্পর্কে সেই সময়ে কয়েকজন হিন্দু নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, বালাবাহুল্য হিন্দু নেতারা হিন্দু জমিদারের স্বার্থহানি ঘটে এমন কোনো কাজই করেননি। সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় হিন্দু জমিদারদের মুসলমান প্রজাদের উপর এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক আচার-আচরণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। হিন্দু জমিদারেরা শ্রেণিস্বার্থের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণাকেও যে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন তা বোঝা যায় ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথমযুগের ব্যক্তিত্ব জ্ঞান চক্রবর্তীর

স্মৃতিচারণে। তিনি তাঁর, 'ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীতযুগ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এইখানে (রায়পুর) হিন্দুদের বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী এবং সুদখোর মহাজন ছিল। তাহারা অতীতে নানা কৌশলে ব্যাপকসংখ্যক মুসলমান কৃষকের জমি হস্তগত করিয়া নিঃস্বতে পরিণত করিয়াছিল। ইহার ফলে ওই অঞ্চলে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে তীব্র মহাজন-বিরোধী মনোভাব ছিল' (ঐ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩৫)।

গোটা উনিশ শতক জুড়ে ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বাতাবরণ বিঘ্নিত হয়ে যে দূরত্বের প্রাচীর তৈরি হচ্ছিল বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে, হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করেন, ভাইয়ের মর্যাদা দেন না। অপরপক্ষে হিন্দুদের অভিযোগ ছিল, মুসলমানেরা তাদের আপনার লোক বলে মর্যাদা দেন না। কাফের বলে অবজ্ঞা করেন, মন্দির অপবিত্র করেন। এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে যখন এই ধরনের বিভেদের প্রাচীর উঠতে শুরু করেছিল তখনই কিন্তু উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী আর একদল মুক্তবুদ্ধির পান্থজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল, 'বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বর্তমান সময়ে একই বন্ধনে আবদ্ধ, একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে শাসিত পরিচালিত। ফলত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক্ষণে ভারতমাতার দুই সন্তানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ... কিন্তু পরিতাপের, শুধু পরিতাপের কেন, গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, কতিপয় উন্নতমনা উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ব্যতীত হিন্দু মাত্রই সাধারণত মুসলমান শ্রবণ করিবা মাত্র উৎকট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। ... সত্যিই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র? (*ইসলাম প্রচারক*, জানুয়ারি, ১৯০৫, পৃষ্ঠা ৩৯৫)। গভীর বেদনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধে লেখেন, "হিন্দু-মুসলমান পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করেন নাই। ... আমরা বিদ্যালয় আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তা মানি, তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। ... বঙ্গবিচ্ছেদের ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। বাংলার মুসলমানদের এই বেদনায় আমাদের শরীক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়কে কোনোদিন এক হইতে দেই নাই। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ

যখন মুসলমানদের আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ খননেরও চেষ্টা করি নাই... ।"

রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটির (রচনাকাল, ১১ই ভাদ্র, ১৩১১) বিরুদ্ধতা করে 'আকবর বন্দনা'-র মতো কবিতা এককালে লিখলেও ১৯৪৩ সালে 'ধারাবাহিক' নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪-৫) হুমায়ুন কবীর লিখছেন, "যাহাকে মানুষ বলে স্বীকার করা যায় না তাহার কাছে মানুষের ব্যবহার করা অন্যায়ই । কেহ তোমাকে দেখিয়া অশুচি হবার ভয়ে দূরে সরিয়া যাইবে, ... কুকুর-বিড়ালের চেয়েও অধিক ঘৃণার সহিত তোমাকে তুচ্ছ করিবে– এ অপমান যে মানুষকে কেমন করিয়া আঘাত করে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবেন না ।" নিজের জীবনের স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছিলেন, পাবনার কোনো একটি গ্রামে বিশেষ কাজ উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদের ভেতরে তাঁকে যেতে হয়েছিল । প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুসলমান পরিচয় জেনে কোনো হিন্দু পরিবার থেকে তাঁকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল দেওয়া হয়নি । হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য, "এতে মুসলমানদের মন হিন্দুদের প্রতি বিষে ভরে গেলে দোষ দেওয়া যায় না ।" তিনিই আবার অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সঙ্গে মুসলমানদের সমালোচনা করে লিখেছেন, "... মুসলমানও হিন্দুকে কাফের বলিয়া দূরে ঠেলিতে চাহে । মুখে সাম্য ও মৈত্রী গর্ব করিলেও হিন্দুকে সাধারণ নাগিরক অধিকার দিতে স্বীকৃত নহে । তাহার মন্দির যে অবজ্ঞা করে, তাহাদের দেবদেবীকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, সে মন্দিরকে শ্রদ্ধা করুক কি না করুক তাহাতে বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মন্দির ভঙ্গ করিবার তাহার কোনো অধিকার নাই ।"

বিংশ শতকের সূচনাপর্বে বঙ্গভঙ্গকে ঘিরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি সমাজের ভিতরে একটা রাজনৈতিক আলোড়ন শুরু হয় । সমসাময়িক নানা ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনে শামিল হওয়া নিয়ে মুসলমান সমাজের ভিতরে কিছুটা বিতর্ক ছিল । ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গের সমর্থক হলেও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই আতিকুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হয়ে উঠেছিলেন । এই দুই ভাইয়ের ভিতরে নবাবি সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তাতে ব্রিটিশ শাসকরা সলিমুল্লাহের পক্ষ অবলম্বন করে । ব্রিটিশের প্রতি কৃতজ্ঞতাই সলিমুল্লাহ্-কে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষাকারী বঙ্গভঙ্গের সমর্থক করে তোলে । অপরপক্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার প্রশ্নে ব্রিটিশের কাছে প্রত্যাখ্যাত আতিকুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে শামিল হন । অর্থাৎ, এই দুই ব্যক্তিত্বই কোনো আদর্শগত তাগিদ নয়, নিছক সম্পত্তি রক্ষার তাগিদ থেকে একজন বঙ্গভঙ্গের সমর্থক হন, অপরজন বিরোধী হন । সলিমুল্লাহ্ মুসলমান সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সংঘবদ্ধ করতে

পেরেছিলেন। লর্ড কার্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ঢাকায় অভিজাত মুসলমানদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় সলিমুল্লাহ্ ছাড়াও মহম্মদ ইউসুফ বাহাদুর, নওয়াব আলী চৌধুরী, মৌলবী মহম্মদ ইয়াহিয়া, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, মৌলবী মহম্মদ বখত, মৌলবী ফজলুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন (*মোসলেম ক্রনিক্যাল*, ১১ নভেম্বর, ১৯০৫)। তবে ব্যক্তিস্বার্থে সলিমুল্লাহের বৈমাত্রেয় ভাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধতা করলেও অভিজাত মুসলমানদের একটি বড় অংশও কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের ভেদনীতির এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধাচার করেছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই। উদাহরণ হিসেবে দেলদুয়ারের জমিদারদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেলদুওয়ারের জমিদার গজনভী ভ্রাতারা ছিলেন নারীজাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার জ্যেষ্ঠা ভগিনী করিমুন্নেসার পুত্র।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক একটা অদ্ভুত টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে চলে। অভিজাত মুসলমান সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গরিব মুসলমান প্রজারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিযোগ জানাতে থাকে যে, হিন্দু জমিদারেরা নিজের নিজের জমিদারিতে মুসলমান প্রজাদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য করছে। মুসলমান সমাজের অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোও এই সময়ে নিরপেক্ষতার পরিচয় রাখতে পারেনি। যেমন, *মোসলেম ক্রনিক্যাল* পত্রিকায় লেখা হয়, সরকার হিন্দুদের হাতেই যশোহরের প্রশাসন তুলে দিয়েছে। হিন্দু জমিদারেরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দেয়ার অপরাধে মুসলমান প্রজাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার চালাচ্ছে। নিরীহ মুসলমান প্রজাদের গরু জবাইয়ের মিথ্যে অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, আর উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তারা সবাই হিন্দু হবার দরুন অভিযোগ করেও কেন সুফল মিলছে না (ঐ, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮)।

অভিজাত মুসলমানদের যে অংশ বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিল তাদের পিছনে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল এমনটা মনে করা ভুল হবে। উদাহরণ হিসেবে বলতে হয়, নবাব সলিমউল্লাহ্ ১৯০৬ সালে কুমিল্লায় বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে একটি সভা করতে গেলে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েন। সেই সময়ের কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল (*ইসলাম প্রচারক*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪) এই ঘটনাকে হিন্দুদের কারসাজি বলে দেখানোর চেষ্টা করলেও ওই প্রতিরোধের ঘটনাবলিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষ নবাবের ব্রিটিশের সঙ্গে গোপন চক্রান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিংশ শতকের সূচনাপর্বে ঢাকার নবাবকে কুমিল্লায় সভা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষদের দ্বারা ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভের ঘটনাই প্রমাণ করে এইসব জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বরা শ্রেণিরক্ষার তাগিদে কিভাবে ব্রিটিশের চাটুকারিতা করে গেছে।

অভিজাত সমাজের একটি অংশের এই বিরুদ্ধাচারণের পাশাপাশি বাঙালি মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ ঔপনিবেশিক শাসকদের এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শুধু শামিলই হননি ঔপনিবেশিকতার অবসানে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। এইসব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মুজিবর রহমান, আক্রাম খাঁ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুস সোবহান চৌধুরী, আব্দুর রসুল, আবুল কাশেম, মৌলবী লিয়াকত হুসেন (পাটনা), আলীমুজ্জামান চৌধুরী, কাজেম আলী মাস্টার, আব্দুল গফুর, দিদার বক্স, হেদায়েত বক্স, খান বাহাদুর মহম্মদ ইউসুফ (সভাপতি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন), ব্যারিস্টার আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭) প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার রসুলই প্রথম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন (*The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908* by Dr. Sumit Sarkar, 1968, Page 426)। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরায় একটি সম্মেলন উপলক্ষে ব্যারিস্টার রসুল বলেন।

"Now I must say a few words on the partition of Bengal. Mr. Morley has told us that the partition is a 'settled fact'. We the people of United Bengal have made answer to Mr. Morley that we have not accepted and shall never accept the practice as a 'settled fact'. We have shown him by the thousands of meeting all over Bengal that we have taken solemn vow to unsettle and undo it……" ('দি মুসলমান', ১ মার্চ, ১৯০৭)।

বেগম রোকেয়ার আত্মীয় আবদুল হালিম গজনভী ১৯০৮ সালে কোলকাতার গ্রিনপার্কে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি বলেন, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন মুসলমান সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে ইতিবাচক দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। 'দি মুসলমান' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, বাংলার সাতটি জেলায় হিন্দু তাঁতির সংখ্যা ৩৪৭৪৭ জন আর মুসলমান জোলার সংখ্যা ১২৭৬৭৫ জন। তাই বিদেশি কাপড় বর্জন করা হলে তাতে মুসলমানদেরই লাভ বেশি। ('দি মুসলমান' ১৯ জুন, ১৯০৮)। সমসাময়িক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুরা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, নোয়াখালি, জলপাইগুড়ি, রাজশাহী, মালদাতে তাঁতি রয়েছে ৫৯৫৬৭ জন, জোলা রয়েছে ৩১২০৫৪ জন। বিহারের সাতটি জেলায় তাঁতি রয়েছে ১৯৩১৭৯ জন আর জোলা রয়েছে ৪৮০৮৪৫ জন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিদেশি কাপড় বর্জন করে সাধারণ মানুষ যদি দেশীয় কাপড় কিনতে শুরু করেন তাতে একজন জোলার যদি পাঁচ টাকা করেও আয় বাড়ে

তাহলে কেবল মাত্র বিহারে মুসলমান জোলাদের আয় বৃদ্ধি হবে ২৪ লক্ষ টাকা। মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেই তখন প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, এই ২৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় করতে মুসলমানদের ভিতরে যে পরিমাণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিস ইত্যাদি পাওয়া দরকার তা আদৌ কি পাওয়া সম্ভব? ('দি মুসলমান' ২৬ এপ্রিল, ১৯০৭)।

১৯০৬ সালে তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড মর্লি ইংল্যান্ডের আইনসভায় ভারতবর্ষের জন্য কিছু কিছু আইন সংস্কারের কথা বলেন। সেখানে বিভিন্ন স্তরে মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের কথা বলা হয়। এই ঘটনা সর্বভারতীয় স্তরে মুসলমানদের রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। ভারতীয় মুসলমানদের ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ডব্লিউ এ আর্চবল্ড-এর মধ্যস্থতায় তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সিমলায় দেখা করেন ১৯০৬ সালের ১ আগস্ট। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় ১৯০৯ সালে যখন মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হয় তখন মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা এবং সম্প্রদায় হিসেবে তাদের বিশেষ গুরুত্বের দাবিকে মেনে নেয়া হয়েছে। সিমলা ডেপুটেশনের সদস্যদের ভিতরে (পূর্ববাংলা থেকে একমাত্র নবাব আলী চৌধুরী এই প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে উত্তর ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিরোধ হেতু সলিমুল্লাহ্ কিন্তু ওই প্রতিনিধিদলে থাকতে পারেননি। সূত্র : *Muslim Community in Bengal 1884-1912* by Sufia Ahmed, Dhaka, 1974, Page 217-218)। মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির পরিকল্পনার খসড়া সলিমুল্লাহ্ বিতরণ করেছিলেন। ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে জাতীয় স্তরের মুসলিম নেতৃত্বের একটি বড় অংশ 'অল ইন্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এ যোগ দেওয়ার জন্যে ঢাকায় আসেন। ওই সম্মেলনে সলিমুল্লাহের পরিকল্পনাটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। বিশদ আলাপ আলোচনার পর ৩১ ডিসেম্বর 'অল ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগ' গঠন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সম্পর্কে 'দি মুসলমান' (৪ জানুয়ারি, ১৯০৭) পত্রিকায় লেখা হচ্ছে, "To day after the conclusion of the Educational Conference, a special meeting was called to discuss the formation of a political association for Mohamedans. The meeting began about two hours after the advertised time, but was most enthusiastic. The speeches were clear and forcible, the packed audience listening with the greatest attention. The debate was keen… The Nawab of Dacca then requested Vicar-ul-Mulk to take the chair. The President… in an introductory speech said… The time and circumstances made it necessary for Mohamedans to unit into association so as to make the voice heard above the din of other vociferous parties in India and

across the wide seas in England…" সংগঠনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওই পত্রিকাতেই লেখা হয়, "(a) To Promote among the Mussalmans of India feeling of loyalty to the British Government and to remove any misconception that may arise as to the intention of the government with regard to any of its measure; (b) to protect and advance the political right and interest of Mussalmans of india and respectfully to present their needs and aspirations to the government; (c) to prevent the rise among the Mussalmans of India of any feeling of hostility towards other comunities without prejudice to the other objects of the League."

অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা মর্লে-মিন্টো সংস্কারে মুসলমান সমাজের জন্য পৃথক নির্বাচনের কথা বলা হলেও তার পিছনে ব্রিটিশের যে কী অভিসন্ধি ছিল তা হয় সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি, নতুবা শ্রেণিস্বার্থের তাগিদে ব্রিটিশের ফাঁদে তারা পা দিয়েছিল। কারণ, হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকল্প শক্তি হিসেবে মুসলমানদের দাঁড় করিয়ে নিজেদের শাসন ও শোষণকে আরো পরাক্রমশালী করে তোলাই ছিল ব্রিটিশের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই মুসলমান সমাজের প্রতি লোক দেখানোর ছলে বন্ধুত্বের হাত ব্রিটিশ বাড়িয়ে দিয়েছিল। দুঃখের বিষয় মুসলমান সমাজের অভিজাত অংশ ব্রিটিশের এই ছলনা সেভাবে ধরতে পারেনি। ব্রিটিশের মুসলিম-প্রীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কোনো অবস্থাতেই আন্তরিকতা-পূর্ণ ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক– একথা হুমায়ুন কবীর বার বার উল্লেখ করেছিলেন (কবীরের পূর্ব উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৬)।

ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হলেও বাংলায় প্রথম অবস্থায় তারা তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা স্বনামে পরিচিতও হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথমদিকে তারা 'আঞ্জুমন-ই-ওয়ায়েজিন' এবং 'আঞ্জুমনে ওলেমায়ে বাঙ্গালা'-র ভেতরে থেকেই কাজকর্ম করছিল। এ কে ফজলুল হক, আবদুর রসুল, আক্রাম খাঁ প্রমুখ নেতারা প্রথমদিকে দু'টি সংগঠনের সাথেই যুক্ত ছিলেন। এমনকি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত মুসলিম নেতারা মুসলিম লীগের পাল্টা একটি রাজনৈতিক সংগঠন 'ইন্ডিয়ান মুসলমান অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করেন ১৯০৭ সালে। ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল থেকে শুরু করে খোদ মহম্মদ আলি জিন্না এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাতেও 'বেঙ্গল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল। কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক মুসলমানেরা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতার জেরে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশই সকৌশলে এই ঘটনাকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমান সমাজের অংশটিকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেন। সলিমুল্লাহের উদ্যোগে ১৯১১ সালের ৩০ ডিসেম্বর উভয় বাংলার মুসলিম প্রতিনিধিদের একটি সভা হয়। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা নতুন পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কোলকাতায় একটি সভা করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আবদুর রসুল, মুজিবর রহমান, শেখ আবদুর রহিম, আবুল কাশেম প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বেরা। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ২৫টি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা আমন্ত্রণ জানান নবাব সলিমুল্লাহ্ (ঢাকা), নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী (ময়মনসিংহ), নবাব আবদুল জব্বার (বর্ধমান), নবাব সিরাজুল ইসলাম (কোলকাতা), নবাব মির্জা সুজ্জাত আলী খান (কোলকাতা), নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী (বগুড়া), নবাব হোছাইন হাইদার চৌধুরী (ত্রিপুরা), মি. জি এইচ সি আরিফ, ড. এ এ সোহরাওয়ার্দী, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন (কোলকাতা), মৌলবী আলিমুজ্জামান চৌধুরী (ফরিদপুর), মৌলবী একিনউদ্দিন আহম্মদ (দিনাজপুর), মৌলবী তসলিম উদ্দিন আহমদ (রংপুর), মৌলবী হেমায়েত উদ্দিন আহমদ (বরিশাল), খানবাহাদুর মৌলবী বজলুর রহমান (নোয়াখালি), মি. আবদুল মজিদ (সিলেট), মৌলবী আমান আলী (চট্টগ্রাম), মৌলবী ওয়াসিম উদ্দিন আহমদ (পাবনা), মৌলবী আবদুল আজিজ খান (মালদহ), মৌলবী ইমানুদ্দিন (রাজশাহী), মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস (নদীয়া), মৌলবী আবদুর রহমান খান চৌধুরী (খুলনা), মৌলবী গোলাম কুদ্দুস (২৪ পরগনা), মৌলবী আবু বকর (হুগলি), খন্দকার তোফায়েল আহমদ (যশোহর), দেওয়ান ফজলি রাব্বি (মুর্শিদাবাদ), মৌলবী শাওগাদ আলী (হাওড়া), খানবাহাদুর শামসুদ্দোহা (বীরভূম), মৌলবী জাবেদর রহিম (বাঁকুড়া), মৌলবী আবদুল কাদির (মেদিনীপুর), প্রিন্স কমর কাদের (অযোধ্যা পরিবার), মি. এ রসুল, নবাব সুলতান আলম (মহিশূর পরিবার) ['দি মুসলমান', ১২ জানুয়ারি, ১৯১২]।

এই সময়কালের ঘটনাক্রম বুঝতে 'দি মুসলমান' পত্রিকা থেকে (১৯ জানুয়ারি, ১৯১২) উদ্ধৃত করা হল, "Those of co-religionists who were under the impression that the government were on their side and they could depend upon government patronage … we think now disillussioned and have realised that the 'favourite wife' may be, and as a matter of fact, has been, divorced without even a moment's previous notice… We however from the very beginning said that the motive that led to the partition was entirely defferent and that the concession the Muslims were said to be enjoying were not for any special love for them but for dissuading them from anything embarassing to the government… What the position of the Indian Muslims is has now been quite clear to everybody. Self help should henceforth be their motto. … Unity between different section of the indian community should also be our watchword."

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমানকে খিলাফত আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলনের ধারাপথ বেয়ে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে একাত্ম করে দেয়। নানা প্রতিবন্ধকতা দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করলেও তার অন্তঃসারশূন্যতাকে উপলব্ধি করতেও বাঙালির সময় লাগেনি। দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবাষ্প একদিকে যখন বাংলার আকাশকে কলঙ্কিত করে রেখেছিল তখনই জাতি ধর্ম বর্ণ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বাঙালি কমিউনিস্ট ভাবধারার দিকে ঝোঁকে। বিংশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার এই বিবর্তন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

উৎস: পত্রিকা: "দেশহিতৈষী" শারদ সংখ্যা ১৪১৭/২০১০।

[লেখক: গবেষক।]

বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উৎস ও ক্রমবিকাশ (উত্তরপর্বের খণ্ডচিত্র)

গৌতম রায়

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষভাগ থেকেই ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে একটা বড়রকমের পরিবর্তনের আভাস ক্রমে ফুটে উঠতে শুরু করল। বঙ্গভঙ্গের সময়কালে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের ভিতরে যে ব্রিটিশ-আনুগত্য প্রবল ছিল, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং তার পরিণতিতে বঙ্গভঙ্গ-রদ– এই ঘটনাক্রম মুসলিম লীগ নেতৃত্বের একটা বড় অংশের ভিতরে ব্রিটিশ-আনুগত্যের ভিতটাকে ক্রমে আলগা করে দিতে শুরু করে দিল। মুসলিম লীগের জন্মকালে ব্রিটিশদের প্রতি যে আনুগত্যের ধ্যান-ধারণা নেতৃত্বের ভিতর প্রবল হয়েছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মুসলিম জনমানসের আলোকপ্রাপ্ত পান্থজনের অভিমতের গতিমুখ অনুধাবন করে লীগ নেতৃত্ব বিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষভাগ থেকেই নিজেদের চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে শুরু করে। এই নীতিগত পরিবর্তনের বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্ধেই খুব স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে শুরু করে। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের ভিতরে ব্রিটিশ-আনুগত্যবাদীদের প্রভাব ক্রমশ খর্ব হতে থাকে, নতুন নেতৃত্বে উঠে আসে একটা ভিন্ন যুক্তিগ্রাহ্য নেতৃত্ব। ক্রমে এই নেতৃত্বের ভিতরে ব্রিটিশ-তোষণের পরিবর্তে ব্রিটিশ-বিরোধিতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুসলিম লীগের নেতৃত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের পিছনে সমসাময়িক কালের আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বলকান যুদ্ধ (১৯১২) আন্তর্জাতিক স্তরে সে সময়ে মুসলিম জনমানসকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। এরপর ব্রিটিশের তুরস্কনীতি আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলমান সমাজকে ব্রিটিশবিরোধী করে তুলেছিল। এই দু'টি ঘটনার প্রভাব ভারতের মুসলমান সমাজের উপরেও গভীরভাবে পড়েছিল। সংশ্লিষ্ট ঘটনাক্রম জাতীয় স্তরে যেমন মুসলমান সমাজকে ব্রিটিশবিরোধী করে তুলেছিল, তেমনই বাঙালি মুসলমান সমাজও হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চরম ক্ষুব্ধ। এই ব্রিটিশবিরোধী

মানসিকতা মুসলিম মানসকে কিন্তু মুসলিম চেতনার দিকেও অনেকখানি ধাবিত করেছিল (এ বিষয়ে উৎসাহী পাঠক দেখুন; (*The Khilafat Movement* by Manault Rail, Delhi, 1982, page-10-11)।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ক্ষেত্রে যেভাবে দেশের প্রায় প্রত্যেক প্রান্তে বিস্তারলাভ করেছিল, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন কিন্তু সেভাবে তৎকালীন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যাপ্ত করতে পারেনি। বাংলার ভিতরে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সাথে স্বদেশ-চেতনা, জাতীয়তাবোধ উন্মেষ লাভ করলেও বাংলার বাইরের মানুষ কিন্তু এই আন্দোলনের জাতীয় রূপ না দেখে কিছুটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর থেকেই মূল্যায়ন করেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষপর্বে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) তার জাতীয় চরিত্রের পরিচয় প্রথম থেকেই স্পষ্টভাবে রেখেছিল। বস্তুত, প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এই খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনই ছিল ঔপরিবেশিক ভারতের সবথেকে বড় রাজনৈতিক ঘটনাক্রম। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম মিলিত ঔপনিবেশিকতা-বিরোধিতা যে ব্রিটিশের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল তেমনই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বাংলায় একটা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করতে আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। কিন্তু প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপন করেছিল, তার জের গোটা ভারতের রাজনৈতিক পরিম-লকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্পর্কে মুসলিম লীগের প্রথম যুগের নেতাদের ভাবনায় কী কারণে ভিন্ন অভিমুখ রচিত হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে। সে বছর নভেম্বর মাসে জার্মান শিবিরে যোগ দেয় তুরস্ক, ফলে তারা ব্রিটিশের রোষানলে পড়ে। ভারতের মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে যেমন ব্রিটিশ শাসনকর্তা রয়েছেন, তেমনই আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস ছিল তুরস্ক। এই দুইয়ের ভিতর এক মারাত্মক বিবাদ দেখা দেয়। এই অবস্থায় পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে না থাকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয়দের সহযোগিতা কামনা করে। মওলানা মহম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুবকর সিদ্দিক, মওলানা আবদুল বারী প্রমুখ দেশবাসীর কাছে ব্রিটিশদের সাহায্য করবার আবেদন জানালেও ব্রিটিশদের তাঁরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যেন মুসলমানদের মনে ব্যথা লাগতে পারে এমন কোনো আচরণ যেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতি না করা হয়। জাতীয় কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধীও সে সময়ে ব্রিটিশকে সহায়তার পক্ষে ছিলেন। নিজেদের কাজ হাসিল করবার জন্যে যুদ্ধের শেষে ভারতীয়দের প্রতি বিশেষ নজর দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন ভারতসচিব ১৯১৭ সালের ১৮ আগস্ট। বলা বাহুল্য, যুদ্ধশেষে এই

প্রতিশ্রুতি পালনে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হয়নি ব্রিটিশ, ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে একটা মাত্রা পেতে শুরু করে। উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত সমাজের ব্রিটিশ সম্পর্কে ক্রমে মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। লীগের জন্মলগ্নে যেভাবে নেতৃত্বের সিংহভাগ দখল করে রেখেছিলেন জমিদার সম্প্রদায়ের মানুষরা, ততোদিনে কিন্তু সে অবস্থারও কিছুটা বদল ঘটেছে। উচ্চবিত্তের জমিদার সম্প্রদায়ের পাশাপাশি শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশ, যারা আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান চেতনার ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত, তাঁরা ততোদিনে লীগ নেতৃত্বে চলে এসেছেন। এই নতুন নেতৃত্বের মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আকর্ষণের বদলে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রবল ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (কার্যকাল ১৯১০-১৯১৫) ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের শাস্ত্রবিহিত খিলাফত সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। মুসলমানদের ধর্মীয় স্থানের কোনো ক্ষতি হবে না, এই অভিযান কেবলমাত্র ব্রিটিশ-ভারতকে রক্ষা করার জন্যেই করা হচ্ছে বলে তিনি অস্বীকার করেন। (*Evolution of Muslim Political Thought in India*- by A.M.Zaidi; Vol-II, page-197) মজার কথা হল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিনি, ইতালি বা ফরাসি দেশ, যারা ব্রিটিশ পক্ষে ছিল, তাঁরা কিন্তু দেননি এই প্রতিশ্রুতি। কেবলমাত্র ব্রিটিশ ভাইসরয় দিয়েছিলেন আর ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভাও যে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে। (ঐ- পৃ.-৯৫১)

এই আশায় মনে বুক বেঁধে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ভারতীয় মুসলমানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সিরিয়া এবং তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার (অধুনা ইরাক) যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। ব্রিটিশের স্বার্থেই ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয়রা দার্দানেলিম প্রণালীতে তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। কাজী নজরুলও এই সময়ে (১৯১৭) বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। সামরিক প্রশিক্ষণের শেষে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন করাচিতে। হাবিলদার পদে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন। তবে যুদ্ধের পরে তিনি আর সেনাবাহিনীতে থাকেননি, কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান হবিবুল্লাহ (১৮৯৫-১৯৫৮) মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের তথা মিত্রশক্তি হিসেবে তখন যাদের উল্লেখ করা হত, তাদের জয়ের পিছনে ভারতীয় মুসলমান সৈনিকদের বিশেষ অবদান ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে। যুদ্ধের ফলাফলে দেখা যায়; মিত্রশক্তির কাছে তুরস্ক পরাজিত। তুরস্কের স্বাধীনতা এবং শক্তি ব্যতীত খিলাফত টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না– যুদ্ধের ফল বিশ্লেষণ করে অচিরেই ভারতীয় মুসলমানদের ভিতরে এ সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মাল, খিলাফত রক্ষার ভাবনা নিয়ে তাই ভারতের মুসলিম নেতৃত্ব ব্রিটিশ ভারতে একটি খিলাফত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। আন্দোলনের ভিতর দিয়ে ব্রিটিশের কাছে অবিভক্ত ভারতের ছয় কোটি মুসলমানের মনের উদ্বেগকে তুলে ধরাই ছিল প্রাথমিকভাবে খিলাফত কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য। পরবর্তী সময়ে অবশ্য মহাত্মা গান্ধি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনে যেমন একটি নয়া অধ্যায়ের সূচনা করে, তেমনই ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ও বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এই সময়কালেই (১৯১৯ সালের মার্চ মাসে) রাউলাট বিল উত্থাপিত হয় এবং ১৯ মার্চ তা আইনে পরিণত হয়। কালা-কানুনটির বিরুদ্ধে দেশের মানুষ প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। আন্দোলন করবার অপরাধে ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল পাঞ্জাবের ড. সায়ফুদ্দিন কিচলু ও ড. সত্য পাল গ্রেপ্তার হন। তাঁদের দ্বীপান্তরিত করা হয়। ১৫ এপ্রিল লাহোর ও অমৃতসরে সামরিক আইন জারি করা হয়। তার আগে ১৩ এপ্রিল ঘটে যায় কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকা-। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় এই হত্যাকা- সম্পর্কে লেখা হয়:

"জালিয়ানওয়ালাবাগটিকে ঠিক একটা ইঁদুরের কল বললেই হয়। চারদিক উচ্চ প্রাচীরঘেরা। কতক পতিত জমি ব্যতীত এটা আর কিছুই নয়। প্রবেশপথ মাত্র একটি। এই পথটা এত সঙ্কীর্ণ যে, তিনজন লোক পাশাপাশি হয়ে এই পথে চলতে পারে না। জালিয়ানওয়ালাবাগে যে তখন কত লোক ছিল, তা ঠিক করে বলা কঠিন। কারণ, সেদিন নানা স্থান হতে অশিক্ষিত শিখরা বৈশাখী পর্ব উপলক্ষে এসেছিল। জেনারেল ডায়ার ৫০০ লোক নিহত এবং ১৫০০ লোক আহত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। দুইদিন পরে হঠাৎ কর্তৃপক্ষ গাড়ি করে মৃতদেহগুলো নিয়ে যায়"। (*ঢাকা প্রকাশ*, ১০ই ফাল্গুন, ১৩২৬, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০)। এই বর্বরোচিত হত্যাকা- বাংলার জনমানসকেও কতখানি বিচলিত করেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদই তার প্রমাণ।

খিলাফত আন্দোলনকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বস্তুত, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য

বিষয়। বাংলায় খিলাফত আন্দোলন ভূমিস্তরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী মানসিকতা তৈরিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনেও এই আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে এই সময়কালের কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টি প্রায় অনালোচিতই থেকে গেছে।

১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর ঢাকা শহরে প্রথম খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এইদিনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঢাকার সমগ্র নাগরিক শোকচিহ্ন ধারণ করেন। শহরের বেশিরভাগ দোকান বন্ধ থাকে। হিন্দু দোকানদাররাও মুসলিম ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে দোকান বন্ধ রাখেন। মুসলমানরা সেদিন রোজা পালন করেন, অনেক হিন্দুও মুসলমান ভাইদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনশন ব্রত পালন করেন। হিন্দুদের এই সহানুভূতিশীল আচরণের জন্য মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। (এ সম্পর্কে ঢাকার 'ইসলামিয়া আঞ্জুমান'-এর সম্পাদক খাজা আবদুল করিমের স্বাক্ষরিত একটি বিবরণ প্রকাশ পায় 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায়, ১৬ই কার্তিক, ১৩২৬, ২ নভেম্বর ১৯১৯)।

১৭ অক্টোবর (১৯১৯) বিকাল ৪টায় ঢাকার পল্টন ময়দানে তুরস্কের খলিফার রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখার দাবিতে একটি সমাবেশ হয়। শহর ও শহরতলির প্রায় ২০ হাজার হিন্দু-মুসলিম নাগরিক ওই সমাবেশে যোগ দেন। বহু বোরখা পরিহিত মুসলিম রমণীও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা লক্ষ্মীবাজার মিঞা সাহেবের ময়দানের দরগার শাহ আবদুল্লাহ ইমাত্তীতের নেতৃত্বে প্রার্থনার ভিতর দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। বহু হিন্দু নেতাও ওই সভায় বক্তৃতা করেন বলে সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে জানা গেছে (*ঢাকা প্রকাশ*– ঐ)।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান খাজা আবদুল করিম। মাস্টার হেদায়েত বখ্‌শ এবং রাজকুমার চক্রবর্তী ছিলেন উল্লেখযোগ্য বক্তা। *ঢাকা প্রকাশে*র বিবরণে বলা হচ্ছে; রাজকুমার চক্রবর্তীর বক্তৃতা শুনে শ্রোতাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স' (লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত) গৃহীত চারটি প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় (*ঢাকা প্রকাশ*, [ঐ])। এই সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভিতরে ছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, বরিশালের মহম্মদ ইসমাইল খাঁ চৌধুরী, ঢাকার খান বাহাদুর মৌলবী যহীরউদ্দিন আহমদ, মির্যা মুহম্মদ জাফর সিরাজী, খাজা করীমুল্লাহ (ঢাকার নবাবজাদা), খাজা মহম্মদ মুসা,

হাফেজ আবদুর রাজ্জাক, নয়াবাড়ির জমিদার মৌলবী আবদুল হামিদ, বরিশালের জমিদার আবি আশান, ঢাকা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়। উনি 'ঢাকা পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশনে'রও সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী হরমোহন শীল এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এরপর ১২ ডিসেম্বর ঢাকার করোনেশন পার্কে মৌলবী আমিরুদ্দিনের সভাপতিত্বে আরও একটা বড় সভা হয়। সেখানে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ঢাকাস্থ হিন্দু-মুসলমান বড়লাটের কাছে এই মর্মে আবেদন জানাচ্ছে যে, আসন্ন 'শান্তি উৎসব'-এর তারিখ পিছিয়ে দেয়া হোক [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর মিত্রশক্তি ১৯১৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'শান্তি দিবস' অর্থাৎ বিজয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল]। কারণ হিসেবে ওই প্রস্তাবে বলা হয়, খিলাফত সমস্যার সঠিক সমাধান, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকা-ের বিচার না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষ শান্তি উৎসবে যোগ দিতে পারে না। পাঞ্জাব হত্যাকা- যেসব রাজবন্দি রয়েছে এবং যাদের অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে, তাদের মুক্তি ব্যতীত সাধারণ মানুষ বিজয় উৎসবে যোগ দিতে পারে না। (*ঢাকা প্রকাশ*, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৬/১৪ ডিসেম্বর ১৯১৯)। এই ঘটনাক্রমগুলো বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক মানসকে ধীরে ধীরে একটা সুনির্দিষ্ট অভিমুখে নিয়ে যেতে শুরু করে।

ঢাকার করোনেশন পার্কে ১৯ ডিসেম্বর খাজা আবদুল করিমের সভাপতিত্বে একই দাবিতে আরও একটি বিশাল জনসভা হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঢাকা শহরের হাজার হাজার মানুষ এই সমাবেশে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়। এই সভাতেই ঢাকায় একটি স্থায়ী খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। (অস্থায়ীভাবে এর আগেই অবশ্য ঢাকায় একটি খিলাফত কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। খাজা আবদুল করিমই ছিলেন সেই অস্থায়ী কমিটির সভাপতি। তবে অস্থায়ী কমিটি গঠনের সময়কাল সঠিকভাবে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমান আলোচকের জানা সম্ভবপর হয়নি)। এই সভায় ঠিক হয় যে, অমৃতসরে ১৯১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির যে অধিবেশন হবে, সেখানে ঢাকা থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। এই প্রতিনিধি প্রেরণের জন্যে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্তও সংশ্লিষ্ট জনসভাতে নেওয়া হয়। ওই বছর ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (সে সময়ে দু'টি অধিবেশনই প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতো) অধিবেশনে খিলাফত বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। এছাড়াও মওলানা মহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীসহ সমস্ত রাজবন্দিদের ও অন্তরীণদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় (*ঢাকা প্রকাশ*– ৫ই পৌষ, ১৩২৬/২১ ডিসেম্বর ১৯১৯)।

ঢাকা খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকার নবাব বাহাদুর হাবিবুল্লাহ'র আহসান মঞ্জিলে। এই সভাতে খিলাফত কমিটির জন্যে করণ নির্বাহক (office bearers) নির্বাচন করা হয়। নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ হন সভাপতি, সৈয়দ আবদুল হাকিম হন প্রতিনিধি, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস হন সম্পাদক, মৌলবী আমীরুদ্দিন আহমদ হন সহকারী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন মৌলবী আলা বখ্‌শ। এরপর অমৃতসরে অনুষ্ঠিত ও খিলাফত সম্মেলনের জন্যে প্রতিনিধিদল নির্বাচন করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মৌলবী আমিরুদ্দিন আহমদ, ড. রাজকুমার চক্রবর্তী, মৌলবী গোলাম কুদ্দুস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঢাকার জিন্দাবাহারের জমিদার চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস চিরজীবন বিভিন্ন জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। ১৯২১ সালে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। ঢাকার খিলাফত কমিটির তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ১১ ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর সহোদর সৈয়দ চৌধুরী গোলাম জিলানী আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান (*ঢাকা প্রকাশ*– ৩রা পৌষ, ১৩৩৯, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩২)। ঢাকা পৌরসভার কমিশনার মোহাম্মদ আমিরুদ্দিন আহমদ খিলাফত আন্দোলন শুরু হওয়ার বেশ কিছু আগে থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন মুসলিম লীগের সাথে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হয়েছিল ১৯০৯ সালে। নবাব সলিমুল্লাহ হয়েছিলেন সেই পুনর্গঠিত প্রাদেশিক লীগের সভাপতি আর ঢাকা পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনার রাহিউদ্দিন আহমদ হয়েছিলেন সম্পাদক। আসাম ও পূর্ববঙ্গের জন্যে সে সময়ে লীগের একটিই কমিটি ছিল। (Proceeding of the third Annual Session of the All India Muslim League held in Delhi in January, 1910, page-108). সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলন সামাজিক স্তরে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল তা বোঝার জন্য তৎকালীন 'আল এছলাম' পত্রিকা (চৈত্র, ১৩২৬) থেকে চারুচন্দ্র মিত্র'র লেখা একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করছি– "শাস্ত্রানুসারে খলিফার কতকগুলি অধিকার আছে, তাহার কোনো একটিকে বিচ্যুত করিলে তিনি আর খলিফা পদবাচ্য হইতে পারেন না। অনভিজ্ঞ ইংরেজ আন্দোলনকারীদের জানা উচিত যে, এছলাম ধর্মজগতের খলিফা ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায়ের পোপের অনুরূপ নহে। ... আমরা ভারতবাসী হিন্দু, ভারতীয় মোছলমানগণ আমাদের 'ছোটভাই', ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময় বিবাদ বিসংবাদ হইলেও আসন্ন বিপদকালে ভ্রাতায় ভ্রাতায় আশা,

ভরসা ও অবলম্বন স্থল হইয়া থাকেন। ... ভরসা করি আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতাগণ কখনই কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিবেন না"। বানান অপরিবর্তিত তেমনি অপরিবর্তিত মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 'আল এছলামে' লেখেন; "এই অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি– খিলাফৎ সমস্যার সমাধান, তুরস্ক সোলতানের হৃত রাজ্যসমূহের পুনরুদ্ধার, এছলাম জগতের খলিফার পদমর্যাদা রক্ষা করা। ২য়টি ভারতে স্বরাজলাভ"। (*আল এছলাম*, মাঘ, ১৩২৭, পৃ-৫১৩, প্রবন্ধটির নাম ছিল; অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য)। ওই প্রবন্ধেই তিনি লেখেন, "সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, খিলাফৎ এছলাম ধর্মের অঙ্গ বিশেষ। খিলাফৎ রক্ষা না হইলে, খলিফার সিংহাসন, তাহার রাজ্য রাজত্ব ও পদগৌরব রক্ষা না পাইলে এছলামের মহাক্ষতি এবং মোছলেম জাতির সর্বনাশ। মস্তকহীন দেশের যেমন কোনো মূল্য নাই, খলিফাবিহীন মোছলেম জাতিরও সেরূপ কোনো গুরুত্ব থাকিতে পারে না, খলিফা এছলাম ধর্ম ও মোছলমান জাতির মেরুদ- স্বরূপ" (ঐ, পৃ.-৫১৪)।

আবদুল্লাহ আল-আজাদ মন্তব্য করেন, "অসহযোগিতার সহিত মুসলমানদের সম্বন্ধ দ্বিবিধ, প্রথমত দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা তাহারও প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত খিলাফত যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হাতে অপমানিত লাঞ্ছিত, হৃতসর্বস্ব হইয়াছে তাহার নষ্ট গৌরবের প্রয়াসী হওয়াও তাহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য" (*মোসলেম ভারত*, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩২৭, পৌষ)।

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার এইসব উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে মুসলিম মানসে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা কিভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছিল। বিত্তবান সমাজের হাতেই তখন রাজনীতির রথের রশি বাঁধা ছিল না। এই যে পত্র-পত্রিকার লেখকদের উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে তাঁরা কিন্তু বেশিরভাগই উঠে এসেছিলেন সাধারণ পরিবার থেকে, মুসলিম মানসে তখন রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্রম-বিবর্তনে একটা বড় জায়গা করে নিয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি; "আল এছলাম" পত্রিকায় শেখ আবদুল গফুর জালালী নামক এক অজানা লেখক 'খিলাফত ও ভারতবর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখছেন। (ভাদ্র, ১৩২৭) "বাঙালির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়, বুদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ যাহা পারে নাই, নানক-কবির যাহাতে সমর্থ হয় নাই, আকবর আওরঙ্গজেব যে বিষয়ে বিফল মনোরথ' খিলাফত আজ সেই অসাধ্য সাধন করিল। হিন্দু-মুসলমানকে এক করিয়া কর্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। ... আজ হিন্দু বুঝিয়াছে মুসলমান তাহার ভাই, আজ মুসলমানও বুঝিয়াছে হিন্দু তাহার পর নয়.....। হিন্দু-মুসলমান ভারতের মেরুদ-। ... জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে, চাই হিন্দু-মুসলমান দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন অটুট সম্প্রীতি ও অভ্রান্ত ভ্রাতৃত্ব"।

মুসলিম মানসে এই সমকালে রাজনৈতিক চেতনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রশ্নে এতটাই উদাসীনতাময় হয়েছিল যে মুসলিম বুদ্ধিজীবীমহল খিলাফত আন্দোলনের মুহূর্তটি একটি 'শুভক্ষণ' হিসেবে বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। তাঁদের মতে, এক শুভক্ষণে ভারতমাতা গান্ধি, শওকত ও মহম্মদ আলীকে নেতা হিসেবে পেয়েছে। শিয়া, সুন্নি, হাজাদি, হাম্বেলি, শাফেয়ি, মজহাবী সব বিতর্ক ভুলে সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে আহ্বান সেদিন জানানো হয়েছিল তা বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্রমবিবর্তনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। (বর্তমানে আমাদের কর্তব্য– কাজী মোহাম্মদ বখ্‌শ, *আল এছলাম*, মাঘ, ১৩২৭)।

সমসাময়িক ঘটনাক্রমে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনার জগৎকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করছিল। ১৯২০ সালের সূচনাপর্বে ঢাকায় ১ মাস জেলে আটক থাকার পর খাজা আবদুল শাকুরসহ বেশকিছু খিলাফত কর্মী মুক্তি পান (২০ জানুয়ারি)। এঁদেরকে রমনা পোস্ট অফিসের সামনে পিকেটিং করার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিস গ্রেপ্তার করে। (এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য বর্তমান নিবন্ধকার পেয়েছেন ঢাকা খিলাফত কমিটির তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ খাজা আবদুল মওদুদের ডাইরি থেকে (২০/০১/১৯২০)। সংশ্লিষ্ট ডাইরিটি দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা আবদুল হালীম)।

১৯২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় ঢাকার বংশাল পাড়ায় খাজা আবদুল করিমের সভাপতিত্বে একটি খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিশ খাজা আবদুল করিমকে গ্রেপ্তার করে। (*ঢাকা প্রকাশ*, ৩রা ফাল্গুন, ১৩২৬, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০) কয়েকদিন হাজতবাসের পর ২৬ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। (পূর্বোক্ত ডাইরি)।

জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় দুটো খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাটি হয় চকবাজারে (সঠিক তারিখ জানা যায় না)। দ্বিতীয় সভাটি হয় হাতির ঘাটে ৩০ জানুয়ারি। দ্বিতীয় সভাটিতে ঢাকা খিলাফত কমিটির সহ-সভাপতি খাজা আবদুল হাফিজ উপস্থিত ছিলেন। (*ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ই মাঘ, ১৩২৬, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০)।

পরবর্তী সভাটি হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দয়াগঞ্জ পাড়ায়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা আজিজুল্লাহ। সভাটি দুদিন ধরে চলে। দ্বিতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন খাজা আবদুল করিম। ২০ ফেব্রুয়ারি গেন্ডারিয়াতে-ও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা খিলাফত কমিটির সম্পাদক চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. রাজকুমার চক্রবর্তী খাজা আবদুল

করিম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দুটি সভাতেই বক্তৃতা করেন। (*ঢাকা প্রকাশ*, ১০ই ফাল্গুন, ১৩২৬, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০)।

এই দুটি সভায় উপস্থিত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১১/৯/১৮৭৩) সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। ঢাকা জেলার চুরাইনের এই কৃতী সন্তান ঢাকার নারায়ণগঞ্জ স্কুল থেকে ১৮৯৩ সালে এন্ট্রাস পাস করে ১৮৯৫ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ এ পাস করেন। ১৮৯৭-এ ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ এবং ১৯০৪ সালে ওই কলেজ থেকে বি-এল পাস করেন। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি নারায়ণগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। গণিত ও ইতিহাসে তিনি পড়াতেন। এই সময়েই তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। কলেজজীবনেই অনুশীলন সমিতির ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে উনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা এবং গৌহাটি গুলিবর্ষণ মামলায় আসামিপক্ষের উকিল হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন। দেশবন্ধু কর্তৃক স্বরাজ দল তৈরি হওয়ার পর পূর্ববঙ্গে ওই দলের প্রসারে শ্রীশচন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯২৬ সালের একটি বক্তৃতার জন্যে তাঁর কারাদ- হয়। ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবি সম্পর্কিত প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালে ডুর্নো গুলিবর্ষণ মামলায় তিনি আবার কারান্তরালে চলে যান। ১৯৩৫ সালে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। '৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ভারতবিভাগের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানেই থেকে যান। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ সালে আন্তঃপরিস্থিতির চাপে তিনি ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন।

১৯২০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মীরপুরে খুবই সমারোহ সহকারে খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা খিলাফত কমিটির সভাপতি নবাব হাবিবুল্লাহ ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। গোলাম কুদ্দুস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, ড. রাজকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ ওই সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় শ্রোতাদের ভিতর একটা বড়সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি করোনেশন পার্কের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আবদুল হাফিজ। এই সময়েই ঠিক হয়েছিল যে, কারামুক্ত পাঞ্জাবের নেতারা ২ মার্চ ঢাকায় আসবেন। তাঁদের যাতে যথোচিত সম্মান জানানো হয় তার জন্যে করোনেশন পার্কের জনসভায় আবেদন রাখেন শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খাজা আবদুল করিম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, ড. রাজকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সভায় স্বেচ্ছাসেবকদের একটি নামের

তালিকাও তৈরি করা হয় যাঁরা পাঞ্জাব থেকে আগত নেতাদের আপ্যায়ন ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকবেন বলে বলা হয় (*ঢাকা প্রকাশ*– ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২০)। এর আগেই অবশ্য স্থানীয় খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, ২ মার্চ মঙ্গলবার মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. সাইফুদ্দিন কিচলু (পাঞ্জাবের এই নেতার সদ্য কারামুক্তি ঘটেছিল), মহাত্মা গান্ধি, বিপিন চন্দ্র পাল, ড. সত্যপাল, হরকিষাণ লাল, দুনিচাঁদ, রম্ভুজ দত্ত প্রমুখ ঢাকায় আসবেন (ঐ)।

মওলানা শওকত আলী প্রমুখ নেতারা ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন। ১৯২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধিসহ মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখকে কলকাতায় বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। ঢাকা খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের সবাইকেই ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু সব নেতাদের পক্ষে ঢাকা আসা সম্ভব না হলেও মওলানা শওকত আলী এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ ঢাকায় আসেন। এই দুই বিশিষ্ট নেতার ঢাকায় আগমন বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই নেতাদের ঢাকায় স্টিমারঘাট নারায়ণগঞ্জে গিয়ে স্বাগত জানান ঢাকার খিলাফত কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দ আব্দুল হাফিজ, ড. রাজকুমার চক্রবর্তীসহ প্রায় ৫০ জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক, সেখান থেকে নেতৃত্ব ঢাকা রেলস্টেশনে আসার পর সেখানেও তাঁদের হার্দিক সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং তাঁদের নিয়ে শোভাযাত্রা হয়। (*ঢাকা প্রকাশ,* ৭ মার্চ, ১৯২০)।

ওইদিন সন্ধ্যায় (৭ ঘটিকায়) মওলানা শওকত আলী ও মওলানা আজাদকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। শওকত আলী উর্দুতে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, খিলাফতের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ ধর্মসম্মত। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেন, তুরস্কের স্বাধীনতা যদি রক্ষিত না হয় তাহলে মুসলমানদের স্বাধীনতাও রক্ষা পাবে না। হিন্দু-মুসলমান এই ইস্যুতে যেভাবে একত্রিত হয়েছে তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। সভায় ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী বাবু গুণান চন্দ্র ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩ মার্চ নবাববাড়ির প্রাঙ্গণে মওলানা শওকত আলী ও মওলানা আজাদকে নিয়ে একটি বিরাট সভা হয়। মৌলবী আমীরুদ্দিনের প্রস্তাবানুযায়ী নবাব হাবিবুল্লাহ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, রাউলাট বিল-উদ্ভূত পাঞ্জাব হাঙ্গামার মোকদ্দমায় পাঞ্জাব নেতাদের ব্যাপারে প্রিভি-কাউন্সিল কর্তৃক প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তাঁরা পাঞ্জাবে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাই ঢাকাবাসীর আমন্ত্রণ তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি।

শওকত আলী ও মওলানা আজাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তাঁরা দেশ ও ধর্মের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের ত্যাগধর্মের মহান আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাঁদের প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

এরপর মওলানা আজাদ উর্দু ভাষায় খিলাফতের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলেন। শওকত আলী উর্দু ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, খাজা মহম্মদ মুসা, যোগেন্দ্রনাথ গুহ, সৈয়দ আবদুল হাফিজ, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. রাজকুমার চক্রবর্তী, খাজা আবদুল করিম, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলন পরিচালনার জন্যে একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবে ওই সভা থেকেই দুই হাজারেরও বেশি টাকা সংগৃহীত হয়। সৈয়দ আবদুল হাফিজ নগদ ৩০০ টাকা দেন। নবাব হাবিবুল্লাহ তিরিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। দশম শ্রেণির এক ছাত্র নিজের হাতের সোনার আংটি দান করে যেটি নবাব সাহেব স্বয়ং নিলাম করে ১৮০ টাকায় কিনে নেন (*ঢাকা প্রকাশ*– ২৮ মার্চ, ১৯২০)।

ঢাকার পাটুয়ালির রাস্তায় ১৯২০ সালের ১৫ মার্চ (সোমবার) একটি অভিনব মিছিল বের হয়; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় ১২ জন মানুষ শ্বেতশুভ্র পরিচ্ছেদে নিজেদের আপদমস্তক আবৃত করে জাতীয় পতাকা হাতে শোকসূচক সংগীত পরিবেশন পূর্বক খিলাফত তহবিলের জন্যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৬ এবং ১৭ মার্চও তাঁদের শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ওইভাবে ঘুরে ঘুরে অর্থসংগ্রহ করতে দেখা যায় (*ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মার্চ, ১৯২০)।

ঢাকার খিলাফত কমিটির অনুরোধে ১৮ মার্চ বিপিনচন্দ্র পাল ও মৌলবী ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঢাকায় আসেন। ওইদিনই বিকাল ৫টায় শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে করোনেশন পার্কে একটা সভা হয়। সভায় শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩ হাজারেরও বেশি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ ওই সভায় যোগ দিয়েছিলেন (ঐ)।

১৯ মার্চ ২য় খিলাফত দিবস হিসেবে হরতাল পালিত হয়। সেদিন ঢাকা শহরের ছোট-বড় সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ ছিল। সারাদিন পথে কোনো গাড়ি চলেনি। শহরবাসীরা বিশেষ ব্যক্তিগত কাজ ছাড়া খুব একটা রাস্তায় বের হননি। স্থানীয় ইডেন হাইস্কুল বন্ধ ছিল। রাজমিস্ত্রি থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক সবাই-ই সেদিন ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। ঢাকায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে কেউ সেদিন নতুন কোনো দলিল রেজিস্ট্রি করতে আসেননি। কেবলমাত্র পূর্বে দাখিল করা দুটি দলিল সেদিন রেজিস্ট্রি হয়েছিল। শুক্রবার মুসলমান সম্প্রদায় রোজা রেখেছিলেন

আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা সমব্যথী হয়ে উপবাস পালন করেছিলেন। শহরের বিভিন্ন মসজিদে সেদিন খিলাফতের জন্যে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজনে করা হয়েছিল (ঐ)।

এই সময়কালেই করোনেশন পার্কে খিলাফতের দাবিতে আরও একটি বড় জনসভা হয়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বলা হয়েছিল; ওই জনসমাবেশে হিন্দু-মুসলমানের যে সম্মিলিত জনস্রোত দেখা দিয়েছিল তা নাকি বিগত ৪০ বছরের ভিতর দেখা যায়নি। জনস্রোতে গোটা করোনেশন পার্কে তিলধারণের জায়গা ছিল না। আশপাশের বাড়িগুলোর ছাদ ছিল লোকে ভর্তি। এমনকি গাছগুলোও ছিল লোকে ভর্তি। সংবাদপত্রের অনুমান ২৫ হাজারেরও বেশি জনসমাগম ঘটেছিল। শ্রোতারা মাঝে মাঝেই সম্মিলিতভাবে 'বন্দেমাতরম' ও 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি দিচ্ছিল। সৈয়দ আবদুল হাফিজ ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় ব্যবহারজীবী কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুনশী আবদুল কাদের সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সভাপতির আদেশে খাজা আবদুল করিম এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন : "That the people of Dacca in a Public Meeting respectfully pray his Excellency to convey to his Majesty, the King Emperor that if peace terms with his majesty the Khalifatul Muslimeen, the Sultan of Turkey be contrary to the dictates of shariat and commendants of Islam, it will put the severest possible strain on the loyalty of the Musanmans of India".

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে বিপিনচন্দ্র পাল দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাকালে ইফতার ও নামাজের জন্যে তিনি প্রায় ২০ মিনিট বক্তৃতা বন্ধ রাখেন (ঐ)।

১৯ মার্চ ঢাকার ঘোড়াশালেও ২য় খিলাফত দিবস পালন করা হয়। সেদিনের জনসভায় তিন হাজারেরও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন বলে স্থানীয় সংবাদপত্রের বিবরণে জানা যাচ্ছে (*ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ই চৈত্র, ২৮ মার্চ ১৯২০)। সংশ্লিষ্ট সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মুনশী আবু নাসের শাহিদুল্লাহ। ওই সভায় খিলাফতের সম্মানরক্ষার জন্যে ভাইসরয়ের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা উপলক্ষে স্থানীয় দোকানপাটও বন্ধ থাকে।

বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে রাউলাট-বিরোধী আন্দোলন (রাউলাট বিল পাস হয় ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) এবং ৬ এপ্রিল মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে শুরু হওয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। জাতীয় আন্দোলনে মুসলমান সমাজের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সম্পর্কে হিন্দু ঐতিহাসিকরা বরাবরই বিশেষ রকমের নীরবতা পালন করে গেছেন। কিন্তু খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যেভাবে

একত্রিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তার অনুপুঙ্খ আলোচনা ব্যতীত আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। সেই সম্পূর্ণতার লক্ষ্যেই বর্তমান নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট সময়কালের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করা হল।

মহাত্মা গান্ধি যেদিন (৬ এপ্রিল, ১৯২৯) রাউলাট আইন-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেদিনের বর্ষপূর্তিতে ওই আইনের প্রতিবাদে এবং গান্ধিজি'র আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকার করোনেশন পার্কে সৈয়দ আবদুল হাফিজের নেতৃত্বে একটি বড় জনসভা হয় (*ঢাকা প্রকাশ*, ১১ এপ্রিল, ১৯২০)। ওই করোনেশন পার্কেই ৯ এপ্রিল, ১৯২০ আরও একটি সভা হয় সৈয়দ আবদুল হাফিজের নেতৃত্বে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু মানুষ এই সভায় যোগদান করেন। ড. রাজকুমার চক্রবর্তী, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খাজা আবদুল করিম প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, খিলাফত প্রশ্নের সমাধানে মুসলমানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা যদি তারা পালন না করে তাহলে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার পথে যাবে (*ঢাকা প্রকাশ* ২৫ এপ্রিল, ১৯২০)।

খাজা আজমের নেতৃত্বে ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল 'ঢাকা জেলা মুসলিম সমিতি' গঠিত হয়েছিল। বস্তুত খাজা আজম ১৯১৬ সালেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর আগে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ কার্যকর হওয়ার পর ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ'র উদ্যোগে প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল প্রবল জনরোষের ফলে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ব্রিটিশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় তখন আবার নবাব সলিমুল্লাহের উদ্যোগে বাংলা ও আসামের মুসলমান সমিতি দুটিকে একত্রিত করে নেয়া হয়। সমিতির প্রধান দপ্তরটি থাকে ঢাকা শহরে এবং সমিতি 'বঙ্গীয় মুসলমান সমিতি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নবাব সলিমুল্লাহের জীবনাবসানের পর এই সমিতি ক্রমশ গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। খাজা আজম এই সমিতির দায়িত্বভার নেয়ার পর আবার নতুন উদ্যমে সমিতির কাজকর্ম শুরু হয়। তবে সলিমুল্লাহ'র আমলের ব্যাপ্তি সমিতির আর ঘটেনি।

'প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি'র অন্তর্গত শাখা হিসেবে কেন 'ঢাকা জেলা মুসলমান সমিতি' তৈরি করা হল সে সম্পর্কে ১১ এপ্রিলের সভায় খাজা আজম বলেন: "We are to establish this association this very day to guide the Muslim public Opinion. Some may raise the question here about the provincial Mohamedan Association of Dacca. This Association had

its birth for a greater sphere of action. But with the curtailment of its field, it has lost its power of cotesion. It is now lying as it is dead… Hence a sheer necessity had arisen now to set up one new of its kind over the crumbling bones of the old" (Persidential address of the Dacca district Muslim Association delivered by Khan Bahadur Khaja Mohammad Azam on 11.04.20. East Bengal Printing and Publishing House. Dacca. 1920, Page 2-3**).**

বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে এই সময়কালের সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের মনে রাখা বিশেষভাবে জরুরি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে খিলাফত আন্দোলনের সময়ে অমৃতসরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসে। ওই অধিবেশনে গো-কোরবানি প্রত্যাহারের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল (ঐ, চধমব-২৪)। তার ব্রিটিশ-বিরোধিতার প্রশ্নে মুসলমান সমাজ তখনও সম্পূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি, যদিও ওই সমাজের একটা বড় অংশের মানুষের ভিতরেই তখন ব্রিটিশবিরোধী মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। খাজা আজম কিন্তু সে সময়ে সরাসরি ব্রিটিশ-বিরোধিতার পথে যেতে রাজি ছিলেন না। তিনি প্রথমে উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে খিলাফত আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করবারই পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধিতার প্রশ্নে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা ছিল (ঐ পৃষ্ঠা-৮)। খাজা আজমের এই অবস্থান ঢাকার তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় মানুষ ভালোভাবে নেননি। এ সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি :

"সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে 'ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন' নামে মুসলমানদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১১ এপ্রিল, ১৯২০-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার নবাব পরিবারের খান বাহাদুর খাজা মুহম্মদ আজম এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সেদিন সভাপতিরূপে উর্দু ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি সমিতির উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। তিনি মুসলমানদেরকে কোনো প্রকার অবৈধ ও রাজদ্রোহের আন্দোলনে যোগদান করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, তাঁদের যে অভাব অভিযোগ রয়েছে, তার জন্য বৈধভাবে আন্দোলন করলেই সদাশয় গভর্নমেন্ট তা দূর করবেন। অবৈধ আন্দোলন দ্বারা মুসলমান সমাজের বিশেষ অনিষ্ট ঘটবে। তাই কারো মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হয়ে কোনোরূপ উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বনের ফলে সমাজের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর, তা গভীরভাবে দেখার জন্য সভাপতি মহোদয় মুসলমানদের অনুরোধ করেন (*ঢাকা প্রকাশ*, ১২ই বৈশাখ, ১৩২৭/২৫ এপ্রিল, ১৯২০)।

বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ভিতরে সে সময়ে একটা অংশ খিলাফতের সমর্থক হয়েও ব্রিটিশ-বিরোধিতার প্রশ্নে বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততার ভিতরে ছিলেন। এঁরা হলেন– খাজা মুহম্মদ আজম, এ কে ফজলুল হক, খাজা আফজাল, নবাব হাবিবুল্লাহ, হাকিম হাবিবুর রহমান, মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, নবাব আলী চৌধুরী, শাহ আজমানুল্লাহ (ইনি মশুরিখোলার পীর সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। হিজরি-১২০৭-এ জন্ম, জীবনাবসান ১৩৪৫। অসহযোগ আন্দোলনের ইনি বিরোধিতা করেছিলেন)। এই সময়কালে এসব ব্যক্তিত্বেরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণের প্রশ্নে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এমনকি মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুনরায় যোগ দেয়ার বিষয়েও এঁরা জোরদার সওয়াল করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঢাকার তৎকালীন গুটিকয়েক মুসলমান নেতৃত্বের 'মুসলমানদের শিক্ষারক্ষা কমিটি' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করতে হয়। হাকিম হাবিবুর রহমানের সহযোগিতায় এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির পক্ষ থেকে ৪৪ পাতার একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। উর্দু ভাষায় লেখা এই পুস্তিকাটির নাম ছিল 'তরক-এ খাওয়ালাত পর মুসতানাদ্ উলামা-এ-হিন্দ্ কি রায়"। (*ঢাকা প্রকাশ*, ৯ মে, ১৯২০)। তবে এই প্রক্রিয়া সাধারণ মুসলমানদের খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার স্মৃতিতে ঢাকা জেলা মুসলিম সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় করোনেশন পার্কে ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় খাজা আবদুল করিমের সমর্থনে একটি বিরাট সভা হয়। সভার শুরুতেই ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবে ব্রিটিশ পুলিসের বর্বরোচিত গুলিচালনার উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হয়। (*ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ এপ্রিল, ১৯২০)।

খিলাফত আন্দোলন বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা প্রসারের ক্ষেত্র হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন হিসেবে ধীরে ধীরে তা বাংলার সর্বত্র প্রসার লাভ করে। এ সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল : "খিলাফতের ব্যাপারে কেবল মুসলমানের স্বার্থই বিজড়িত থাকবে, আর হিন্দুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না– এমন কথা বলা চলে না। কারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পর ভাই, স্বদেশি ও প্রতিবেশী। সুতরাং এ ব্যাপারে উভয়েরই স্বার্থ রয়েছে। তুর্কি সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদের পক্ষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. লয়েড জর্জ যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন, সে সকল যুক্তিতর্ক খ-ন করে একখানি প্রকা- বই রচিত হতে পারে" (ঐ)।

খিলাফত আন্দোলনকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানের ভিতরে যে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উত্তরণ ঘটছিল তাতে সবথেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক ছিল অভিজাত

সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছিল। অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরে ব্রিটিশ-বিরোধিতার প্রশ্নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিধা ছিল কিন্তু সাধারণ মুসলমান সমাজের মানুষদের ভিতরে সেই দ্বিধাটা আদৌ ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বিধার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করছি। খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়া সম্পর্কে নবাব হাবিবুল্লাহ ১৯২০ সালের ৮ মে একটি খোলা চিঠিতে লেখেন : "খিলাফতের বিষয়ে আমার সভাপতিত্বে যে সব বক্তৃতা হয়েছে, সেগুলো অনুমোদন করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে। আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো কথা ওইসব বক্তৃতায় থাকলে মনে করতে হবে যে, তাতে আমার অনুমোদন নেই। ওই বক্তৃতাগুলো ছিল বাংলায়, যাতে আমার ভালো জ্ঞান নেই। খিলাফত বিষয়ক অনেক সভা-সমিতিতে আমি সভাপতিত্ব করেছি। গভর্নমেন্টকে এটা বোঝানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, তুরস্কের সুলতানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা তাদের কর্তব্য, তা হলে যেন এই ইংরেজ গভর্নমেন্টের প্রতি ভারতবাসী মুসলমানের অনুরাগ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্নমেন্টের প্রতি কোনো বিদ্বেষ সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি আমার রাজভক্তি সর্বজনবিদিত। এর জন্য কোনো প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নাই। আমার পূর্বপুরুষগণের সবাই গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণের যথাসাধ্য কল্যাণ সাধন করেছিল (*ঢাকা প্রকাশ*, ৯ মে, ১৯২০, মূল ইংরেজি বিবৃতি থেকে এই পত্রিকায় অনুবাদ করে দেয়া হয়েছিল)।

অভিজাত সম্প্রদায়ের মুসলমানদের একটা অংশের ভিতরে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার প্রশ্নে এইরকম দ্বিধাগ্রস্ততা তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ (তা সে হিন্দু-মুসলমান যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন) কিন্তু ক্রমশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগিতার দিকেই ঝুঁকতে শুরু করেছিল। খিলাফত আন্দোলনকে ঘিরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের এই প্রবণতা কিন্তু বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তার জগৎকে অভিজাত সম্প্রদায়ের আঙিনা থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের খোলা অঙ্গনে এনে উপস্থাপিত করতে শুরু করেছিল।

খিলাফত কমিটির উদ্যোগে সৈয়দ আবদুল হাফেজের সভাপতিত্বে ২ জুলাই শুক্রবার ঢাকার করোনেশন পার্কে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় : "তুরস্কের সন্ধির শর্তাদি যদি পরিবর্তন করা না হয় তাহলে মুসলমানেরা সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকারের সহযোগিতা করবে না" (*ঢাকা প্রকাশ*, ৪ জুলাই, ১৯২০)। [পাঠক লক্ষ করুন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা

প্রশ্নে অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান সমাজের ধীরে ধীরে কতখানি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে।]

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খাজা সোলেমান কদরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এই বিস্মৃতপ্রায় নেতার বিশেষ অবদান রয়েছে। ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান হয়েও গ্রাম থেকেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে। দেশকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করা ছিল তাঁর কাছে একটা ব্রত। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন এবং ধর্মঘট সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ রকমের দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন। তাঁর পরিবারের ভিতরে একটা ব্রিটিশ আনুগত্যের ধারা ছিল। সেটিকে অস্বীকার করে তিনি যেভাবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তা বহু সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঢাকার নবাব পরিবারে খাজা মুহাম্মদ আলীম, খাজা আবদুল করিম, খাজা আবদুল হাফিজ, খাজা আজিজুল্লাহ প্রমুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্রমবিবর্তনে এঁদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

খাজা সোলেমান কদর খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তিনি ৯ মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৈয়দ চৌধুরী গোলাম জিলানীও তাঁর সাথে একই সঙ্গে জেলে ছিলেন। সোলেমান কদর এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একই দিনে মুক্তি পান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোলেমান কদর গ্রেপ্তার হওয়ায় ঠিক তিন মাসের মাথায় ঢাকা বিভাগের কমিশনার ঢাকা সেন্ট্রাল জেল পরিদর্শন করেন। তখন তিনি সোলেমান কদরের কাছে প্রস্তাব রাখেন যে, যদি সোলেমান আন্দোলনে যোগদান দেয়া সংক্রান্ত কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করেন তাহলে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে। সোলেমান ঘৃণাভরে কমিশনারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কারামুক্তির পর হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে বিরাট শোভাযাত্রা করে খাজা সোলেমান কদরকে নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও খাজা কদরকে নিয়ে সেই শোভাযাত্রা বাংলার সম্প্রীতির ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে আছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে উৎসাহী পাঠক দেখুন; Dhaka Nawab Family News Letter, Edited by Khwaja Rahaman Kuader. Karachi, 1993, March, Page-11, এ ছাড়াও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় খাজা সোলেমান কদর সম্পর্কে ২২ অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায় বিস্তারিত সংবাদ রয়েছে)।

জাতীয় আন্দোলনের এই বিশিষ্ট সমন্বয়বাদী নেতৃত্ব খাজা সোলেমান কদরের সভাপতিত্বে ১৯২০ সালের ১৬ জুলাই করোনেশন পার্কে আরও একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। খাজা আবদুল করিম, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, ড. রাজকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ এই সভায় বক্তৃতা করেন। (*ঢাকা প্রকাশ*– ১৮ জুলাই, ১৯২০)।

ভারতব্যাপী তৃতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয় ১৯২০ সালের ১ আগস্ট (The Indian Annual Register:edited by H.N. Mitra. Part-II Calcutta, Shibpur 1921, Page-47)। সেদিন ঢাকা শহরের প্রায় সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। স্থানীয় খিলাফত কমিটির ডাকে বিকাল ৫টায় করোনেশন পার্কে খাজা আবদুল করিমের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা হয়। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ৬ হাজারেরও বেশি মানুষ সমবেত হয়েছিলেন বলে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যাচ্ছে। সভায় তুরস্ক সন্ধি শর্তের আবশ্যকীয় পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত স্বদেশজাত জিনিস ব্যবহারের শপথ নেওয়া হয়। সরকার প্রদত্ত উপাধি বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সরকারি কাজে ইস্তফা দেওয়ার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানানো হয়। (*ঢাকা প্রকাশ*, ৮ আগস্ট, ১৯২০)। ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা আবদুল করিম অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ইস্তফা দেন ১ আগস্ট। তিনি ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য ছিলেন (ঐ)।

করোনেশন পার্কে চৌধুরী মহম্মদ গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে ২২ আগস্ট খিলাফতের সমর্থনে একটি সভা হয়। ঢাকা খিলাফত কমিটির আহ্বানে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খাজা আবদুল করিমের সভাপতিত্বে করোনেশন পার্কে খিলাফতের সমর্থনে সভা হয়। 'বর্তমান সমস্যা ও আমাদের কর্তব্য' বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল ওই সভায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় বলা হচ্ছে এই সভায় হিন্দু-মুসলমানে নির্বিশেষে ৬ হাজারেরও বেশি মানুষ সমবেত হয়েছিলেন (*ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২০) ২৭ নভেম্বর খিলাফত কমিটির অফিসে পুলিশি তল্লাশি চলে। (ঢাকা খিলাফত কমিটির কোষাধ্যক্ষ খাজা আবদুল মওদুদের দিনলিপিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে ২৭.১১.১৯২০), ৮ ডিসেম্বর খাজা আবদুল হাফিজের নেতৃত্বে খিলাফতের সভায় বক্তৃতা করেন বিপিনচন্দ্র পাল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এই সভা থেকেই ঢাকায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (*ঢাকা প্রকাশ*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯২০)।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা এবং অসহযোগিতার প্রশ্নে বাঙালি মুসলিম নেতৃত্বের ভিতর কিন্তু মতভেদ ছিল। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে এই সময়ে মতান্তরের ও সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। ১৯২০ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশের সাথে

সহযোগিতা বর্জন এবং সহযোগিতা বর্জন-প্রত্যাহার— দুটি বিষয় নিয়েই সভা হয়। নবাব হাবিবুল্লাহ এবং এ কে ফজলুল হক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার পক্ষে জোরদারভাবে সওয়াল করেন। নবাব সাহেবের উদ্যোগে এ সম্পর্কে 'বঙ্গীয় মুসলমান সম্মিলনী' নামে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ লেখা হচ্ছে (১২ ডিসেম্বর ও ১৯ ডিসেম্বর ১৯২০) সহযোগিতা বর্জনের প্রতিবাদকল্পে ১২ ডিসেম্বর অপরাহ্নে ঢাকার নর্থ ব্রুক হলে মুসলমানদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তদুপরি কিছু দর্শকও উপস্থিত ছিলেন। নবাব হাবিবুল্লাহ ছিলেন ওই সভার উদ্যোক্তা। সভাপতিত্ব করেন এ কে ফজুলল হক, সভায় ১টি মুদ্রিত পুস্তিকা সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। হিন্দুদের কথায় উত্তেজিত হয়ে সহযোগিতা বর্জন করা এবং বিকল্প বিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন নয় এ কথাটি নেতাদ্বয় তাঁদের বক্তৃতায় লোকদের বুঝিয়ে বলেন।

সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটিতেই নবাব হাবিবুল্লাহ'র বক্তব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়, সহযোগিতা বর্জনের আন্দোলনে স্কুল-কলেজ ত্যাগের কর্মপন্থা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা দেশের জন্য বিশেষ অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এতে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমান ছাত্ররাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। সুতরাং মহাত্মা গান্ধির এই সহযোগিতা বর্জনের প্রস্তাব কখনোই কার্যকর হতে পারে না (ঐ)।

নবাব হাবিবুল্লাহের বক্তৃতার পর এ কে ফজলুল হক বলেন, "স্কুল-কলেজ হতে শিক্ষার্থীদের বের করে নিয়ে আসা উচিত কি না, সে সম্পর্কে আমাদের বিশেষ চিন্তা করে দেখতে হবে। আমাদের অনেক মওলানা সাহেব এ মর্মে ফতোয়া জারি করেছেন যে, গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ না করলে ইসলামের অবমাননা করা হবে। এ সব ফতোয়ায় প্রচারিত তথাকথিত সত্যের বিরুদ্ধে আমি এতটুকু বলতে চাই যে, আমাদের মহান ইসলাম ধর্মানুসারে প্রত্যেকটি মানুষের অন্য সর্ববিষয়ে যেমন নিজের স্বাধীন মত অক্ষুণ্ন রেখে চলার অধিকার আছে, তেমনি বর্তমান সমস্যায় ও স্ব স্ব মতের মর্যাদা রক্ষা করে চলার অধিকারও তার রয়েছে। স্বাধীন মতপ্রয়োগের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। আমি মনে করি, বর্তমান সহযোগিতা বর্জন নীতির উদ্দেশ্য হল দু'টি। এক, পাঞ্জাবের হত্যাকা- ও খিলাফত সমস্যার জন্য গভর্নমেন্টের উপর প্রতিশোধ নেওয়া। দুই, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় চরিত্র গঠনের পথ সুগম করা। ধরে নেয়া যাক– এ দু'টি বিষয়ই অভিপ্রেত। তবু মনে রাখতে হবে, স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে ওই দুটির মধ্যে কোনোটাই লাভ করা যাবে না।

স্কুল-কলেজে যে গভর্নমেন্ট গ্রান্ট (সাহায্য) দেয়া হয়, তা গভর্নমেন্টের নিজস্ব অর্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে তা দেশের লোকেরই অর্থ। গভর্নমেন্টের হাত হয়ে আসে

বলে সেই টাকা বর্জন করা বিবেচনার কাজ হবে না। মনে করুন, আমার ভাই যদি আমাকে মানিঅর্ডারে টাকা পাঠান, তা গভর্নমেন্টের হাত দিয়ে আসে বলে কি আমার সেই টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা উচিত? অথবা ধরুন একটা চোর আমার টাকা চুরি করে নিয়ে গেল, সে ব্যক্তি অপহৃত অর্থের কিয়দংশ আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে চোরকে ঘৃণা করি বলে সেই অর্থ গ্রহণ করব না? বর্তমানে আমাদের দেশে জাতীয় বিদ্যালয় একটিও নেই। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত বর্তমান স্কুলসমূহে গভর্নমেন্টের সাহায্য গ্রহণ না করা মূর্খতার একশেষ বই আর কিছুই নয়। নিজের পানির কল অথবা পুষ্করিনী প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত কি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত কলের পানি পান করা থেকে বিরত থাকবেন? গভর্নমেন্ট-সৃষ্ট স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করে প্রত্যেকে যেভাবে জীবনযাত্রার পথ খুঁজে পাচ্ছে, জাতীয় বিদ্যালয়গুলোতে সেরূপ হবে না। কাজেই অতি অল্পসংখ্যক অভিভাবকই জাতীয় বিদ্যালয়ে তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য পাঠাবেন। ফলে এই দাঁড়াবে যে, জাতীয় বিদ্যালয়গুলো ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর করে বেশি দিন চলতে পারবে না। সুতরাং এইসব বিদ্যালয় জীবিত রাখতে হলে অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

বঙ্গদেশে বর্তমানে যতগুলো বিদ্যালয় গভর্নমেন্টের সাহায্য ভোগ করছে সেগুলো হতে সরকারি সাহায্য উঠিয়ে দিতে হলে অন্তত ৫০ কোটি টাকার আবশ্যক হবে। আমি সাহস করে বলতে পারি, হাজার চেষ্টা করেও বঙ্গদেশ হতে এই ৫০ কোটি টাকা আদায় করা যাবে না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজ হতে উঠিয়ে আনার যে আন্দোলন চলছে তা সমর্থন করার কোনো যুক্তি আমি দেখছি না। এই আন্দোলন নীতিবিবর্জিত, অন্যায় এবং ব্যক্তিস্বার্থজড়িত। আমরা কেবল ছেলেদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশাভরসা জলাঞ্জলি দিতে বলছি। অথচ আমরা নিজেরা কোনো প্রকার স্বার্থত্যাগ মোটেই করতে প্রস্তুত নই। উকিলরা ব্যবসা ছেড়েছেন কি? সরকারি কর্মচারীগণ তাঁদের চাকরি ত্যাগ করেছেন কি? কেউ সরকারি ট্যাক্স আদায় করতে বিরত হয়েছেন কি? বড় বড় মহাজনরা কি বিলাতি পণ্য আমদানি বন্ধ করেছেন এবং আমাদের ভারতীয় ধনী সম্প্রদায়ের কেউ কি বিলাতের ব্যাঙ্কগুলো হতে নিজেদের টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন? প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত কেউ-ই কোনোপ্রকার স্বার্থত্যাগ করেননি। কেবল ছাত্রদেরকে স্কুল-কলেজ ছেড়ে ত্যাগ স্বীকারের উপদেশ দিচ্ছেন।

আমার মনে হয়, যে সব মুসলমান অসহযোগ আন্দোলন করছেন, তাঁদেরকে সোজাসুজি একথা জিজ্ঞাসা করার সময় হয়েছে যে তাঁরা কি পবিত্র কোরানের ধর্মানুসারে চলতে প্রস্তুত? সেরূপ হলে তাঁদের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী রাজার শাসনাধীনে

বাস করতে অস্বীকার করার সময় কি উপস্থিত হয়েছে? যাঁরা ফতোয়ার বন্যায় দেশ ভাসাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ তো আজ পর্যন্ত সেরূপ করেননি এবং করলেও মাত্র গুটিকয়েক করেছেন। যদি অসহযোগ আন্দোলনকারী মুসলমান নেতৃবৃন্দ নিজেদের প্রচারিত সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে চান তবে তাঁদের কথানুরূপ কাজও করতে হবে। নতুবা তাঁরা যে ভণ্ড, সে কথা তাঁদেরকে স্বীকার করতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজন ছেলে কতিপয় স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে অথবা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় করলেই যে তুরস্কের সন্ধিশর্তে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে, কিংবা বিলাতে খিলাফতের অনিষ্ঠাচারণের প্রতিকার হবে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেরূপ মনে করতে পারেন না। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক যাঁকে অত্যধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকেন, তাঁর সম্বন্ধে আমি অসম্মানজনক কোনো কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীনের ন্যায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই নেতাদের কয়েকজন সরলভাবে আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা খিলাফতের জন্য কিছুমাত্র ভাবছেন না। বিদ্যালয় বর্জন আন্দোলনে তাঁদের উদ্দেশ্য হল– দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে ভারতে ঘোরতর বিপ্লবের পথ সুগম করা। যাঁরা এইরূপ অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, দেশে তাঁদের এমন কিছু (অর্থসম্পদ) নেই, যার অনিষ্ট ঘটার আশঙ্কা তাদের থাকতে পারে। তাই আমরা এই রক্তপাত ও লুণ্ঠনের ব্যাপারে কিছুতেই সম্মতি দিতে পারি না।" (*ঢাকা প্রকাশ*, ৪ই পৌষ, ১৩২৭, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২০)।

পরবর্তী সময়ে অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফজলুল হক একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হলেও খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তাঁর এই নেতিবাচক ভূমিকা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনালোচিত থেকে গেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে ফজলুল হকের পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনকেই আলোচিত করে তাঁকে এক মহৎ রাজনীতিক হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমপর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আন্দোলন বিষয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের ভিতরে বিভেদ সৃষ্টির প্রবলতার কথা সেভাবে আলোচিতই হয়নি। ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণের এখন সম্যক অভাব রয়েছে। ফলে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্রমবিকাশ আলোচনায় ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনও মোহাম্মদ আলি জিন্নার মতো ক্রমপরিবর্তনশীল চরিত্র হিসেবেই পরিগণিত হওয়ার দাবি রাখে।

সংশ্লিষ্ট অধিবেশনটিতে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবটি হল "সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধি ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ইংল্যান্ড ও মিত্রশক্তিবর্গ খিলাফত প্রশ্ন সংক্রান্ত সন্ধিচুক্তি দ্বারা মুসলমান ধর্মের যে অবমাননা করেছেন, তার প্রতিকারের জন্য যেসব বৈধ উপায় অবলম্বন করা হবে, এই সম্মেলন তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বিদ্যার্থীদের বহিষ্কারের জন্য যে আন্দোলন চলছে, সম্মেলন তা তীব্র প্রতিবাদ করছে" (ঐ)।

ফজলুল হকের উপস্থিতিতে খিলাফত অসহযোগ প্রশ্নে স্কুল-কলেজ বর্জনের বিরুদ্ধে ওই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই একই জায়গায়, (অর্থাৎ, করোনেশন পার্কে) খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বিশেষ করে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের সমর্থনে একটি সভা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ওই সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "ছাত্রদের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হলেও এ পর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণ ছাত্র ওইসব বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উপস্থিত হচ্ছেন না।" আন্দোলনের আশানুরূপ ফল না পাওয়ার জন্যেও দেশবন্ধু ওই বক্তৃতায় দুঃখ প্রকাশ করেন। (*ঢাকা প্রকাশ*– ১২ ডিসেম্বর, ১৯২০)।

"ফজলুল হক, নবাব হাবিবুল্লাহ প্রমুখ স্কুল-কলেজ বর্জনের বিরুদ্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তা কিন্তু সমর্থন পায় যথেষ্ট পরিমাণে।" 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (২ জানুয়ারি, ১৯২১) বলা হয় "কংগ্রেসনীতি অনুসরণ করে সব ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলে দেশের অবস্থা কী হবে, তা কি ভেবে দেখার বিষয় নয়? এখন যারা সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, তাদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হলে বহু কোটি টাকার প্রয়োজন। এত টাকা সংগ্রহের কল্পনা কেউ করতে পারে না। যদি সে ব্যবস্থা করতে না পারা যায় তাহলে দেশের ভাবী ভরসাস্থল, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পথ অবরোধ করাই হবে এ সিদ্ধান্তের পরিণাম। শিক্ষা ব্যতীত দেশের দুর্দশা দূরীকরণের অন্য কোনো উপায় নেই। – একথা সত্য বলে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পরিণাম ভাবতেও হৃৎকম্পন উপস্থিত না হয়ে পারে না। জানি না, বিধাতা এ দেশের ভাগ্যটা কী বর্ণে বিচিত্র করেছেন?"

'মালঞ্চ' নামক অপর একটি পত্রিকায় প্রবোধচন্দ্র সেন (যিনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়েছিলেন এবং 'ছান্দনিক' হিসেবে যাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত) লেখেন: "বস্তুত ভাঙা যথেষ্ট হয়েছে, এখন গড়িবার কথাটা বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার, এত ছেলের পক্ষে যদি তাহারা বাইরে থাকে ও শিক্ষাই চায়,– জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা বড় সহজ হবে না। বহু অর্থ ও শিক্ষার কার্যে অভিজ্ঞ বহু কর্মীর প্রয়োজন। তা যে

মুখের কথা বের করলেই মিলবে তা হবে না। একটু যার হিসাব-কিতাব আছে, সে-ও একথাটা বুঝতে পারে" (*মালঞ্চ* পত্রিকায় 'নন্ কো-অপারেশন ও ছাত্র ধর্মঘট' নামক প্রবোধচন্দ্র সেনের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯২১, পৃ.-৭৫৪)।

এই ঘটনাক্রমের ব্যাপ্তি ঢাকা জেলার বাইরেও ঘটেছিল। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত 'ফরিদপুরহিতৈষী' নামক পত্রিকায় লেখা হয় : "আজকাল ফরিদপুরে প্রতিদিনই অসহযোগী প্রচারকদের বক্তৃতা হচ্ছে। বক্তৃতা শোনার জন্য বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক লোকেরই সমাগম হচ্ছে। আইনানুমোদিত নিজ নিজ অভিমত জনসাধারণের নিকট জ্ঞাপন করার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। তবে এই প্রচারকদের মধ্যে যাঁরা অল্পবয়স্ক বালকদের স্কুলত্যাগ করে তথাকথিত দেশের কার্যে যোগদানের জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, এবং ব্যগ্রভাবে আহ্বান করছেন, আমরা কিছুতেই তা সমর্থন করি না। আমাদের বিশ্বাস, এতে কুফল বই সুফল প্রসব করবে না। অল্পবয়স্ক বালকদের অভিভাবকগণই তাদের কর্তা। তাদের অপ্রিয়ভাজন হওয়া বালকদের কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো কোনো প্রচারক বক্তৃতার মধ্যে বালকদের উপদেশক সেজে পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। আমরা বলি, আগে বালকরা সেয়ানা হোক, তৎপর তারা যদি নিজ অভিমতে কার্য করতে চায়, তবে কারো আপত্তি থাকবে না" (*ফরিদপুরহিতৈষী*, আগস্ট, ১৯২১)।

খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নীতিকে সমর্থনের প্রশ্নে ফজলুল হকের ভূমিকা সম্পর্কে বাংলার রাজনৈতিক আবর্ত যথেষ্ট আলোড়িত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা বিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার প্রশ্নে ফজলুল হকের দ্বিধাগ্রস্ততা যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

খিলাফত প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে যথেষ্ট চিন্তান্বিত করেছিল (*The Khilafat Movement* – Mimault rail, Delhi, 1982, পৃ.-70)। এই ঐক্য ভারতীয় রাজনীতিকদের একটা বড় অংশকে যথেষ্ট বিস্মিত করেছিল (ঐ)। বাঙালি মুসলমান নেতৃত্ব কিন্তু এই ঐক্যকে জোরদার করবার লক্ষ্যে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করে। এই সময়ে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'হিন্দু-মোছলমান' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে সিরাজী খিলাফত সমস্যার সমাধানে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন : খিলাফত উদ্ধার হলে হিন্দু সম্প্রদায়ও লাভবান হবে। এই সময়েই বিভেদকামী শক্তির সক্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বিভেদকামী শক্তি অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে

অপপ্রচার চালিয়েছিল যে, স্বরাজ লাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করবে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর ওই প্রবন্ধে স্বার্থান্বেষী মহলে এ ধরনের আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ অমূলক বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছিলেন : "এই আতঙ্কের কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই।" (সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি 'ছোলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সংখ্যায়)।

ফজলুল হক বা অভিজাত মুসলমানদের কেউ কেউ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার প্রশ্নে দ্বিধান্বিত থাকলেও মওলানা আবুল কালাম আজাদ (এই মনীষীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল বাংলাকে কেন্দ্র করেই। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি খিলাফত কমিটি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা হিসেবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিজের স্থান করে নেন। ১৯২৩ সালে এবং ১৯৪০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। বাংলার বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান মওলানা আজাদের ভাবশিষ্য ছিলেন), মওলানা ইসলামাবাদী, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, আবুল কালাম সামসুদ্দিন, মওলানা আকরম খাঁ, মুজিবর রহমান, পীর বাদশাহ মিঞা, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (ইনি রাজনৈতিকমহলে চাঁদ মিঞা নামে পরিচিত ছিলেন), সৈয়দ মজিদ বক্স, ফজলুল হক শেলবর্ষী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলাম, আফতাবুদ্দিন চৌধুরী, তৈয়বুদ্দিন আহ্মদ, মনিরুদ্দিন আহমদ, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, আবদুল রশিদ খাঁ, মওলানা মনিরুদ্দিন (দিনাজপুর), শাহ বদিউল আলম, সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশমি, শামসুদ্দিন আহমদ, ইব্রাহিম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে বেগবান করেছিলেন। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিবর্তনে তাঁদের ঐতিহাসিক অবদানকে কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না।

এ কে ফজলুল হক প্রথমদিকে এই আন্দোলনের সাথে থেকেও ধীরে ধীরে যেভাবে আন্দোলন থেকে সরে যান তা শুধু সে সময়ের রাজনৈতিক পরিম-লেই বিতর্কের অবতারণা করেনি, বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। ১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বর দিল্লিতে যখন সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার প্রথমদিনের সভাপতির দায়িত্ব ফজলুল হক সাহেব পালন করেছিলেন। ১৯২০ সালের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টাউন হলে বেঙ্গল খিলাফত সম্মেলনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেছিলেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত যে সম্মেলনে হক সাহেবের বিবৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার অল্পকিছুকাল আগে তিনি এক ঘরোয়া আলোচনার সময়ে আন্দোলনের স্বার্থে ওকালতি পেশা

ত্যাগ করার কথাও বলেছিলেন। (*দি মুসলমান*, ২০ আগস্ট, ১৯২০)। ফজলুল হকের চিন্তার এই পরিবর্তন সম্পর্কে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় লেখা হয় : "Now Moulvi Fazlul Haq has turned his back and is going to stand for election to the Bengal Legislative Council, inspite of the decision to the contrary, arrived at the Khilafat Committee. People say that the shadow of a ministership has proved too tempting to him…" (ঐ)।

'ছোলতান' পত্রিকায় ফজলুল হকের ভূমিকার সমালোচনা করে লেখা হয়, "আমাদের ভূতপূর্ব খিলাফত নেতা বর্তমানে আমলাতন্ত্রের মহিমা প্রচারক ফজলুল হক সাহেব এ ব্যাপারে একটু অসাধারণত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ... ভারতীয় খিলাফত নেতৃবৃন্দকে ভ- ও অসাধু এবং কামাল পাশাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, এছলাম-শত্রু নাস্তিক প্রভৃতি গালাগালি দিয়া খাহ্‌মাখাহ্‌ নিজের রসনা তিক্ত করিয়াছেন" (*ছোলতান*, ১লা চৈত্র ১৩৩০)।

ঢাকার ওই সভার আগেই অবশ্য সংবাদপত্রে চিঠি লিখে ফজলুল হক বলেছিলেন, গান্ধিজি ও খিলাফত কমিটির ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ, সরকারি চাকরি ত্যাগ, খেতাব বর্জনের কর্মসূচির ভিতর দিয়ে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না, (*দি মুসলমান*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০)।

এ প্রসঙ্গে বাংলার আর একজন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা আবুল কাশেমের নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রথমে তিনি খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইংলন্ডে যে খিলাফত প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল আবুল কাশেম তার একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল; ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পরই তিনি ওই আন্দোলন সম্পর্কে একদম নিশ্চুপ হয়ে যান। একই কথা প্রযোজ্য নবাব আলী চৌধুরী সম্পর্কেও। তিনিও এই আন্দোলনের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাই প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে দেন। তাঁর মতে আল্লাহ'র কাছে প্রার্থনাই হল সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র পথ (*দি মুসলমান*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২১)।

এই পরিস্থিতিতে কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি এবং বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রসারও থমকে পড়েনি। ১৯২১ সালের ৫ মে ঢাকা ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রথম প্রকাশিত হল। বিজ্ঞাপনটি দেন ঢাকা ন্যাশনাল এডুকেশনাল সেক্রেটারি সতীশচন্দ্র সরকার। (*ঢাকা প্রকাশ*, ৮ মে, ১৯২১)। এরই ভিতর এ কে আফজাল প্রমুখ কিছু নেতা খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচির ফলে ধর্মঘট ইত্যাদির জন্য যে ক্ষতির সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে অবহিত করবার জন্য গভর্নর রোনাল্ডশে'র সঙ্গে দেখা করেন (ঐ, ১১ জুলাই ১৯২১)। ঢাকা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগেও ধামরাই বাজারে এই আন্দোলনকে

আরও গতিশীল করবার লক্ষ্যে একটি বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আগস্টের প্রথম সপ্তাহে (ঐ, ২১ আগস্ট, ১৯২১)।

অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজের একটি অংশকে পরিচালিত করতে ইতোমধ্যে বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। এই আন্দোলনকে সমূলে উচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকার নর্থব্রুক হলে ১৩ সেপ্টেম্বরের (১৯২১) মঙ্গলবার দুপুর ১২টার সময়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে বেশ কয়েকজন জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষের উপস্থিতি তেমন একটা ছিল না। ময়মনসিংহের শেরপুরের জমিদার চারুচন্দ্র চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন, সভায় ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরী, খান বাহাদুর মৌলবী মোসলেমউদ্দিন, ফরিদপুরের জমিদার অম্বিকাচরণ মজুমদারের বার্তা পাঠ করা হয়। শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই সভায় 'ইস্টবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন', নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরের দিন ১৪ সেপ্টেম্বর (১৯২১) বুধবার দুপুর ২টায় আবার অধিবেশন বসে। অধিবেশন শেষে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেটি হল, 'ইস্টবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন' নামক সমিতির শাখা পূর্ববঙ্গের সর্বত্র গঠন করার লক্ষ্যে একটি কমিটি তৈরি করা হোক। কমিটির সদস্যদের নাম তিনি প্রস্তাব করেন; সভাপতি হিসেবে মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী, সহ-সভাপতি নবাব হাবিবুল্লাহ, চারুচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদাচরণ রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, খান বাহাদুর হেমায়েতউদ্দীন, সম্পাদক হিসেবে ধীরেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সহকারী সম্পাদক হিসেবে রেবতীমোহন দাস ও হাকিম হাবিবুর রহমানের নাম প্রস্তাবিত হয় (*ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২১)।

এই 'ইস্টবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন' নামক সমিতি গঠনের বিষয়টি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রেণিস্বার্থের তাগিদ থেকে জমিদাররা এবং বড় ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। তবে সব জমিদার যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত ছিলেন তা ভাবলে ভুল হবে। করটিয়ার জমিদার ওয়াজিদ আলী খান পন্নী খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের কালেও শ্রেণিস্বার্থের তাগিদ থেকে বাংলার জমিদারদের একটা বড় অংশ ব্রিটিশ-বিরোধিতা করেনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল এবং ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী যেসব কাজকর্ম হচ্ছিল সেগুলো বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে এইসব জমিদারেরা ১৯০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'ইম্পিরিয়াল লিগ' নামক একটি সংগঠন স্থাপন করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের জমিদারদের উদ্যোগে ১৯০৯ সালের ২১ মার্চ 'ইম্পিরিয়াল লিগ অব ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' নামে অপর একটি সংগঠনও তৈরি হয়েছিল। প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা, প্রমোদনাথ রায়, নবাব সিরাজুল ইসলাম, ওয়াজিদ আলী খান পন্নী। (পরবর্তী সময়ে অসহযোগ আন্দোলনকালে উনি সম্পূর্ণ ব্রিটিশবিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন), যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এই সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

খিলাফত ও অসহযোগকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ-বিরোধিতার প্রশ্নে সে সময়ে বাংলায় সাধারণ মানুষের ভিতরে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার আগুন বেশ ভালোভাবেই জ্বলে উঠেছিল, ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঢাকার নারায়ণগঞ্জে খাজা করিমের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা হয়। সেখানি পি সি ঘোষ, বসন্তকুমার মজুমদার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করেন। দেশবন্ধু বলেন, পরাধীনতার জন্য ভারতবাসী নিজেরা যতখানি দায়ী, ইংরেজ ততোটা দায়ী নয়, দেশবাসীকে কিছুদিনের জন্য বিলাসিতা বর্জনের আহ্বান জানান দেশবন্ধু। (ঐ)।

ব্রিটিশ সরকার অবশ্য খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন দমন করতে, বিশেষ করে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিকে ধ্বংস করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কংগ্রেস ও খিলাফতের যাবতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯২১ সালের ১৯ নভেম্বর একটি সার্কুলার জারি হয়। সেখানে বলা হয় : "For sometime past the enrollment of so-called volunteers has been a feature in the programme of various bodies prominent in political matters. Such men appear of first to have been honorary workers, of ten of the student class, who helped on specific occasions such as receptions, meeting etc. Move recently the movement has taken on different aspect and under the auspices of the Khilafat and Congress Committees humerous persons have been regularly enrolled in deifinite organisations under specific caders ready to emerge and perform the tasks allotted to them by those in authority in these negociations. These men are drawn often from the lower classes and are believed to be paid for their day's work."

সরকারের এই ঘোষণার পর ধরপাকড় জোরদারভাবে শুরু হয়ে যায়, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের বহু নেতা গ্রেপ্তার হন, ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তাঁদের বিচার কাজ শুরু হয়। (*ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯২১)। ঢাকায় খিলাফত কমিটির অফিসে এবং নারায়ণগঞ্জে খিলাফত কমিটির অফিসে একযোগে তল্লাশি হয় ১৯২১ সালের ২৩ নভেম্বর এই দুইটি অফিস থেকেই যাবতীয় কাগজপত্র পুলিস জোর করে নিয়ে যায়।

পুলিস কিভাবে নির্মম হস্তে আন্দোলন ভেঙে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছিল তার দুই-একটি উদাহরণ উপস্থাপিত করা হচ্ছে; ঢাকা খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেস কমিটির যৌথ উদ্যোগে ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার করোনেশন পার্কে দেশের বর্তমান সমস্যা ও কর্তব্য নির্ধারণ সম্পর্কে একটি সভার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। এই বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হওয়ার পরই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে সভার উদ্যোক্তা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খাজা গোলাম কুদ্দুস, খাজা আব্দুল করিম, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস প্রমুখের উপর ১৪৪ ধারা জারি করে সভা বন্ধের একটি নোটিশ পার্কের গেটে সেঁটে দেয়া হয় এবং পার্কের গেটে প্রহরায় ৭ জন কনস্টেবলকেও মোতায়েন করা হয়। (*ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ নভেম্বর, ১৯২১)।

ঢাকার খিলাফত ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকদের ব্রিটিশ পুলিস গ্রেপ্তার করে ১৯২১ সালের ১২ ডিসেম্বর, প্রাদেশিক সরকার এক মাসের জন্যে যাবতীয় সভা-সমিতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, পদ্মরাজ জৈন, মওলানা আকরম খাঁসহ ১৫০ জনকে ১০ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের গ্রেপ্তারের সম্মানে ঢাকায় আলোকসজ্জা করা হয় এবং বিদেশি কাপড় পোড়ানো হয়। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে খিলাফত অসহযোগপন্থী স্বেচ্ছাসেবকরা জোরদারভাবে পিকেটিং শুরু করে। ২০ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন মালিকান্দার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তীকালে উনি দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন)। ঢাকা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অতুলচন্দ্র সেন, ঢাকা খিলাফত কমিটির প্রাক্তন সভাপতি খাজা আবদুল করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে, জেল আদালতেই এইসব বন্দিদের বিচার করা হবে। (*ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২১)।

ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ভারতীয় দ-বিধির ১৪৪ ধারা মোতাবেক ঢাকা শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত যাবতীয় শোভাযাত্রা ও পিকেটিং-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় (ঐ)।

এই সময়েই প্রিনস অব ওয়েলস কলকাতায় আসেন। এর প্রতিবাদে কলকাতা ও ঢাকায় অবরোধ পালিত হয় (ঐ)।

১৯২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই শুরু হয় বিচারের নামে প্রহসন। ৩ জানুয়ারি থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বিচার শুরু হয় চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, খাজা সোলেমান কদর, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খাজা আবদুল করিম, চন্দ্রকান্ত বেদান্ত শাস্ত্রী প্রমুখের। (*ঢাকা প্রকাশ*, ৮ জানুয়ারি ১৯২২)।

১২ জানুয়ারি বিচার শেষ হয় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অতুলচন্দ্র সেনের, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে অব্যাহতি দেয়া হলেও অতুলচন্দ্র সেনকে ৯ মাসের সশ্রম কারাদ- দ-িত করা হয়। এইদিন শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিচার শেষ হলেও সে সম্পর্কে কোনো রায় দান করা হয় না। (*ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ জানুয়ারি ১৯২২)।

প্রাদেশিক সরকার ঢাকায় এক মাস সবরকমের সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করলেও সেই সরকারি আদেশকে অমান্য করে ২৩ জানুয়ারি (১৯২২) একটি বড় জনসভার আয়োজন করা হয়, পুলিস ব্যাপক হারে লাঠিচার্জ করে এই সভা ভেঙে দেয়। পুলিশের লাঠিতে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ গুরুতরভাবে আহত হন। এভাবে ক্রমে বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তা- চেতনার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে।

উৎস: পত্রিকা: "দেশহিতৈষী" শারদ সংখ্যা ১৪১৮/২০১১।

[লেখক: গবেষক।]

মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ব দ রু দ্দী ন উ ম র

পূর্বপাকিস্তানি মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতি-চেতনার উন্মেষ হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত নয়। উপরন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাকৃতিক জগতের মতো মানুষ এবং তার সমাজ কতকগুলো অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অনুবর্তী। কিন্তু এ চিন্তাধারা নতুন না হলেও তার মধ্যে এই হিসেবে অনেকখানি নতুনত্ব আছে যে, আজ এ চিন্তাধারার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটছে তারা এ-জাতীয় চিন্তা করতে এতদিন অভ্যস্ত অথবা প্রস্তুত ছিল না।

এ কথার অর্থ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, ধর্মগতভাবে মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানিরা, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা, ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশকে উচিতমতোভাবে কখনো স্বদেশ মনে করেননি। শ্রেণি-স্বার্থের কারণে স্বদেশের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনে তাঁদের বরাবরই আপত্তি ছিল এবং এই আপত্তি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ফলে অধিকতর ঘোরতর আকার ধারণ করে।

নিজের দেশকে স্বদেশ মনে না করার জন্যে মানুষের জীবনে যে দুর্যোগ স্বাভাবিক, মুসলমানরা সে দুর্যোগকে রোধ করতে পারেননি। পাক-ভারত উপমহাদেশের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের যে কারণে এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নেই, অনেকখানি সেই কারণেই মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনও হয়েছে পঙ্গু ও সৃষ্টিহীন।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এদেশের সাথে আত্মীয়তা বোধ করতে না পারার কারণ প্রধানত তিনটি। ধর্মগতভাবে তারা ছিল খ্রিস্টান, তাদের ভাষা ছিল ইংরেজি এবং তাদের দেহে প্রবাহিত ছিল ইংরেজদের রক্ত। ইংরেজরা যেহেতু এ দেশের শাসনকর্তা ছিল এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ছিল সেই শাসকদের ধর্মাবলম্বী, তাদের ভাষাভাষী এবং তাদের রক্তগত আত্মীয়, কাজেই তারা নিজেদেরকে মনে করত

ভারতবর্ষের লোকদের থেকে উচ্চ শ্রেণির ও উচ্চ বংশীয়। তাছাড়া ধর্মগত, ভাষাগত এবং রক্তগত ঐক্য এবং সম্পর্কের জন্যে তারা নিজেদেরকে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের মতো বিদেশিশাসিত মনে না করে মনে করত এ দেশের শাসনকর্তা– রাজার জাতি। কাজেই ইংরেজি ছিল তাদের ভাষা, ইংলন্ডের ইতিহাস ছিল তাদের জাতীয় ইতিহাস এবং অ্যাংলিকান চার্চ ছিল তাদের জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান।

বিদেশের সাথে এই কৃত্রিম আত্মীয়তা এবং স্বদেশের সাথে আত্মীয়তাবোধের ফলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অবস্থা সংস্কৃতি ও রাজনীতিগতভাবে এক শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অবস্থার সাথে এসব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। সামন্তশ্রেণির মুসলমানেরা মোগল রাজত্ব এমনকি ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত, বাংলায় কথা না বলে ফারসি-উর্দুতে কথা বলতেন, নিজেদেরকে জাতিগতভাবে মনে করতেন আরব, ইরানি, তুর্কি, খুরাসানি অথবা সমরকন্দি এবং তাঁদের ধর্ম ছিল ইসলাম। তাই বৈদেশিক ভাষা, রক্ত ও ধর্মের প্রভাব সামন্ততান্ত্রিক এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি-স্বার্থের তাগিদে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এ দেশের মাটির সাথে মুসলমানদের আত্মিক যোগ-স্থাপনকে করল বাধাগ্রস্ত। দেশের মাটির সাথে এই সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হল না, তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হল বহুতরভাবে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেশকে বাতিল করে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা আকাশ-কুসুম রচনার মতো অবাস্তব ও বন্ধ্যা হতে বাধ্য।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মভেদ থাকলে তাদের সাংস্কৃতিক দৈন্য এতখানি উৎকট আকার ধারণ করত না। কিন্তু ধর্মভেদ অন্যান্য ভেদাভেদের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করার ফলে অবস্থার অবনতি ঘটল এবং সে অবনতিকে রোধ করা গেল না। মুসলমান উচ্চশ্রেণির নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্যে মোগলযুগোত্তর বাংলাদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে এ দেশের সাথে, এ দেশের ভাষা সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে, সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহের অন্ত রইল না। এর ফলে বাংলাভাষায় ধর্মচর্চা করাও তাদের পক্ষে হল অসম্ভব। এবং উনিশ শতকে ধর্মচর্চার ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের বাংলাভাষাকে বাদ দেয়াই হয়ে দাঁড়াল তাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক দৈন্যের অন্যতম মূল কারণ। হিন্দুদের সাথে এদিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা বিশেষভাবে তুলনীয়। মুসলমানদের থেকে ধর্মচর্চার তাড়না উনিশ শতকে হিন্দুদের মধ্যে কম ছিল না। উপরন্তু এক হিসাবে বেশিই ছিল। সে সময় হিন্দু সমাজে বহু ধর্মান্দোলনের উৎপত্তি এবং প্রসার হয়েছিল। হিন্দুদের সংস্কৃতিচর্চা এই

ধর্মান্দোলনের ফলে সমৃদ্ধ হল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হল না। এর প্রধান কারণ মুসলমানদের চিন্তা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে আবর্তিত হল আরব, ইরান, তুর্কির চতুর্দিকে– অনেকখানি যেমন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে।

মাত্র কিছুসংখ্যক ব্যতীত বাংলার সমস্ত মুসলমানেরই পূর্বপুরুষরা এ দেশের অধিবাসী এবং হিন্দু। কাজেই ধর্মীয় কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশকে পুরোপুরি স্বদেশ মনে না করার কোনো কারণ তাদের ছিল না। কিন্তু উচ্চশ্রেণির মুসলমানেরা নিজেদের সুবিধামতো একজাতিত্ব আবিষ্কার করে ক্রমাগত প্রচার করলেন যে, সৎ বংশগত মুসলমান মাত্রেরই পূর্বপুরুষ আরব, ইরান, তুর্কি থেকে আগত। এর ফলে মুসলমানরা নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হওয়া মাত্র সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বংশতালিকা রচনা করে সচেষ্ট হলেন নিজেদের বংশ-পরিচয় পরিবর্তনে। এ ভাবেই মুসলমানরা আত্মিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন পরবাসী হয়ে।

মুসলমানদের এই মানসিকতার পরিবর্তনের শুরু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এবং এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ভাষা-আন্দোলনে। পূর্বে উর্দু না জানলে কোনো মুসলমানই সৎবংশজাত বলে পরিচিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা স্বীকার করলেও তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হত। পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলমান 'মুসলমান বাঙালি'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করল এবং সমস্ত সংস্কার বর্জন করে, উর্দুকে নিজের ভাষা হিসেবে বাতিল করে, বাংলাকে স্বীকার করল মাতৃভাষা রূপে। এইভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের জীবনে সূত্রপাত হল এক অভূতপূর্ব চেতনার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানদের মনে যদি কোনো সত্যিকার বিপ্লব ঘটে থাকে তাহলে এই হল তার সঠিক পরিচয়।

মুসলমানদের যে দৃষ্টি দেশের প্রতি এতকাল ছিল মমতাহীন, সেই দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হল স্বদেশের প্রতি প্রেম ও মমতায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম তাই আসলে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম। যে মধ্যবিত্ত মুসলমান নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বিগ্ন হত, এর পর থেকে তার সে উদ্বেগের অবসান হতে শুরু হল। বাঙালি পরিচয়ে সে আর লজ্জিত হল না। যে চিত্ত ছিল পরবাসী, সে চিত্ত সচেষ্ট হল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। প্রতিকূল শক্তি এবং সংস্কার এ পরিবর্তনকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও ঘরে ফেরার এ সংগ্রাম রইল অব্যাহত এবং তারা জয় করে চলল একের পর এক ভূমি। স্বীকৃত হল রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য; স্বীকৃত হল রবীন্দ্রনাথ এবং পহেলা বৈশাখ। এ স্বীকৃতির কোনো কোনোটি এল সরকারি

ঘোষণাপত্রে, কিন্তু তার সত্যিকার ক্ষেত্র হল পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমান মধ্যবিত্তের বিস্তীর্ণ মানসলোকে। এ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে তাই নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

[লেখক: সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক ও তাত্ত্বিক।]

প্র ব ন্ধ

উনিশ শতকের মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধারা

সা লা হ্ উ দ্দী ন আ হ্ ম দ

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালির মানসভুবনে প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় সেটা 'বেঙ্গল রেনেসাঁ' বা বাংলার নবজাগরণ নামে খ্যাত। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, এই আন্দোলনের ফলেই এই উপমহাদেশের আধুনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থাৎ লোকায়ত মানসিকতার উন্মেষ ঘটেছিল। এই বিষয়টির ওপর গত প্রায় চার/ পাঁচ দশকে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে এই রেনেসাঁর চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষ করে মার্কসীয় ঐতিহাসিক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁদের মূল বক্তব্য হল : ১. উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁ মুষ্টিমেয় নগরবাসী, অর্থাৎ কেবল হিন্দু সমাজের উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির 'ভদ্রলোক'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এর প্রভাব পরিলক্ষিত

হয়নি। ২. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের কোনো ভূমিকাই ছিল না এবং এই আন্দোলনের অনুসারীরা ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছিলেন এবং ৩. মুসলমান সমাজের কোনো অংশই এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল না।[১] এই বক্তব্যের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, চিন্তাজগতের ইতিহাসে যুগে যুগে সমাজের কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নব নব চিন্তার ধারক ও বাহক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নতুন, প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁদের সময়ে কখনই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এইসব চিন্তানায়কের মানবসমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার রেনেসাঁ যুগের নেতাদের ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা প্রসঙ্গে এইটুকু বলা যায় যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের মধ্যযুগীয় স্বৈরাচার ও সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আধুনিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষের সূচনা এই উপমহাদেশের ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল, যদিও সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি। কার্ল মার্কস নিজে ১৮৫৩ সালে তাঁর একটি রচনায় স্বীকার করেছেন যে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতের জনগণ নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে বটে, কিন্তু তবু ইংরেজ শাসন ভারতে সমাজবিপ্লব আনতে সাহায্য করেছে। তাঁর মতে, ইংরেজরা এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ইতিহাসের অবচেতন যন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে।[২]

রেনেসাঁ যুগের মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন মুসলমান সমাজকে একেবারে প্রভাবিত করতে পারেনি এবং রক্ষণশীল, পশ্চাৎমুখী মনোভাব ও ধর্মান্ধতা গোটা মুসলমান সমাজের প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল– এই ধারণা আমরা এতদিন পর্যন্ত পোষণ করে এসেছি। এই ধারণা যেসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম উইলসন হান্টারের *The Indian Musalmans* গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সিভিলিয়ান হান্টার মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই গ্রন্থটিতে যেসব ঢালাও মন্তব্য করেছেন সেগুলো অধিকাংশ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলেও অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবী তাঁর মতামতকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করে এসেছেন।[৩] অন্যান্য যেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উনিশ শতকের মুসলমানদের রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে ধারণা করা হয়, সেগুলো সবই ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, উনিশ শতকের বিশেষ করে ওই শতকের প্রথমদিকে মুসলমান অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণির ভাষা ছিল ফারসি। ফারসি যে কেবল মুসলমানরা চর্চা

করতেন তা নয়। সেকালে হিন্দুরাও অতি আগ্রহের সঙ্গে ফারসি ভাষা শিখতেন। রাজা রামমোহন রায় নিজে ফারসি ও আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮০৩-১৮০৪ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ *'তুহফাতুল মুওয়াহহীদীন'* আরবি শিরোনাম ও ভূমিকাসহ ফারসি ভাষায় রচিত। ১৮২২ সালে তিনি *'মীরাতুল আখবার'* নামে একটি ফারসি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। খুব সম্ভব ফারসি ভাষায় এটাই প্রথম সংবাদপত্র।

১৮৩১ সালে লন্ডনে অবস্থানকালে পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ কমিটির কাছে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদানকালে রামমোহন বলেছিলেন : 'The Musalmans, as well as the more respectable classes of Hindus chiefly, cultivated Persian literature, a great number of the former and a few of the latter also extending their studies to Arabic.'[৪] মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত কোম্পানির রাজত্বে ফারসি ভাষা সরকারি মর্যাদা পেয়ে এসেছিল। সুতরাং উনিশ শতকের বিশেষ করে ওই শতকের প্রথম দিকের মুসলমান অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণির মানসভুবনের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে ফারসি ভাষায় রচিত বিবিধ তথ্য সম্বন্ধে জানা একান্ত প্রয়োজন। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। এগুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং যত্ন ও আগ্রহের অভাবে এগুলো বিনষ্ট হতে চলেছে। আনন্দের বিষয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ উনিশ শতকে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ফারসি ভাষায় রচিত কিছু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সন্ধান পেয়েছেন।[৫] এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি উনিশ শতকের মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এগুলো বিশ্লেষণ করলে, উনিশ শতকের মুসলিম সমাজচিন্তা সম্বন্ধে আমরা এতদিন যে ধারণা পোষণ করে এসেছি, সেটা পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এমনি একটি তথ্য নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। অবশ্য তার আগে বিষয়টির ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

দুই

আঠার শতকের শেষ নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশ এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। মোগল কেন্দ্রীয় শক্তির পতনের ফলে যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো সেই রাষ্ট্রীয় শক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সেটাতে ভাঙন দেখা দিল। সেই ভাঙন থেকে ভাবনার জগৎও রেহাই পায়নি। এই ভাঙনের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সে যুগের অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে গতানুগতিক ধর্মীয় ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন, এমনকি

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার প্রবণতা তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মোগল আমলে সমাজের নেতৃত্ব ছিল সামরিক শক্তিপুষ্ট সামন্তশ্রেণির হাতে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইউরোপীয় বণিকদের সহযোগিতা লাভ করে এ দেশে এক নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়। এই শ্রেণি এবং ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট নয়া জমিদার শ্রেণি উভয়েই সমাজের নেতৃত্বের স্থান দখল করে নেয়। এইভাবে ব্রিটিশ আমলের নয়া অভিজাত শ্রেণির আবির্ভাব হয়। এই শ্রেণির বিশেষ করে যে অংশটি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা একদিকে যেমন ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তি পাশ্চাত্য জগতের চিন্তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নয়া শাসকদের রাজধানী কলকাতার উন্মুক্ত পরিবেশে নানা ধরনের চিন্তার সমাবেশ, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছিল। বিশেষ করে সমাজ ও ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসা এবং পরমতসহিষ্ণুতা ছিল সে যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সেকালের পণ্ডিতসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'দাবিস্তান-ই-মজাহিব' নামক একটি গ্রন্থ, যার রচয়িতা ছিলেন সতের শতকের একজন অগ্নি-উপাসক পারসিক পণ্ডিত, সে সময়ের বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করে। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন এটাকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৭৯৭ সালে গ্রন্থটি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কারও কারও মতে, এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রামমোহন রায় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুওয়াহীদীন' রচনা করেছিলেন।

এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের বাংলায় সমাজচিন্তার স্বরূপ মোটামুটি চিহ্নিত করা যায়। সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ধারাকে মোটামুটি চিহ্নিত করা যায়।[৬] প্রথম ধারাটিকে রক্ষণশীল ধারা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এর ধারক ও বাহক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ঐতিহ্যিক বা গতানুগতিক ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা সংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাজচিন্তায় এই রক্ষণশীল ধারা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য রক্ষণশীল হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ কিছুটা ব্যস্তমুখী। সুদীর্ঘ মুসলমান আমলে যখন রাজভাষা ছিল ফারসি, সে সময় হিন্দুরা বিনা দ্বিধায় ওই ভাষা আয়ত্ত করে মুসলমান সরকারের অধীনে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে সত্য; কিন্তু তারা কখনও প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন বোধ করেননি। হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ প্রথা ও নানাবিধ অলঙ্ঘনীয় লোকাচার থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মীয় ও সমাজচিন্তায় এমন একটি নমনীয়

ও উন্মুক্ত দিক আছে, যেটা হিন্দু ধর্মকে দিয়েছে তার অন্তর্নিহিত শক্তি, যার ফলে হিন্দু ধর্ম যুগ-যুগান্তকাল ধরে যেকোনো হুমকিকে প্রতিহত করে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, মুসলিম আমলে হিন্দুরা বিনা দ্বিধায় মুসলিম আমলের রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি চর্চা করে মুসলিম শাসকদের অধীনে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করেছিল। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর নতুন শাসকদের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করতে তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি এবং বাস্তব কারণে তারা নয়া শাসকদের ভাষা ইংরেজি শেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ১৮১৬ সালে কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় হিন্দু কতিপয় ইংরেজ ব্যবসায়ী ও আমলার সহযোগিতায় ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ে হিন্দু যুবকদের শিক্ষাদানের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা এতটুকু কমেনি। অন্যদিকে, মুসলিম রক্ষণশীলতার চরিত্র ছিল ভিন্ন। এর মধ্যে দুটো পরস্পর-বিরোধী ধারা দেখা যায়। প্রথমটি ছিল সনাতনপন্থী ও পশ্চাৎমুখী ধারা, যার অনুসারীরা তৎকালীন গোটা মুসলমান সমাজকে হযরত মুহম্মদ ও খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। অর্থাৎ তাঁদের লক্ষ্য ছিল সাত শতকে আরব দেশে মহানবীর আমলে যেসব ইসলামি আচার-অনুশীলন প্রচলিত ছিল তার ভিত্তিতে উনিশ শতকের মুসলিম সমাজকে পুনর্বিন্যাস করা। এই রোমান্টিক মানসিকতা যুগে যুগে মুসলিম সমাজের কিছু অংশকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে এসেছে। মুসলিম রক্ষণশীলতার আর একটি ধারা ছিল কিছুটা বাস্তববাদী এবং মধ্যপন্থী। এই ধারাকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের হিন্দু রক্ষণশীলতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। হিন্দু সমাজের এই ধারার বাহক ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) প্রমুখ নেতা, যাঁরা ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান লাভ করে বিদেশি ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। কিন্তু নেহাৎ জাগতিক কারণে পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলেও তাঁর পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সনাতন হিন্দু ধর্মীয় ও সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের যেকোনো প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করে এসেছেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস্তব প্রয়োজনের স্বার্থে রাধাকান্ত দেব যেমন হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসাহী ছিলেন, ঠিক তেমনি একই কারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৭) প্রমুখ মুসলিম নেতা মুসলমানদের ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য উৎসাহী করেছিলেন। কিন্তু রাধাকান্ত দেব ও আবদুল লতিফ উভয়েই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক উদারনৈতিক চিন্তাধারার

ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজি ভাষা নেহাৎ জাগতিক কারণে অপরিহার্য বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তাধারা ও মুল্যবোধ এ দেশের জীবন ও জনমতকে প্রভাবিত করুক এটা তাঁরা কখনই বরদাশত করতে পারেননি। কিন্তু এ মনোভাব ছিল একেবারে অযৌক্তিক ও অবাস্তব। ইংরেজি ভাষা শিখে তার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া কোনো মতেই সম্ভবপর ছিল না। বস্তুত কালক্রমে বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান যাঁরা ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তাঁরা সমকালীন পাশ্চাত্য উদারনৈতিক মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এই শ্রেণির লোকেরাই উনিশ শতকের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এঁরাই আমাদের সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারার প্রতিভূ। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু সমাজে যেমন এই সংস্কারপন্থী ধারার বাহক ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), তেমনি ওই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে ওই ধারার বাহক ছিলেন উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ও বাংলায় সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)। রামমোহনের আন্দোলন যেমন ছিল সমকালীন যুগের চ্যালেঞ্জ ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন হিন্দু সমাজে সংস্কার আনয়ন করে এই সমাজকে পুনর্গঠন করা; তেমনি সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী ও মুসলিম আধুনিকতাবাদীরা উনিশ শতকে উদারনৈতিক চিন্তার আলোকে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছিলেন।

সমাজচিন্তার ক্ষেত্রের তৃতীয় ধারাকে যুক্তিবাদী ও আমূল সংস্কারকামী ধারা বলে চিহ্নিত করা যায়। এর নিদর্শন উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাংলার রেনেসাঁ যুগে দেখতে পাই। এটা সর্বজনবিদিত যে, হিন্দু সমাজে এই ধারার প্রধান প্রবর্তক ছিলেন কলকাতা হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ইউরেশীয় শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) এবং তাঁর শিষ্যম-লী। তাঁরা ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শনের দ্বারা এত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু ধর্ম তথা যেকোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। রামমোহন রায়, ডিরোজিও এবং উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁ সম্বন্ধে গত চার-পাঁচ দশকে বিস্তর লেখা হয়েছে। সুতরাং এই মুহূর্তে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না।

ইসলামি ধর্মবিশ্বাসকে অনমনীয় বলে মনে হলেও মুসলিম ভাবজগতে যুক্তিবাদের কিছুটা স্থান সবসময় ছিল। খুব সম্ভব এর প্রথম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় নয় শতকের আরব দেশে মুতাযিলা মতবাদের মধ্যে। মুতাযিলা দার্শনিকেরা প্রাচীন গ্রিক যুক্তিবাদী দর্শন, বিশেষ করে এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা দ্বারা

গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ধর্মবিশ্বাসকে কিভাবে যুক্তির সঙ্গে সমন্বিত করা যায়– এই চিরন্তন প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সনাতন ইসলামের গোঁড়া সমর্থকদের তীব্র বিরোধিতার মুখে চিন্তা ক্ষেত্রে এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও এই ধারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এবং মুসলিম মনোজাগতিক ঐতিহ্যে এর একটা বিশিষ্ট স্থান সবসময় রয়ে গেছে। উনিশ শতকের উদারনৈতিক পরিবেশে এই যুক্তিবাদী ধারাটি যেন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে আমরা এমন একজন যুক্তিবাদী চিন্তানায়কের সন্ধান পেয়েছি যিনি উনিশ শতকের একজন বিস্ময়কর ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম আবদুর রহীম (অনুমান ১৭৮৫-১৮৫৩)। এই অসাধারণ পণ্ডিত এবং প্রতিভাবান পুরুষ সম্বন্ধে আমার প্রথম কৌতূহল জেগেছিল আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে লন্ডনে গবেষণায় নিয়োজিত থাকাকালে। ইন্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি নথিপত্র দেখতে গিয়ে হঠাৎ কলকাতার গভর্নর জেনারেল দফতর থেকে ২৭ জানুয়ারি ১৮২৬ তারিখে লেখা একটি চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওই চিঠিতে এ দেশে কোম্পানির সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে ইংরেজি রচনাবলি আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করার প্রয়োজন। এই কাজের জন্য আবদুর রহীম নামে একজন মুসলমান পণ্ডিত যিনি ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, তাঁকে নিযুক্ত করার কথাও ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।[৭]

এই তথ্যটি জানার পর থেকেই আবদুর রহীম সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান করার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে পড়ি। কিন্তু চেষ্টা করেও এ বিষয়ে আশানুরূপ তথ্য পাইনি। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ'র সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি উনিশ শতকের প্রথম দিকে জনৈক আবদুর রহীম রচিত ফারসি ভাষায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপির খোঁজ পেয়েছিলেন। আরও জানা গেল যে, এই রচনাটি আত্মজীবনীমূলক এবং এতে লেখকের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি নিশ্চিত হলাম যে, এই সেই আবদুর রহীম যাঁর কথা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমি অধ্যাপক হবিবুল্লাহকে জানালাম তিনি যদি এই পাণ্ডুলিপিটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করতেন, তাহলে উনিশ শতকের সমাজচিন্তার এক অজানা দিক সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারতাম। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও নানাবিধ অসুবিধার জন্য তাঁর পক্ষে এ কাজটি করা সম্ভব হয়নি। তিনি অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগে লেখা একটি প্রবন্ধে আবদুর রহীম সম্বন্ধে কিছু তথ্য সরবরাহ

করেছেন যা সত্যিই চমকপ্রদ। আবদুর রহীম নাকি দিল্লিতে থাকাকালীন ভারতে ওহাবি আন্দোলনের নেতা রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদের সহপাঠী ছিলেন। অধ্যাপক হবিবুল্লাহ'র ভাষায়, "দিল্লিতে শিক্ষা শেষ করে তিনি (আবদুর রহীম) কলিকাতায় এসে খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি ও ইহুদি শাস্ত্রসমূহ অধ্যায়ন করেন। ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিনও শিখেছিলেন এবং পরে ইসলামে বিশ্বাস হারিয়ে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে থাকেন। এই নামেই তিনি তখন থেকে পরিচিত। ১৮২০ সালে ওহাবি আন্দোলনের নেতা রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ যখন কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁর পুরাতন সহপাঠীকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর সাথে দেখা করতে চেষ্টা করেন। আবদুর রহীম দেখা করেননি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর মত পরিবর্তন করেননি।"[৮] সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ আবদুর রহীমের রচিত পা-ুলিপিটি সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে জমা দিয়েছেন। তিনি তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ *'বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য'* এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে পেশকৃত গবেষণামূলক নিবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গে ফারসি সাহিত্য'–এ দুটি রচনায় আবদুর রহীম সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন, যাতে আবদুর রহীমের ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।[৯]

যেসব সূত্র থেকে আবদুর রহীমের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন সম্পর্ক জানা যায়, এর মধ্যে তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক একটি রচনা উল্লেখযোগ্য। জানা যায়, তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় আরবি ও ফারসি ভাষা আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে। সনাতন পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করলেও ক্রমশই তাঁর কৌতূহল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কবিতার প্রতিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে জানা যায়। তাঁর অধিকাংশ রচনা ফারসি ভাষা হলেও আরবিতেও তাঁর কিছু অনুবাদের কাজ রয়েছে।[১০]

১৮০৪ সালে আবদুর রহীম উচ্চশিক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌ শহরে যান এবং ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। ওখানকার বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে তাঁর মানসভুবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। সেখানে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যে বিবাদ হত তাতে তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। লক্ষ্ণৌতে এক বছর থাকার পর তিনি দিল্লি চলে যান এবং সেখানে শাহ আবদুল আজিজ ও তাঁর ভ্রাতা মোল্লা রফীউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করেন। এছাড়াও দিল্লিতে অবস্থানকালে তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করেন।

প্রথমদিকে গভীর ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী হলেও এসব গ্রন্থ পাঠের পর তাঁর মন থেকে সব রকম ধর্মবিশ্বাস অন্তর্হিত হয়ে যায়। পূর্বেকার ধর্মমত ও কুসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে তিনি মুক্তচিন্তার ধারক ও যুক্তিবাদী হয়ে পড়েন।[১১] তাঁর মতে পরমেশ্বর বা আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা ইমাম বা ধর্মগুরুদের দ্বারা সৃষ্ট। তিনি বিশ্বজগতের সার্বিক বা প্রাকৃতিক বিধানে বিশ্বাস করতেন। এই ব্যতিক্রমধর্মী মত পোষণের জন্য আবদুর রহীমকে তাঁর সমসাময়িকরা 'দাহরী'[১২] নামে অভিহিত করেছিলেন। 'দাহরী' একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সময়ের অনুবর্তী, অর্থাৎ এমন একজন মুক্ত মানুষ যিনি কোনো অন্ধবিশ্বাসপ্রসূত সংস্কার বা ধর্মে বিশ্বাস করেন না। আবদুর রহীম মনে করতেন যে সূর্য হচ্ছে সকল সৃষ্টির উৎস।

আবদুর রহীমের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক এবং পণ্ডিত ওবায়দুল্লাহ্-আল-ওবায়দীর (১৮৩৪-১৮৮৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওবায়দুল্লাহ্র স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি এই মহান শিক্ষকের কাছে থেকে দর্শন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। মনে হয় আবদুর রহীমের মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদ ওবায়দুল্লাহকে কিছুটা অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর বন্ধু ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা রাজনারায়ণ বসু'র (১৮২৬-১৮৯৯) অনুরোধে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মতত্ত্বের ওপর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *'তুহফাতুল মুওয়াহীদীন'* যেটি আরবি ভূমিকাসহ ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছিল, তার ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন।[১৩] এই গ্রন্থে রামমোহন কেবল হিন্দুদের প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হননি, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে অলৌকিক কাহিনী ও অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেন। মৌলানা ওবায়দুল্লাহ-আল-ওবায়দী রামমোহনের একটি সপ্রতিভ বক্তব্যের এইরূপ তরজমা করেন : 'falsehood is common to all religions without distinction.'[১৪]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজচিন্তায় এক নয়া যুক্তিবাদী মতাদর্শের আবির্ভাব দেখা যায়। এই ধারাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে লোকায়ত ধারা বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই ধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩)। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় তাঁর জন্ম। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতা মাদ্রাসায়। ইংরেজি ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৬১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ.পাস করেন। সম্ভবত তিনিই এ উপমহাদেশের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট।[১৫]

দেলওয়ার হোসেনের চিন্তায় মৌলিকতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুসলমান সমাজের অনুশাসন ও বিধিকে যুগের প্রয়োজনের তাগিদে আমূল পরিবর্তনের দাবি করেছিলেন। সমকালীন ইউরোপের যুক্তিবাদী দর্শন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি বিশেষ করে জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট

স্পেন্সারের রচনাগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে বৈজ্ঞানিক ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, মুসলমানদের অবনতির কারণসমূহ তাদের নিজেদের অতীত ইতিহাস, তাদের আইন-অনুশাসন এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এদিক দিয়ে দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর সমকালীন বাংলার অপর দুই নেতা– নবাব আবদুল লতিফ নেহাৎ বাস্তব প্রয়োজনে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল। এছাড়াও তিনি ছিলেন জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলীর পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি পরোক্ষভাবে মোল্লাদের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতাকে সবসময় সমর্থন করেছেন। তাঁরই জোর তদবিরের ফলে এ দেশে মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে তুলে না দিয়ে বরং সম্প্রসারণ করা হয়। আবদুল লতিফ মুসলমানদের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির সঙ্গে আপোস করতে চেয়েছিলেন, সেগুলো দূর করার জন্য কোনো চেষ্টা করেননি। তুলনামূলকভাবে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন চিন্তার ক্ষেত্রে অনেকটা প্রগতিশীল এবং সংস্কারপন্থী। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দিয়ে মুসলমানদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে সম্পূর্ণ আধুনিক ও কারিগরি বিদ্যাশিক্ষা প্রণয়নের জন্য তিনি সুপারিশ করেছিলেন। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি প্রগতিশীল ও সংস্কারপন্থী ছিলেন এই অর্থে যে, অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা ইসলামকে গ্রহণ না করে তিনি যুক্তির আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের মর্মবাণী গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। আমীর আলী ঊনবিংশ শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবাদের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির জন্য ইসলামের কোন কোন অনুশাসন ও বিধি পরিবর্তন বা বর্জন করা উচিত এ সম্বন্ধে আমীর আলী কোনো কিছু পরিষ্কারভাবে বলেননি বা লেখার সাহস করেননি। বস্তুত তাঁর চিন্তার মধ্যে বেশ কিছুটা স্ববিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়। তুর্কি খেলাফতের মতো একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার জন্য তিনি নব্য তুরস্কের স্রষ্টা কামাল আতাতুর্কের কাছে ওকালতি করতে দ্বিধা করেননি, যদিও এতে কোনো ফল হয়নি।

অন্যদিকে, দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারা ছিল স্বচ্ছ, বস্তুনিষ্ঠ এবং কিছুটা বৈপ্লবিক। তিনি নিজেকে মুতাজিলাপন্থী, যুক্তিবাদী দার্শনিকদের উত্তরসূরি বলে মনে করতেন। দেলওয়ার হোসেনই খুব সম্ভব প্রথম আধুনিক মুসলিম চিন্তানায়ক, যিনি ইসলামের কোনো কোনো অনুশাসন ও বিধি, বিশেষ করে যেগুলো ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, সেগুলো যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তন এমনকি বর্জন করার কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা স্থিতিশীল ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় : 'There is no real connection between religion and the laws, social,

civil and political under which a community lives. Religious truths transecend the powers of human understanding. While laws being phenomenal relations are amenable to experience'.[১৬] দেলওয়ার হোসেনের মতে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের একত্রীকরণ মুসলমান সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। তাঁর ধারণা মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার অভাবের ফলেই তারা আধুনিক জ্ঞানভা-ারকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি।

দেলওয়ার হোসেন আধুনিক লোকায়ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সুপারিশ করেছিলেন। সেজন্য তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করেননি। আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হত সেটা তাঁর ভাষায়, 'Utterly unsuited to the times and it was mere waste of means to supply people with what has no present value and will be of no future use'.[১৭] তিনি কলকাতা ও হুগলি মাদ্রাসা তুলে দিয়ে মুসলমানদের জন্য ইংরেজি স্কুল স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

দেলওয়ার হোসেনের সময়ে বাংলার মুসলমান সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল মুষ্টিমেয় নগরবাসী অভিজাত শ্রেণি। এই শ্রেণির অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী– বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর। তাঁরা নিজেদের বাঙালি বলে স্বীকার করতেন না এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের ছিল অপরিসীম অশ্রদ্ধা। অন্যদিকে ছিল গ্রামবাংলার দরিদ্র জনসাধারণ– তারা ছিল বাংলা ভাষাভাষী এবং অধিকাংশই কৃষক শ্রেণিভুক্ত। অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না বলা চলে। ফলে তারা অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ ও গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এদের মধ্যেই ছিল গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ। এইসব গ্রামীণ নেতারা জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে সবসময় তাদের পাশে থেকে তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছেন।

দেলওয়ার হোসেনের মতে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম অভিজাত শ্রেণির অবজ্ঞা এবং ইংরেজি ভাষা শিখতে মুসলমান জনসাধারণের অনীহা বাংলার মুসলমানদের অনগ্রসরতার মূল কারণ। তাই তিনি বাংলার মুসলমানদের বাংলা শেখা অপরিহার্য সে কথা জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত করা যেতে পারে, কারণ তাদের সকলের পক্ষে ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। তিনি সুপারিশ করেন যে, দর্শন, বিজ্ঞান ও মানববিদ্যা বিষয়ক ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা উচিত। এবং তাঁর মতে এই অনুবাদকর্মের দায়িত্ব নিতে হবে এ দেশেরই ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিদের।

দেলওয়ার হোসেন বহুবিবাহ এবং পর্দাপ্রথা বিলুপ্ত করার আহ্বান জানান। তিনি মুসলিম পারিবারিক আইনও আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী সংশোধন করার

পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ঋণের ওপর সুদ দেয়ার বিরুদ্ধে ইসলামের বিধিনিষেধ সমর্থন করেননি, কারণ এর ফলে মুসলমান সমাজে পুঁজির বিকাশ ব্যাহত হবে বলে তিনি মনে করতেন।

দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারা সমকালীন মুসলমান সমাজে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি। তৎকালীন শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। যেহেতু তিনি কেবল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাঁর ভাবধারা প্রকাশ করতেন, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ তাঁর মতামতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হতে পারেননি। খুব সম্ভব এ কারণেই তিনি আজও আমাদের কাছে অবহেলিত। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে এমন বলিষ্ঠতা ছিল, যেটা আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আজকের দিনেও আমাদের মধ্যে ক'জন ব্যক্তি আছেন যাঁরা জোর গলায় বলতে পারবেন, যেমন দেলওয়ার হোসেন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বলেছিলেন, 'It is the duty of every man of intelligence and knowledge to seek truth, and when he finds it, it is his duty to proclaim it.'[১৮]

উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিন্তাকে কোনো একটি বিশেষ ধারা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে আমাদের মানসভুবন ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সঞ্জীবিত করেছে। যুগে যুগে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে তার অস্তিত্ব ও জীবন সম্বন্ধে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, পুরাতন সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছে। উনিশ শতকটা ছিল সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের স্বর্ণযুগ এ অর্থে যে, সে যুগের সমাজে সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা সত্য যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এ সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। সেকালের সমাজ ছিল অলঙ্ঘনীয় আচার-অনুশাসনে জর্জরিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তাক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল সে যুগের আশ্চর্য ব্যতিক্রম। আব্দুর রহীম, রামমোহন রায়, ডিরোজিও এবং দেলওয়ার হোসেন– এঁরা সবাই ছিলেন সেকালের ব্যতিক্রমধর্মী মহাপুরুষ। তবে সমকালীন সমাজে এঁরা কেউ জনপ্রিয় ছিলেন না। একটা সমাজ কতখানি উন্নত ও সভ্য সেটা নির্ধারণ করা যায় সেই সমাজে ভিন্নমত প্রকাশ করার অধিকার ও স্বাধীনতা কতখানি রয়েছে তা দিয়ে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, চিন্তার ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো কথাই তো শেষ কথা নয়। প্রচলিত মত ও প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য আজ যাঁকে সমাজচ্যুত করা হল, আগামীকালই হয়তো তাঁকে সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে– ইতিহাসে এরকম বহু নজির দেখা যায়। এ কথারই প্রতিধ্বনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গানে শুনতে পাই :

যে তোরে গাগল বলে

তারে তুই বলিস নে কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আসবেরে তোর পিছু পিছু।

তথ্য নির্দেশ

১. Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, (Calcutta, Papyrus, 1979);
সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, (কলিকাতা, ডিএনবিএ ১৯৬৭); বদরুদ্দীন উমর, *বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ*, (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০);

২. Marx and Engels, *Selected Works* (Moscow, 1962), Vol. I, p351.

৩. হান্টারের বক্তব্যের প্রতিপাদ্য ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার মুসলমানদের অবনতির মূল কারণ। তাঁর মতে এর ফলে মুসলমান জমিদাররা তাঁদের জমিদারি হারান; সেগুলো হিন্দুদের হাতে চলে যায়। পরে তাঁদের হাতে যেসব লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল সেগুলো ইংরেজ নীতির ফলে তাঁদের হারাতে হয়। যেহেতু ভূসম্পত্তি ছিল মুসলমান অভিজাত শ্রেণির আয়ের প্রধান উৎস, এগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু এই ধারণার পেছনে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। হান্টার নাকি মাত্র পনের দিনের মধ্যে এই বইটি লেখা শেষ করেন। বইটিতে তথ্যবিহীন অনেক ঢালাও মন্তব্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন– A.F. Salahuddin Ahmed, *'Muslim Thought and Leadership in Bengal in the Nineteenth Century'*. B. De and others (eds.), *Essays in Honour of prof. S.C. Sarkar*, Delhi, Peoples Publishing House, 1976.

৪. Written evidence of Rammohan Roy on the condition of India before Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, *Parliamentary Papers*, House of Commons, 1831, V : 320 A. 739-41.

৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩); মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পশ্চিমবঙ্গে ফারসী সাহিত্য ঢাকা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮৪।

৬. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখতে পারেন– A.F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and *Social Change in Bengal 1818-1835* (Leiden E.J. Brill 1965; 2nd ed. Rddhi, Calcutta, 1976) এবং

Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, Calcutta, Papyrus 1979.

৭. A.F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*,p. 141.

৮. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, ১২৯ ।

৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত ।

১০.আবদুর রহীম রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকের সন্ধান ড. আবদুল্লাহ দিয়েছেন :

ক. *ফারহাঙী দাবিস্তান* : ফারসি ব্যাকরণের ওপর একটি বই ।

খ. *পান্দনামা-ই-বাহরাম* : যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক ফারসি পুস্তক । এটি ১৮৬০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল ।

গ. *তওয়ারিখে হিন্দুস্তান* : J.C. Marshman, *History of India*, ফারসি তর্জমা ।

ঘ. *কারনামা এ হায়দারী* : এটি হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের জীবনী ও কর্মকা-ের ওপর রচিত ঐতিহাসিক বই । ১৮৪৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ।

ঙ. *মাশরিকুল আনওয়ার* : জন গে রচিত রূপকথার ওপর ইংরেজি পুস্তকের ফারসি তর্জমা ।

চ. *হিকায়ত-ই-ইবরাত আয়াত* : লোকমান হাকিমের গল্পের ওপর ইংরেজি বই থেকে ফারসি অনুবাদ । ১৮৩০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ।

ছ. Aesop's Fable-এর ফারসি অনুবাদ । ১৮৩০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ।

জ. *ফাতিহাতুল তারজ্জমা* : Encyclopaedia Britannica থেকে অঙ্কশাস্ত্র বীজগণিত-এর ওপর প্রবন্ধাদির আরবি ভাষায় অনুবাদ ।

ঝ. শিদ্রাফ বায়ান ইবরাত তওয়ামান : এটি খুব সম্ভব আবদুর রহীমের সবচেয়ে মূল্যবান বই । এটি আত্মজীবনীমূলক রচনা । এটিতে লেখক তাঁর চিন্তার বিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে

তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান থেকে কালক্রমে একজন সংশয়বাদী নাস্তিকে পরিণত হয়েছিলেন। এই পুস্তকের প্রথম অংশে দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটির নাম আফসানা-ই-দেরীনে-রোজগার নামজাদ নাম এ নীগার : এটিতে লেখকের ৩৮ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *পশ্চিমবঙ্গে ফারসী সাহিত্য*, পৃ. ১২।

১২. ঐ, পৃ. ১৪।

১৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য*, পৃ. ১৪৫।

১৪. Rammmohan Roy, *Tuhfatul Muwahhiddin or A Gift to Deists*; reprint, Calcutta, *The Nineteenth Century Studies*, Vol. 1, No.1 1973, pp 1-2. Deist-এর অর্থ হল প্রচলিত কোনো ধর্মমতে বিশ্বাসী না হয়েও কেবলমাত্র যুক্তির আলোকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস।

১৫. দেলওয়ার হোসেনের জীবনী ও রচনাবলির জন্য দেখুন Sultan Jahan Salik (ed.) *Muslim Modernism in Bengal : Selected Writings of Delwar Hossain Ahmed Meerza* 1840-1913 (Dhaka, Centre for Social Studies, 1980)

১৬. ঐ, পৃ. ১৩।

১৭. ঐ, পৃ. ১৫।

১৮. *The Mussalman* (Calcutta), 11 August, 1911, quoted in Sultan Jahan Salik, op.cit.,p.ix.

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, স্মারক গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত

উৎস : গ্রন্থ: ইতিহাসের সন্ধানে, প্রকাশনী: সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশকাল: তৃতীয় মুদ্রণ: মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[লেখক: প্রক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষক ও প্রাবন্ধিক।]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান খুবই নবাগত। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও শিক্ষিত শ্রেণির সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফার্সি, নয়ত উর্দু। আলাওল, দৌলত উজির বা বৈষ্ণব পদ রচয়িতা মধ্যযুগের মুসলমান কবি ও সাধকদের অনুসৃত কোনও সাহিত্যিক ঐতিহ্য বা tradition শ্রেণিনির্বিশেষে ব্যাপকভাবে বাঙলার মুসলিম সমাজে বিস্তারলাভ করেনি এবং এ সন্দেহও হয় যে, উত্তরকালে তাঁদের রচিত সাহিত্যের রস গ্রহণ নিম্নশ্রেণির গ্রাম্য চাষি মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এ-কথাও ভুল নয় যে, মধ্যযুগের মুসলমান রচিত কাব্য-উপন্যাসে যে মননশীলতার পরিচয় পাই তার সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' ইসলামি ভাবের আত্মীয়তা কম, অনূদিত মূল আখ্যানবস্তু বাদ দিলে, [আখ্যান ভাগও মূলত ইসলামি নয়, ইরানের কিম্বদন্তি ও লোকগাথারই একটি মুসলমানি ঢং মাত্র; আর *পদ্মাবতী* তো ভক্তিরসাশ্রিত একটি হিন্দুরূপক] তার রস, প্রকাশভঙ্গি ও ভাবসম্পদ সমস্তই বাঙালি, হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ মধ্যযুগের বাংলা কাব্য থেকে তা অভিন্ন। সুতরাং এ-কথা বলা চলে যে, বাঙলা সাহিত্যে "ঐসলামিকতার" (অর্থাৎ মুসলমানি ভাব নিয়ে মুসলমানের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির) ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক। ধর্মীয় বাঁধন (Religious moorings) কাটাতে হিন্দুর সাহিত্যকে যে বিভিন্ন অবস্থা ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে, মুসলমানের ভাষাকে তা করতে হয়নি। সে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অনেকগুলো স্তর ডিঙিয়ে একেবারে পার্থিব ও সাংসারিক সাহিত্য নিয়ে আবির্ভূত হল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যুগের লোকধর্মের প্রাণবান প্রকাশ হিন্দুর সাহিত্যের প্রতিপদে যে শক্তি দান করে এসেছে, সে শক্তি থেকে আজকের মুসলমান সাহিত্য বঞ্চিত; কারণ, মুসলমানের ধর্মাচরণের, এমনকি লোকধর্মের ভাষাও কোনো কালেই বাঙলা ছিল না। ইসলামি সংস্কৃতির ভাষার সাথে বাঙালি মুসলমানের সাক্ষাৎ যোগ না থাকায় এখানে ইসলামি ভাবধারায় পুষ্ট সজীব লোকসাহিত্য গড়ে ওঠবার সুযোগও পায়নি। উত্তর ভারতে ফার্সির উত্তরাধিকারী উর্দুভাষী সমাজে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্যগত যোগ বিদ্যমান তা বাঙলায় রক্ষিত হয়নি। এখানে অভিজাত শ্রেণি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা পেয়েছে ফার্সি ও

উর্দুর ভিতর দিয়ে সিরাজ-ইস্পাহান-দিল্লি-লক্ষ্ণৌ থেকে, আর নিম্নশ্রেণির মানসলোক আবর্তিত হয়েছে বাঙলারই গ্রাম ও তার মুসলমান-অমুসলমান প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে। অভিজাতরা যেমন অ-বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আশ্রয় নিয়েছে, নিম্নশ্রেণি তেমনই সান্তনা খুঁজেছে তার অ-মুসলমান প্রতিবেশীর লোকধর্মের কাব্যে ও সংগীতে। এই ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দূর করার জন্যই হয়তো আরবি-ফার্সি জর্জরিত, রস-বিবর্জিত মুসলমানি পুঁথি সাহিত্যের জন্ম। কিন্তু বহির্ভারতীয় উপাদান নিয়ে বাঙালি জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আরবি-ফার্সি ভাব বাঙলার কাঠামোর ভিতর এনে অখ- বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতির গঠনের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। (এই পুঁথির সঙ্গে 'ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজামান' বা 'লায়লি-মজনু'র একটা ঐতিহাসিক যোগ আবিষ্কার করা হয়তো দুষ্কর নয়– কিন্তু তাতে এই কথারই সমর্থন মেলে যে মধ্যযুগেও এই সাহিত্য অভিজাত মুসলমান সমাজে কখনই সমাদর লাভ করেনি– এর পাঠক আজকের মতো তখনও ছিল গ্রামের কৃষক মুসলমান) উভয় শ্রেণির মধ্যে ঐক্যসাধন তো দূরের কথা, ধর্মনির্বিশেষে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে যে একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে উঠছিল তা সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস পর্যন্ত হল ব্যাহত। কাজেই একথা মানতে হয় যে, আধুনিক বাঙালি মুসলমান সাহিত্যের পিছনে শুধু ঐতিহ্যের অভাব আছে তাই নয়, সংস্কৃতিরও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নেই এবং সেই জন্যই এর আবির্ভাব একটু আকস্মিক। এই আকস্মিকতার মূলে যে অর্থনৈতিক ও বৈপ্লবিক শক্তি ক্রিয়াশীল এবং যে ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে এর জন্ম তার আলোচনা এখানে করা দরকার।

রাজনৈতিক আধিপত্যের যুগে বাঙলার মুসলমান শাসকশ্রেণি সর্বতোভাবে বাঙালি হতে পেরেছিল কিনা এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি যে একান্তভাবে নাগরিক ছিল, এ-কথা ইতিহাস পাঠকমাত্রই স্বীকার করবে। (এবং বাঙালি সংস্কৃতি যে একান্তভাবে গ্রামাশ্রিত একথা মেনে নিতেও গবেষণার আশ্রয় নিতে হয় না) শাসকশ্রেণির এই নাগরিক কৃষ্টি– যার ইসলামি চেহারা সুস্পষ্ট এবং যা ফার্সি ও উর্দুকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল– ইতিহাসের আনুকূল্যে বাঙালির মজ্জাগত হতে পারত কিনা সে আলোচনা বৃথা। কারণ, মুসলমানের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গেই সে সংস্কৃতির পরিণতিতে বাধা পড়ল। মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সময় থেকেই বাঙলার সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ক্ষীণ হয়ে পলাশীতে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এই সংস্কৃতির ধারাও রুদ্ধ হয়ে গেল। শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে মুসলমান অভিজাতরা যখন নগর ছেড়ে গ্রামে ও ইংরাজের ব্যবসাকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল, তখন থেকেই বাঙলায় মুসলমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা। ১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ

থেকে কলকাতায় রাজধানী উঠিয়ে আনার ফল সাত শতকে সারাসানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর আরবি নগর কুফা ও বস্‌রা স্থাপনের মতোই মুসলমান সংস্কৃতির পক্ষে সুদূরস্পর্শী হয়েছিল।

সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত উপর্যুপরি আঘাতের ফলে বাঙলার মুসলমান যে অধঃপতনের স্তরে গিয়ে পৌঁছল তার থেকে দুটো ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হল। গ্রামে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় মুসলমান সমাজের নেতাদের গ্রাম্য জীবনধারার সঙ্গে বাঙলার নিজস্ব সম্পদ তার কাব্য ও সংগীত, প্রেমভক্তিমূলক ধর্ম ও লোকসাহিত্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নিসর্গবৈচিত্র্য অতীন্দ্রিয় রহস্যসন্ধানী মন– সাক্ষাৎভাবে সর্বপ্রথম পরিচিত হবার সুযোগ হল। তার থেকে একদিকে যেমন নিম্নশ্রেণির গ্রাম্য মুসলমানের সঙ্গে অভিজাতদের একাত্মবোধ জন্মাল অন্যদিকে তেমনি বাঙালি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মুসলমান সংস্কৃতির ফার্সি চেহারা লুপ্ত হতে আরম্ভ করল। রাজশক্তি কর্তৃক ফার্সি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাওয়ায় শেষোক্ত পরিবর্তন আরও দ্রুততর হল। ফার্সির চর্চা একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও বাঙলার সাংস্কৃতিক উপাদানকে আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা এই সময়কার ফার্সি সাহিত্যে সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। *বিদ্যাসুন্দরের* মতো বাঙলার প্রচলিত লোককাহিনীর একাধিক ফার্সি অনুবাদই তার প্রমাণ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মুসলমান সংস্কৃতির বাঙালি হওয়ার এই প্রচেষ্টার পরিণতি হল এই যে বর্তমান শতকের গোড়ায় উত্তর ভারতের মুসলমানি উর্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে বাঙলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানের প্রতি বাঙালি মুসলমানের প্রচ্ছন্ন বৈরীভাব যাঁরা লক্ষ করেছেন তাঁরাই জানেন বাঙলা ও উত্তর ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির ব্যবধান আজকে কত বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। হালি বা ইকবালের কাব্যের প্রতি অনুরাগ যে খুবই সম্প্রতি জন্মেছে এবং তার মূলে যে রাজনৈতিক প্রেরণা আছে তা হয়তো না বললেও চলে।

এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাহায্য করল আর একটা সামাজিক বিপ্লব। উনিশ শতকের শেষের দিকে তার আরম্ভ এবং তার প্রাথমিক অবস্থা এখনও কাটেনি। সে হচ্ছে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবীর অভ্যুত্থান। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কেমন করে দ্রুতগতিতে শ্রেণিচ্যুত হয়ে গেল সে কাহিনীর উল্লেখ হয়তো নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রায় একশ' বছর ধরে বাঙলার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভিতর দিয়ে এসেছে, বাঙালি মুসলমানের জীবনে সে অবস্থা এসেছে মাত্র সেদিন– উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই সময়গত পার্থক্য ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্মেতিহাসের আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যা এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক পরিণতিকে স্বতন্ত্র করেছে। মুসলমান আমলে হিন্দুরা সে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্র শাসনে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে

নির্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরেজ আগমনের ফলে তা কিয়ৎ পরিমাণে আলোড়িত হলেও মূলত তা ধ্বংস হয়নি। ব্যবসায় বা শাসনক্ষেত্রে তারা শাসকশ্রেণির একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। এক যুদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিসাবে পণ্য বিতরণ, সরকারি চাকরি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং এর ফলে তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব রয়েছে অক্ষত। মুসলমানের বেলায় কিন্তু তা হয়নি।

যেহেতু যুদ্ধ ও শাসনকার্য ছাড়া অন্য জীবিকা তাদের ছিল না, সেজন্য নতুন শাসকশ্রেণির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। অবশ্য কৃষকশ্রেণির মধ্যে মুসলমানও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষক গ্রাম্য অমুসলমানেরই সমপর্যায়ভুক্ত। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠন যত সহজ হয়েছিল (কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের মধ্যে চিরকালই একটা-না-একটা ছিল) মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি তত সহজে ও তত দ্রুত তৈরি হতে পারেনি। কথাটা অত্যুক্তির মতো শোনালেও খুবই সত্য যে, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে উন্নতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হবার একটা মজ্জাগত ক্ষমতা আছে, মুসলমানের নেই এবং নেই বলেই এদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও এখনও সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠতে পারেনি। বাঙালি মুসলমান এখনও বুর্জোয়ার মতো পরিবর্তনবিমুখ বা আত্মপরিতৃপ্ত হয়ে ওঠেনি।

শাসকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা যে কারণে ভারতের মুসলমান গত শতাব্দীর শেষের দিকে পেয়েছিল এবং পাচ্ছে তা ভেঙে না বললেও চলে। যে সমাজবিবর্তন স্বাভাবিক গতিতে হতে পারত তার স্বপক্ষে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ক্রিয়াশীল হওয়াতে যেমন একদিকে এই নবগঠিত সমাজের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপ গোড়া থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল তেমনি এর সাংস্কৃতিক ঝোঁকও গেল বদলে। ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার গুণে রাজনীতির সঙ্গে এর সাংস্কৃতিক আদর্শও যে স্বাতন্ত্র্যপন্থী হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিও অবশ্য রাজশক্তির সমর্থন পেয়েছে, কিন্তু যে আর্থিক ও ঐতিহাসিক স্থায়িত্বের কথা উপরে বলেছি তার সাহায্যে বাঙলার গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে তাদের যোগ অব্যাহত ছিল– ফার্সির স্থান ইংরেজি দখল করলেও সেই যোগ ছিন্ন হয়ে যায়নি। কিন্তু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা ধ্বংস হয়ে গেছে; ইংরেজিয়ানার ভেতর দিয়ে সামাজিক আত্মোপলব্ধি হওয়াতে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশমান ধারা থেকেও সে চিরতরে সরে এসেছে; এমনকি বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে যে সংযোগ আরম্ভ হয়েছিল, উপরোক্ত রাজনৈতিক

স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে তা-ও থেমে গেল। *মহাভারত, ধর্মমঙ্গল*, পাঁচালি ও কবির গান ইত্যাদি বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের এই বিভিন্ন সাহিত্য রূপের কোনোটার সঙ্গেই যেমন অধুনা হিন্দুর অপরিচয় নেই, মুসলমানের ঠিক তেমন নয়। আজকের শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান যেমন একদিকে Mutannabi, Nizami, Amir Khusrau, বা Mir Ghalib-এর আরবি-ফার্সি, উর্দু কাব্যের সাথে মানসিক আত্মীয়তা অনুভব করতে অক্ষম, তেমনি অন্যদিকে *ময়নামতির গান* বা *সোনাভানের পুঁথি*ও তার প্রাণে আর সাড়া জাগাতে পারে না।

বাঙালি মুসলমানের এই সাহিত্যিক রেনেসাঁ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যুত্থানেরই নামান্তর এবং এর গোড়ায় যে রাজনীতি অনেকখানি ক্রিয়াশীল একথা মনে রাখলে আধুনিক মুসলমানের উপন্যাস ও গল্পের মূল সামাজিক ইঙ্গিত বোঝা সহজ হয়। মুসলমানের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'আনোয়ারা' থেকে আরম্ভ করে আবুল ফজলের 'চৌচির' পর্যন্ত প্রায় সবেরই সামাজিক পটভূমিকা হল গ্রামের দরিদ্র কৃষকশ্রেণি এবং যে সমাজের চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে এবং যার দিকে নায়ক এবং গ্রন্থকার উভয়েরই একটা সুস্পষ্ট টান বিদ্যমান, সে হচ্ছে এই ইংরেজিশিক্ষিত চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। গল্পের পাত্র-পাত্রী এই সমাজের মধ্যেই বিচরণ করলেও তাদের মানসিক শিকড় রয়েছে আরও নিচে। অথচ এই সমাজের ভাব ও জীবন আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কৃষক-জীবনের সত্যিকার বাস্তব উপন্যাস– মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মতো বই– যেমন মুসলমান লেখেনি, তেমনি অভিজাত সমাজের প্রাচীন নবাব বা জমিদার শ্রেণি নিয়ে উপন্যাসও তারা লেখেনি। ঐতিহাসিক উপন্যাস আছে, কিন্তু 'ঈশা খাঁ রায় নন্দিনী' অথবা 'আলমগীরে'র সামাজিক তাৎপর্য হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙমহলে'র মতোই সামান্য। এ কথা নাটক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এ নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয়নি তা-ও নয়, অধুনা জাতিধর্ম শ্রেণি-নির্বিশেষে যে মনুষ্যগোষ্ঠী শহরের ইট, কাঠ, লোহার গারদে বাস করতে বাধ্য, তাদের নিয়ে যে দুই-একটা গল্প বা উপন্যাস লেখা হচ্ছে তার ঐতিহাসিক বা শৈল্পিক মূল্য হয়তো আছে কিন্তু তা সামাজিক উপন্যাস হিসেবে অমুসলমান লিখিত গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই আলোচ্য, মুসলমানত্বের সুযোগ সেখানে অল্প, যেমন অল্প হিন্দুত্বের ছাপের। পূর্বেই বলেছি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এখনও তার প্রাথমিক অবস্থায়; একটা স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি এখনও সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি। এইজন্য মনস্তত্ত্বমূলক বুর্জোয়া উপন্যাসের যে নিষ্ফলা পরিণতি,– মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলা, সেই পরিণত খাঁটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বা গল্প এখনও মুসলমান সাহিত্যে লেখা হয়নি। এই শ্রেণি এখনও গড়ন্ত অবস্থায় এবং সেই জন্যই বিপ্লবধর্মী। কিন্তু তা হলেও এই বিপ্লবের বিস্তার খুবই

সঙ্কীর্ণ; নিম্নতম শ্রেণির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গণ্ডি ভেঙে প্রত্যেককে এক একটি ব্যবসাদার কিংবা সরকারি চাকরিতে পরিণত করাতেই এর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। এইসব উপন্যাসের গল্পে যে সমাজের চিত্র আঁকা হয়েছে তার সঙ্গে একই শহর বা গ্রামের একই শ্রেণিভুক্ত অমুসলমানের সম্বন্ধ নেহায়েতই দূরসম্পর্কীয় কুটুম্বের মতো, বাহিরের ঘরেই সীমাবদ্ধ। এই সব গল্পের হিন্দু কৃষক বা 'ভদ্রলোকে'র সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করা হয়, নয়তো নাটকীয় দুঃশাসন হিসেবে একটা বিজাতীয় ভয় অথবা ঘৃণামিশ্রিত শত্রুতা দেখানো হয়। উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দুকে দূরে দূরেই রাখা হয়। একান্ত শহুরে নবলব্ধ ইংরেজিয়ানা পীড়িত গল্পোপন্যাসেই অমুসলমানকে সমাজে স্থান দেবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা-ও চেষ্টা মাত্র। এক শ্রেণির, এক দেশীয় ও একই ভাষা-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমানের সমাজচিত্রে হিন্দুর সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তার অভাব দৃষ্ট হয় কেন, তার কারণ নির্দেশ করা সোজা। বাস্তব ও সাংস্কৃতিক জীবনে যোগ না থাকলে সাহিত্যে যে অমুসলমানের প্রতি একটা আনাত্মীয় ভাব থাকবে তা আর বিচিত্র কি? (অবশ্য হিন্দু লিখিত সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি করে বলা চলে, কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর) এই ব্যবধান রাজনীতি আনীত বহির্বঙ্গীয় ইসলামীয়তার গুণে আরও বিস্তৃততর হওয়া সম্ভব এবং হয়তো পশ্চিমবঙ্গেও তা ছড়াতে পারে।

কাব্যের প্রকৃতি ভিন্ন বলেই হয়তো কাব্যে এই শ্রেণি-মনোবৃত্তির অবচেতন প্রকাশ ঠিক এমনভাবে হয়নি। ইসমাইল সিরাজী বা মোজাম্মেল হকের মূল প্রেরণা রাজনীতি ছিল– স্যার সৈয়দ আহমদ অনুসৃত যে রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জাগরণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষণ। সেইজন্য এদের কাব্য মূলত Lyric রূপে epic; মুসলমানের কাব্য ইতিহাসে তার স্থান নির্দিষ্ট, কিন্তু Lyricism-এর যে বন্যা রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কাব্যে আনলেন তার সঙ্গে এর যোগ নেই। মাইকেল-নবীন সেন-হেমচন্দ্রের ঐতিহ্যে লেখা 'মহাশ্মশান কাব্যের' জোড়া আর রচিত হয়নি– তার কারণ বোধ হয় এই যে রবীন্দ্রযুগের গীতিকাব্যের বন্যায় মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা অসম্ভব ছিল। তাই গদ্যে যে স্বতন্ত্র পরিণতির দর্শন মেলে কাব্যে তা নেই। রবীন্দ্রযুগের বাঙলা কাব্যে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবীয়তার (humanism) বিকাশ, গোলাম মোস্তফা বা শাহাদাৎ হোসেনের কাব্য তা থেকে আলাদা নয়। নজরুল ইসলাম বাঙলার কাব্যজগতে যে বিপ্লব এনেছেন, তার প্রভাব যেমন মুসলমান সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয় তেমনই পূর্ববঙ্গের চাষি জীবনের যে Lyric সুর জসীম উদ-দীন কাব্যে এনেছেন সে সম্পদও মুসলমান কাব্যের একার নয়। অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান কাব্যের কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই, যেমন আছে তাদের গদ্যের। এককথায়, মুসলমানের কথাসাহিত্য আছে পিছিয়ে, কিন্তু কাব্য বিষয়,

ছন্দ, শৈল্পিক ও সামাজিক চেতনা প্রায় সব দিক দিয়েই হিন্দু ও মুসলমানের সমকালীন ও পারস্পরিক দানে সমৃদ্ধ।

মুসলমানের এই সব গল্প, কাব্য, উপন্যাসে লেখক ও পাত্র-পাত্রীদের নাম ও ধর্ম ব্যতীত যে বস্তুকে ইসলামীয়তা নামে অভিহিত করি, তার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকলে কতটুকু, সে প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আর একটা প্রশ্নের উত্তরের উপর। সাহিত্যে ইসলামীয়তা বলতে কী বুঝি, হিন্দুত্ব বলতেই-বা কী বুঝি? 'ইসলামি সংস্কৃতি'ও খুব স্পষ্ট অর্থব্যঞ্জক নয়, কারণ এর ঐতিহাসিক রূপের জন্য প্রধানত স্থান-কাল-পাত্রই দায়ী। ইসলামি চিত্রশিল্প বস্তুত মোঙ্গলীয় ও চৈনিক প্রভাবান্বিত ইরানি শিল্পেরই নাম; স্থাপত্য ও সারাসেনিক অথবা ইরানি; দর্শনও অনুরূপ জাতিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। 'মুসলমানি' উপকথার প্রায় সবগুলোই যে ইরানের ও আরবের জাতীয় কাহিনী, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে আর তর্ক নেই। সংস্কৃতি যে গোড়ায় জাতি ও দেশগত হতে বাধ্য এ কথা অনস্বীকার্য। অবশ্য যে মূলতত্ত্ব ইসলামের নিজস্ব এবং যা এই সংস্কৃতিকে স্থান, কাল ও পাত্রের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও একটা সুস্পষ্ট ঐক্য দান করেছে, তার সংজ্ঞানির্দেশ সহজ। একেশ্বরবাদ, সাম্য ও আন্তর্জাতিকতা, আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ, আশাবাদী সাংসারিকতার মধ্যে আত্মোপলব্ধি এ সব তত্ত্ব মোটেই জটিল নয় এবং এর সাহিত্যে রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিরোধও নেই। কিন্তু এ কথা কি নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই ধর্মীয় মূল তত্ত্ব দেশের জাতীয়, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে সাহিত্যে রূপায়িত হতে পারে? ফেরদৌসি বা জামি'র লেখাকে কি সম্পূর্ণ ইসলামি বলা যায়, না তাকে ফার্সি ঐতিহ্যেরই পর্যায় বলা বেশি সমীচীন হবে? তাছাড়া এই মূল তত্ত্ব যে ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে মিশে যায়নি, সে কথাও তো নির্ভুল নয়, বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি বলতে কি আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মানুপ্রাণিত উপাদানেরই সমষ্টি বুঝি না? রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে দর্শন তাতে ইসলামের বৈরাগ্যবিমুখ কর্মযোগী, আত্মনির্ভরশীলতার প্রকাশ কি নেই? এই মাপকাঠি অনুসারে কিন্তু মুসলমানের আধুনিক বাঙলা সাহিত্যকে ইসলামি বা মুসলিম বলতে আপত্তি থাকা উচিত, কারণ জলধর সেনের 'করিম সেখ' বা শৈলবালার 'শেখ আঁদুঁ'র মতোই এই সব গল্পোপন্যাসে যে সমাজের আলেখ্য আছে, তার মুসলমানত্ব নেহাৎই আকস্মিক, সে সমাজ হিন্দু হলে গল্পের কোনো সাংঘাতিক ব্যাঘাত ঘটত না। বাজারে ও গ্রামাফোনে প্রচলিত ইসলামি গানকেও ইসলামি বলতে এইজন্য আমার আপত্তি। স্থান ও পাত্র ছাড়া এ সব গানের হৃদয়বৃত্তি ও অনুভাব রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিরহ বিষয়ক গান থেকে কোনো অংশে ভিন্ন নয়।

হজরত মুহম্মদের ব্যক্তিত্ব, তাঁর আত্মীয় ও জন্মভূমিকে নিয়ে অহেতুকি ব্যক্তিগত হাসি-কান্নায় উদ্বেল হওয়া, খোদা ও তাঁর রসুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যতার স্থলে নারীসুলভ প্রেমে আত্মহারা হওয়া, এ দৃষ্টান্ত একান্তভাবে ভারতীয় বৈষ্ণব ও ভক্তদের, (এবং সুফিদেরও), সনাতন ইসলামের বিরোধী না হোক অনুকূল এ নিশ্চয়ই নয়। এই গানের লোকপ্রিয়তাও হয়তো এই জন্যই; বাঙালি মনে যে চিরন্তন বিরহী বাস করে, তারই বেদনা বাঙলার নিজস্ব সুরে প্রকাশ করার জন্য– এর ইসলামি চেহারার জন্য নয়।

ইসলামের ইতিহাস থেকে সাহিত্যের উপাদান ও রস সংগ্রহ করা নিয়ে তর্ক চলতে পারে না, যেমন তর্ক চলতে পারে না মুসলমান সমাজে ও গৃহে ব্যবহৃত একান্ত প্রয়োজনীয় আরবি-ফার্সি শব্দের বাঙলায় প্রয়োগ নিয়ে; এবং আমার বিশ্বাস কোনো সাহিত্যরসিকই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন না। কারণ, সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তব সমাজে এবং বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি বাঙলা ভাষা-ভাষী বাঙালি সংস্কৃতিসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজ। সে বাঙালি সমাজে মুসলমান নানা কারণে এতদিন কার যোগ্য স্থান নিতে পারেনি বা নেয়নি, কিন্তু যখনই তা নিতে পারবে, যখনই মুসলমান আধুনিক বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাড়াবে তখনই তার সমষ্টিগত প্রকাশ সাহিত্যে হতে বাধ্য, এবং তাতে সাহিত্যের কল্যাণই হবে।

উৎস: গ্রন্থ: সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস।

[লেখক: গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ।]

ঢাকা মুসলিম হলে অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সভাগৃহে প্রবেশ করার পর হতে এ পর্যন্ত আমার উপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। প্রাচীন শাস্ত্রে পড়েছি, কৃতী ব্যক্তির উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। এ পুষ্পবৃষ্টি যদি তাই সপ্রমাণ করে, তবে আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত। কৃতী হয় প্রীতি দিয়ে। আমি সঙ্কল্প করেছি, আমি কৃতী হব। সেজন্য এ পর্যন্ত আমার সকল সাধনা ও ইচ্ছার, রচনা ও কর্মে আমার সংকল্প হয়েছে হৃদয়ের প্রীতি সর্বজাতি, সর্বদেশকে দিতে। পাশ্চাত্য দেশে আমি মানবের কবি বলে সমাদৃত। তার কারণ কোনো সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আমি কোনো কার্য করিনি। সুইডেনে আমি বিশেষ সমাদর পেয়েছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, 'আমাদের আভিজাত্যের অভিমান অত্যন্ত বেশি। একদিকে গণতন্ত্রের ভাব, অন্যদিকে আভিজাত্যের অভিমান, এই আমাদের বৈশিষ্ট্য। সেজন্য আমরা কোনো মাননীয় অতিথিকে এত সমাদর করিনি যা তোমাকে করেছি। তোমার সমাদর আমাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হয়নি; তোমাকে বিশেষভাবে সমাদর করেছি।' আমি বললাম, 'আমার কী সুকৃতির জন্য এ বিশেষ সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছি?' উত্তরে তাঁরা বললেন, 'তোমার কাব্যে আমরা কোনো সম্প্রদায়ের নয়, মানবের স্বরূপ দেখতে পেয়েছি। সেইজন্য তোমাকে আমরা এত সমাদর করেছি। তোমার দেশের চেয়েও আমরা তোমাকে বেশি করে আদর করতে পেরেছি। তাতে তোমার ক্ষোভ করবার কিছু নেই কারণ দেশ তো তোমাকে গ্রহণ করবেই। তোমাকে গ্রহণ করে আমরা ধন্য।'

আমি এই সম্মাননার জন্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত। এত সম্মানের ভারে আমার চিত্ত নম্র না হয়ে পারে না। আমি অহংকারের সহিত নয়, নম্রতার সহিত এ সম্মান গ্রহণ করেছি। তার কারণ, আমার মধ্যে যে সত্য আছে, সে-সত্যকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন। সেইজন্য আমি তাঁদের সমাদরকে স্বীকার করে নিয়েছি। মানুষ

সেইখানে শ্রদ্ধেয়, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নয়। আমি নম্রভাবে নিয়েছি সে শ্রদ্ধা, মানুষের সত্যের জন্য, সে সত্যের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার জন্য।

আপনাদের নিকট আমার যে-পরিচয় তার কারণ আমি মানুষের সঙ্কীর্ণতার বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার স্বদেশের জন্য একটা অভিমান আছে। ভারতের বুকে এত জাতি, এত ধর্ম স্থান লাভ করেছে, তার অর্থ আছে। ভারতের হাওয়ায় এমন শক্তি আছে যার বলে সকল সম্প্রদায় এখানে আসন লাভ করতে পেরেছে। সকল ধর্ম এখানে স্ফূর্তি লাভ করবার একটা সরস ক্ষেত্র পেয়েছে। ভাবের মধ্যে সকল সত্য নিহিত আছে। যুগে যুগে সে-সত্য এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ আমাদের নিকট সে-সত্য আর-এক ভাবে প্রকাশ পেতে চায়। বিধাতা সে-সত্য প্রকাশ করবার দায়িত্ব ভারতবাসীর উপর ন্যস্ত করেছেন। সে-সত্য যতক্ষণ আমরা জীবনের মধ্যে, কর্মের মধ্যে প্রকাশ করতে না পারি ততক্ষণ আমাদের দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে-সত্য সকল ধর্ম, সকল সম্প্রদায়কে একত্র করবার সত্য। সে-সত্যকে গ্রহণ করবার দায়িত্ব ভারতবাসীর। ভারতবাসীকে সবলে সে-সত্যকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে।

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত, মর্মাহত, লজ্জিত হই। ধর্মে ধর্মে বিরোধ হতে পারে না। কারণ ধর্ম হল মিলনের সেতু আর অধর্ম বিরোধের। আমাদের অপরাধ স্বীকার করতে হবে, আমরা ধর্মের অবমাননা করেছি বিরোধ করে। সকল ধর্মই বিচ্ছেদের কলুষে কলঙ্কিত হয়েছে, সেজন্য লজ্জিত হতে হবে। ধর্ম যেখানে আছে, এতটুকু আত্মসম্মান যেখানে আছে, সেখানে এত বিরোধ কখনও বিশ্বাস করা যেতে পারে না। পরস্পরের বিরোধে আমাদের মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে, তা দেখে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি; বিশেষ করে আমার হিন্দু সমাজের জন্য। এ কথা মনে করবেন না বিদ্বেষ করি বলে অন্য ধর্মকে দোষী করে থাকি। আমি কঠিনরূপে বিচার করেছি। যেখানে অপরাধ আছে, সেখানে, ভালোবাসি বলে, দোষী করেছি, আঘাত দিয়েছি; কেননা সে অপরাধে আমি লজ্জায় অবনত হয়েছি। যখন ধর্মে বিকার উপস্থিত হয় তখনই বিচ্ছেদ প্রবল হয়ে ওঠে। শুধু হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ নয় সমাজের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। যখন মানুষ মানুষকে অপমান করে, তখন সে দুর্গতি-দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হয়; আমি আমার সমাজের জন্য লজ্জিত হয়েছি। লজ্জার কারণ মুসলমানের মধ্যেও ঘটে। এক্ষেত্রে যদি পরস্পর প্রীতি না করি তাহলে বিধাতা যে-দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন তার কত বড় অপমান করা হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যেকেই আপনার সমস্যা সমাধান করেছে। বিধাতা আমাদের নিকট পরীক্ষার প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন চুরি করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করলে চলবে না। সে-প্রশ্ন সমাধান করতে হবে

সত্যকার সাধনার দ্বারা। সে-প্রশ্ন সমাধান না করলে আমরা কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব না। সকল দেশ তাদের প্রশ্ন সমাধান করে, তাই তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিধাতা আমাদিগকে যে-প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তা সমাধান করতে হলে, সর্বপ্রথম পরস্পর প্রীতি, সৌহার্দ্য, সৌজন্য, ক্ষমা চাই। সেই প্রীতি দিয়ে সকলকে পরস্পর সহযোগী করে তুলতে হবে। তবেই আমাদের মঙ্গলপথ উন্মুক্ত হবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, কিন্তু বিধাতার এ প্রশ্নের সমাধান হয়নি– আমরা সকালে মিলিত হতে পারিনি বলেই। যেখানে মুষ্টি শিথিল, সেখানে অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে সব যায়। সেইরূপ পরস্পর বিচ্ছেদের কারণে আমাদের সমস্ত সম্পদ ফেঁসে গেছে। কোনো সম্পদই আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আজ পরস্পর বিরোধই প্রবল হয়ে উঠেছে, এর জন্য বড় লজ্জা হয়। কবে এ দূর হবে? একান্ত প্রীতি ও লজ্জার সহিত বলি, ধর্মের লজ্জা হতে কবে ঔদার্য জয়লাভ করবে ও সকলে ক্ষমা করে বড় হবে? যে ক্ষমা করবে সে-ই জয়ী হবে। সেই জয়ের জন্য সাধনা করতে হবে। ইতিহাসে দেখা যায়, নানা বিরোধের ভিতর সমাজ পরস্পর আঘাত করে জয়লাভ করেছে; নানা বন্ধনের মধ্যে অবন্ধন লাভ করেছে।

আমাদের বড় আকাঙ্ক্ষা আছে, আমরা বিশ্ব-সমস্যা এই ভারতে সমাধান করব। আমার কর্মে ও রচনায় সেই আশা প্রকাশ পেয়েছে। আজ মানুষের সহিত মানুষের এমন সংঘাত হচ্ছে যা পূর্বে কখনও হয়নি। ইতিপূর্বে এমন করে সে ঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশ পায়নি। পূর্বে মানুষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাই তাদের মিল ঘটেনি। এখন সে ভৌগোলিক সীমা ধূলিসাৎ হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর নিকট বিশ্বপ্রভু এই দাবি করেছেন, 'সকলের মধ্যে ভেদ থাকলেও মানুষের আত্মার মধ্যে অভেদ আছে– সেই অভিন্ন আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।' কিন্তু পৃথিবীতে আজ রক্তপ্লাবন ছুটেছে, পরস্পর হিংসার দূষিত বায়ু মানবের চিত্তকে অপবিত্র করেছে। মনুষ্যত্বের এমন অপমান অবমাননা আর কখনও হয়নি। পূর্বে মানুষ সকল অবস্থা, সকল দুর্গতির মধ্যে ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছে। কিন্তু আজ সে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা নিরস্ত হয়ে গেছে। মানুষের গৃধ্নুতা প্রখর হয়েছে; বিচ্ছেদের রক্তপ্লাবনে মানব-সমাজের প্রতি স্তর কলুষিত হয়েছে। এখন বর্বরতার যুগ আবার ফিরে এসেছে। এমন বিদ্বেষের প্রবল বন্যা আর কখনও প্রবাহিত হয়নি। বিধাতা কি দেখছেন না? তাঁর দাবি কি অপমানিত হচ্ছে?

তিনি তবু বলছেন, যদি তোমরা এই প্রশ্নের সমাধান না কর তবে কোনো দিন জয়যুক্ত হতে পারবে না; সত্যকে লাভ করতে পারবে না। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিধাতার যে-আসন তার তলে এই প্রশ্ন এই সমস্যা রয়েছে, মানব-আত্মার ঐক্য প্রকাশ কবে হবে?

এই সমস্যা ভারতে বহুদিন থেকে আছে। বিরোধের প্রাচীর তুলে তো সে-সমস্যার সমাধান হবে না। এত দৈন্য, এত দুর্গতি, এত দারিদ্র্য, এত ধিক্কার, এত অপমান আর কোনো দেশে নেই, কোনো কালে হয়নি। কোথাও হবে না। আমাদের তুচ্ছ তুচ্ছ কর্মের মধ্যে মনের যে পাপ তা ব্যক্ত হচ্ছে কেন? তার কারণ, আমাদের আত্মশক্তির অভাব, আত্মমর্যাদার অভাব। আত্মশক্তিকে অবজ্ঞা করে আমরা নিজেকে প্রকাশ করতে ব্যস্ত। বাহিরের পথকে আমরা রাজপথ বলে ধরে নিয়েছি। তাই আজ আমাদের এত দুর্গতি, এত অপমান।

আজ নম্র হয়ে আমাদের পরস্পরের অপরাধ স্বীকার করে প্রভুর আদেশ নিতে হবে– যিনি সকল সন্তানের জন্য তাঁর অনন্ত প্রেম মুক্ত করে রেখেছেন। আবার একদিন আমাদের ক্ষমার পথ, সহিষ্ণুতার পথ, প্রীতি, মৈত্রী, সখ্যতার পথ খুলতে হবে। সেই শুভবুদ্ধি হোক, তার আলো জ্বলুক। ঈশ্বর এক; তাঁর মধ্যে কোনো ভেদ নাই। যিনি সকল বর্ণের, সকল জাতির জন্য নিত্য তাঁর গভীর প্রয়োজন প্রকাশ করেছেন, তিনি আমাদের সকলের চিত্ত যুক্ত করুন; বাহিরের শক্তি দ্বারা নয়, শুভবুদ্ধি দ্বারা। শুভবুদ্ধির আলোক বিকীর্ণ হোক। তবেই আমাদের চিত্ত যুক্ত হবে। তবেই আমাদের আত্মা মুক্ত হবে, তার ঐক্য প্রকাশিত হবে, সকল অপমান দূর হবে। সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাহিরের চুক্তি দ্বারা সে ঐক্য হবে না। আমাদের শুভবুদ্ধি শুভকর্মে যুক্ত হোক।

[লেখক: সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সমাজ সেবক।]

মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা

র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র

গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহারই ইংরাজি অনুবাদ সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বাংলা স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষরূপে হিন্দু ছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে অথচ বাংলার অনেক প্রদেশেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রজাসংখ্যা অধিক; ইহা লইয়া সৈয়দসাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন। বিষয়টি আলোচ্য তাহার সন্দেহ নাই এবং বক্তামহাশয়ের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ, এতদিন বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রসংখ্যাই অধিক ছিল এবং মুসলমান লেখকগণ বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নাই।

কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভালো বাংলা লিখিতে পারেন এমন মুসলমান লেখকেরও অভাব নাই। অতএব মুসলমান ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় আসিয়াছে।

স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয় সাধুদৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধুদৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্যধার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ-দুঃখ নানা সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙালি হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দু শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহার কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।

অতএব সৈয়দসাহেব বাঙালি মুসলমান বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে-কথা বলিয়াছেন, আমরা বাঙালি হিন্দু বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক সেই

কথাই বলি অর্থাৎ বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসংগত।

ইংরাজি শিক্ষার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আচার-বিচার আমাদের কাছে লেশমাত্র অগোচর থাকে না; অথচ তাহারা বহুদূরদেশি এবং মুসলমানরা আমাদের স্বদেশীয়, এবং মুসমানদের সহিত বহুদিন হইতে আমাদের রাজনীতি পরিচ্ছদ ভাষা ও শিল্পের আদান-প্রদান চলিয়া আসিয়াছে। অদ্য নূতন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইয়া গেলে পরম দুঃখের কারণ হইবে। বাঙালি মুসলমানদের সহিত বাঙালি হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমরা যেন কখনও না ভুলি।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো।' ঝি আপনার বলিয়া তাহাকে দু ঘা মারিলে সয়, বউয়ের গায়ে হাত তোলা সকল সময় নিরাপদ নহে। সৈয়দসাহেব সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বাংলা পাঠ্যপুস্তককে তর্জন করিয়াছেন, বোধকরি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল। মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাসের বিকৃত বিবরণ বাংলা বই কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছে? অস্ত্র হস্তে ধর্মপ্রচার মুসলমানশাস্ত্রের অনুশাসন, এ কথা যদি সত্য না হয় তবে সে অসত্য আমরা শিশুকাল হইতে শিখিলাম কাহার কাছে? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনীতি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক যাহাই লিখিতেছে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রগণ কি তাহাই নির্বিচারে কণ্ঠস্থ করিতেছে না? এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক কি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র নহে?

সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের হাত একেবারে এড়ানো কঠিন। ইউরোপীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রচিত্র প্রটেস্টান্ট লেখকের হাতে একভাবে এবং রোমান ক্যাথলিক লেখকের হাতে তাহার বিপরীতভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইউরোপে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের বিদ্যালয় অনেক স্থলে স্বতন্ত্র, সুতরাং ছাত্রদিগকে স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ কথা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই-সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বাংলা বই রচিত হইলে তাহা কোনো বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংরাজ লেখকেরই মত বাংলা বিদ্যালয়ের আদর্শ মত– সেই মত অনুসারে পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার নম্বরেই দেখা যাইবে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

অনেক আধুনিক বাঙালি ঐতিহাসিক মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসকে ইংরাজ-তুলিকার কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

অক্ষয়বাবু তাঁহার সিরাজচরিতে অন্ধকূপহত্যাকে প্রায় অপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন কিন্তু প্রমাণ যতই অমূলক বা তুচ্ছ হউক পরীক্ষাতিতীর্ষু বালক মাত্রই অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

অতএব বক্তামহাশয়ের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য, পাঠ্যপুস্তকের মতামত সম্বন্ধে আমরা কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যতদিন না স্বাধীন-গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা আমরা ইংরাজি সাহিত্যসমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক কুসংস্কারগুলিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারি ততদিন আমাদের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে ইতিহাস-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করি। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দুই-একজন হিন্দু লেখক এই দুরূহ সাধনায় রত আছেন, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণমালা প্রায়ই পারসি-উর্দু ভাষায় আবদ্ধ, অতএব মুসলমান লেখক গণের সহায়তা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

সৈয়দ সাহেব বাংলা সাহিত্য হইতে মুসলমান-বিদ্বেষের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসংগত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মতো লেখকের গ্রন্থে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসি-বিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যপ্রিয় ফরাসি পাঠক থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্বাসিত করিতে পারেন না। আইরিশদের প্রতি ইংরাজের বিরাগ অনেক ইংরাজ সুলেখকের গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ-সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক-কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোনো সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গসাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।

[লেখক: সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সমাজ সেবক।]

বাঙালী মুসলমান: শ্রেণীসমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতা

নূ র মো হা ম্ম দ

(দ্র.পূর্বে প্রকাশের পরের অংশ। 'এক– চার' 'হালখাতার পূর্বের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল)

পাঁচ.

১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর গিয়াস-উদ-দীন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত লখনৌতি দিল্লীর অধীনে ছিল। এই সময় রাজ্য বিস্তার তেমন একটা হয়নি বলা চলে। আশেপাশের শাসকরা, প্রধানত হিন্দু রাজারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুসলমান শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল পরিস্থিতির উন্নতিতে সাহায্য করেনি। তবে এই সময়ে মুসলিম অধিকৃত এলাকায় হিন্দুদের ভেতরে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে আসে। এসময়কালে পনের জন প্রাদেশিক শাসক লখনৌতি শাসন করেন। এদের মধ্যে দশ জন ছিলেন মমলুক বা দাস। এই সময় দিল্লী ও লখনৌতি– দু'জায়গারই শাসক ছিলেন তুর্কীরা। ফলে এই সময় তুর্কী শাসন আমল হিসেবেই চিহ্নিত।

এরপর বলবনী সুলতানদের তাৎপর্যহীন শাসন। আমরা যা আলোচনা থেকে বাদ রাখছি তা হলো, লখনৌতি সম্পর্কে দিল্লীর শাসকদের ভূমিকা এবং দিল্লী ও লখনৌতিতে ক্ষমতার জন্য ন্যাক্কারজনক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তবে এটা ঠিক দিল্লীর খলজী সুলতানদের সময় লখনৌতি স্বাধীন থেকেছে। তুগলকেরা দিল্লীর মসনদে বসলে আবার পরাধীন এবং ১৩৩৮ সাল থেকে লখনৌতি দু'শো বছরের জন্য স্বাধীন।

শামস-উদ-দীন-ফীরুজ শাহের নাম ও সময় নিয়ে উপাদানের অভাব আছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তবে তার সময়ে মুসলিম শাসনের এলাকা সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে সোনারগাঁওসহ পূর্ববঙ্গ, ময়মনসিংহ এবং

সিলেট অধিকৃত হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান-ফকর-উদ-দীন মোবারক শাহ্ সোনারগাঁও এর সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৪১]

চতুর্দশ শতক থেকে ইসলামের সীমানা বাড়তে থাকে– মুসলমানদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আস্তে আস্তে যেমন একটা ভাষা নির্ণীত হতে থাকে তেমনি এই ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন স্বাধীন সুলতানরা।

সম্ভবত এই সময় থেকে স্তরটা নিচের দিকে থাকলেও 'বাঙালী মুসলমান' যেন সবার অলক্ষ্যে একটা অবয়ব পেতে থাকে।

হাজী ইলিয়াস ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ফীরুজাবাদের সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহকে হত্যা করে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও, লখনৌতি ও সাতগাঁও দখল করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত জনপদগুলি ইলিয়াস শাহের শাসনাধীন হলো। ইলিয়াস শাহের পূর্বে বাঙলার কোনো মুসলমান সুলতান সারা পূর্ব ভারতের এইসব অংশের অধীশ্বর হননি। তারা হয় লখনৌতির বা সাতগাঁও বা সোনারগাঁওয়ের সুলতান ছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিক আফীফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙালা' 'শাহ-ই-বাঙালীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙালা' উপাধিতে ঘোষিত করেন। সুতরাং ইলিয়াস শাহ কর্তৃক সোনারগাঁও অধিকার এই দেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।[৪২]

মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বের শেষ দিকে ইলিয়াস শাহীরা দিল্লীর সুলতানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন– যদিও নিজেদের মধ্যে তাঁরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য এর পর দিল্লীর শাসক ফীরুজ শাহ তুগলক বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহী শাসনামলে হিন্দুরা উচ্চপদ লাভ করেন এবং শাসনাব্যবস্থায় বেশ শক্তভাবেই যেন অংশীদার হয়ে পড়েন। অন্যদিকে এই আমলে ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্যও তাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গিয়াস-উদ-দীন আযম শাহ রাজ্য বিস্তারে পারদর্শিতা দেখাননি কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণ, বিদ্যোৎশাহী ও সুশাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মক্কা-মদিনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মাদ্রাসা, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন– তবে নিজ দেশের ধর্মপ্রচারে তাঁর তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। অবশ্য সূ'ফীদের তিনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন। এই সময় হিন্দু সৈনিক ও সেনাপতিরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিতভাবে দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন, বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর নেই।[৪৩]

পরবর্তী ইলিয়াসশাহী শাসনামলের বিখ্যাত শাসক রুকন-উদ-দীন বারবাক শাহ ছিলেন একজন অত্যন্ত যোগ্য শাসক। ১৪৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর সম্পর্কেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন, "বারবাক শাহ শুধুমাত্র নিজে পা-িত্য অর্জন করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি অন্যান্য প-িতদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। শুধু প-িত নয়, কবিরাও তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। আর কেবল মাত্র মুসলমান কবি-প-িত নয়, হিন্দু কবি-প-িতদের উপরও তিনি মুক্ত হস্তে দাক্ষিণ্যবর্ষণ করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষিত কবি প-িতদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন, শতশত বৎসরের ব্যবধানেও যাঁদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অম্লান রয়েছে।"[৪৪] তাঁর গভীর অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের উপর সুখময় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করেছেন।

"বারবাক শাহ উদার প্রকৃতির সুলতান ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি সকল ব্যক্তির সমাদর করতেন। এই নীতি ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম হইতেই চলে আসছিল।"[৪৫]

অর্থাৎ ইতিমধ্যেই এটা প্রতিভাত হচ্ছে বহিরাগত অবাঙালী মুসলমান শাসকরা রাজকার্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সম্মানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান দিচ্ছেন। অর্থাৎ উঁচু পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এক ধরনের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দেখা যাবে শাসকদের প্রয়োজনেও স্থানীয় ভাষা যাতে বিকশিত হতে পারে সেজন্য একটা তাগিদও এসে গেছে। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য দরদ নয় শ্রেণীস্বার্থে, ধর্মপ্রচারে স্বার্থে স্থানীয় ভাষাকে সার্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের পর ৬ বছর হাবশী শাসন পর্ব শেষ হলে শুরু হলো হোসেন শাহীর শাসনামল। প্রাক-মোঘল যুগে হোসেন শাহী শাসনামল বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ: "এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার সময় বাংলাদেশের সীমানা চতুর্দিক বিস্তৃত হয়।... শাসনক্ষেত্রে তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। এবং তিনি পরধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার অমাত্যরা বাংলাভাষার পৃষ্ঠপোষণ করেন। তাঁহার বংশের মোট ৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলে সমানভাবে যোগ্য না হইলেও মোটামুটি সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসরণ করেন। আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং অদ্যাবদী তাঁহার নাম বাঙালীদের কাছে পরিচিত।"[৪৬]

১৪৯৪-১৫৩৮ হোসেন শাহী আমল। অর্থাৎ মোট ৪৪ বছর এই শাসনামল। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শের খান গৌড় জয় করেন। স্বাধীনতা লোপ পেল। এর পর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে সম্রাট আকবর দায়ূদ

কররানীকে পরাজিত করে এই দেশ জয় করেন। শের খানের গৌড় জয় করার পর তিনি ও তার বংশধরেরা একটা সময় পর্যন্ত দিল্লীর একটি প্রদেশ হিসেবে এদেশ শাসন করেন। মাঝখানে এরপর পর্যায়ক্রমে আফগান শূর ও কররানী সুলতানেরা স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করেন। এই শাসন চলে ৩৮ বছর। এরাই আফগান শাসন পর্বের শাসক।[৪৭]

ছয়

বহুল আলোচিত হোসেন শাহী আমলের প্রধানত ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গেলে দেখা যাবে এই অর্জন হঠাৎ কোনো অলৌকিক ঘটনার মতো নয়– যে ভাবেই হোক এটা একটা ধারাবাহিকতারই ফল। যোগ্যতা এবং উচ্চতর মানবিক গুণাবলীর সমাহারের ফলে এই আমলটি যেমন সুলতানী শাসনামলের একটি সার্থক পরিণতির স্বাক্ষর বহন করেছে তেমনি পরবর্তীকালের জন্য প্রধানত দুটি ধর্ম ও একটি ভাষার এক জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য যৌক্তিক একটি সংহত জাতিগঠনের উপাদানও সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি।

হোসেন শাহী আমল তথা ইলিয়াস শাহী শাসকবৃন্দের সময়কালের কিছু মূল্যায়ন আমাদের প্রয়োজন। শাহী শাসকবৃন্দের আগে ও পরে মুসলমান শাসকবৃন্দ থাকলেও এই সময়ের কিছু মূল্যায়নই আমাদের লক্ষ্য পূরণে সব থেকে কার্যকরী হবে। কারণ এই সময় সবদিক দিয়ে সুলতানি শাসনামলে একটা পূর্ণতা দেখা যায়। বাংলার স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।[৪৮]

মুসলিম বিজয়ের পর পর যে সব বিদেশী মুসলমান এসেছিল তারা তখনও এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেনি। স্থানীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হঠাৎ একটি জ্ঞানদীপ্ত সুস্থিত শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার কোনো সমাজতাত্ত্বিক কারণই ছিল না। এদের অধিকাংশই মনে হয় আদিতে হিন্দুসমাজের নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত ছিল। তবুও এটা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, বাংলা ভাষাভাষী একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিবর্তনের খুবই প্রাথমিক পর্যায় আমরা প্রাক-মোঘল বাংলাতেই দেখতে পাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলতকাজী এবং আলাওল প্রধানত এ বিবর্তনেরই ফসল।

প্রাক মোঘল আমলে মিশ্র সমাজকাঠামোতে শক্তিশালী ইসলামী প্রবণতাসমূহ গড়ে উঠেনি। তার অর্থ অবশ্য এই নয়, মোঘল আমলে ইসলামী প্রবণতা খুব শক্তিশালী হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির কেন্দ্র রাঢ় অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার বেশি হয়নি।

সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা অর্থনৈতিক প্রাচুর্য উপভোগ করতেন এবং বিলাসী ও "অমিতব্যয়ী" জীবন যাপন করতেন। একটি চৈনিক বিবরণ অনুযায়ী গরু ও ছাগলের ধূমায়িত ও রোস্ট করা মাংস, কলা, কাঁঠাল ও ডালিম ছিল তাদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। খাওয়া শেষ হলে তারা মধু ও মিষ্টি গোলাপজল পান করতেন। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল। বার্বোসা প্রসঙ্গক্রমে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তালের রস থেকে তৈরি মদ্যপানের উল্লেখ করেছেন। বাংলার শহরগুলিতে মাহুয়ান বহু মদের দোকান দেখেছিলেন এবং তিনি মনে করেন যে নারিকেল, ভাত, ট্যারি এবং 'কদজং' থেকে মদ তৈরি হতো এবং কড়া মদ বাজারে বিক্রি হতো। ধনী মুসলমানরা মাঝে মাঝে সামাজিক সমাবেশের আয়োজন করতেন এবং নাচ-গানে এগুলি জীবন্ত হয়ে উঠত। এ ধরনের উপলক্ষে তাঁরা গায়ক ও নর্তকীদের আমন্ত্রণ করতেন যাদের রঙিন পোশাক ও চোখ-ধাঁধানো অলঙ্কার আমোদ-প্রমোদের জাঁক-জমক ও মহিমা বৃদ্ধি করত।

বাংলার বিলাসিতার ধরন ছিল এমন বিভ্রান্তিকর যে কথিত আছে যে ১৫৩৮ সালে হুমায়ুন গৌড়ে এসে এর সুন্দর রাজপ্রাসাদগুলির দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। এগুলিতে ঝর্ণা, ফুলের কেয়ারিপূর্ণ বাগান ও জলের জন্য পাথরের খাল ছিল। এসব প্রাসাদের কক্ষগুলির মেঝে ও ভিতরের দেয়ালে চীনদেশীয় টালি ব্যবহার করা হয়েছিল। এ কক্ষগুলিতে দামি আসবাবপত্র ও বিলাসবহুল পর্দা ছিল। গোটা পরিবেশটাই নিশ্চয়ই হুমায়ুনের মনে এক মোহিনী প্রভাব ফেলেছিল।

ধনী মুসলমানদের বিলাসী অভ্যাসগুলি কিছু সামাজিক রীতির প্রচলনের জন্য দায়ী ছিল। তাদের মধ্যে বহু-বিবাহ ছিল বহুল প্রচলিত এবং তাদের স্ত্রীর সংখ্যার কোনো সীমা ছিল না। "এসব মহিলাদের জীবনযাপন নিজ নিজ গৃহের সীমানার মধ্যে সীমিত রাখা হলেও তারা এদের সঙ্গে ভালো আচরণ করত। তাঁরা এসব মহিলাকে প্রচুর সোনা-রূপার অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র দিতেন।" মহিলারা শুধু রাতেই একত্রিত হতেন এবং তখন এ উপলক্ষে "প্রচুর আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দোৎসব হতো এবং সুরার বন্যা বয়ে যেত।" বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। বার্বোসা সোনা, রূপা এবং সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন যা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে উচ্চশ্রেণীর মহিলারা সোনা-রূপার গহনা ও রেশমি পোশাক পরতেন। চৈনিক বিবরণ এ বক্তব্যকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ণিত বিবরণ সম্পর্কে দেশীয় পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতার কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনের সঙ্গে উপ-পত্নী প্রথা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বলে মনে হয়। তৃতীয় মাহমুদ শাহের নারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

এই যে, 'স্ত্রীর সংখ্যার কোনো সীমা ছিল না' বা 'তৃতীয় মাহমুদ শাহের নারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার– সম্ভবত এই ধরনের ও আরো কিছু বিবরণে বাড়াবাড়ি আছে বলে মনে হয়। দশ হাজার রমণীর ব্যবস্থাপনা সেই সময়কার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বর্ণনার মধ্যে পল্লবগ্রাহিতার ছাপ রয়েছে।

সৈয়দ, মোঘল, পাঠান এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়ে গঠিত ছিল মুসলমান সমাজের উচ্চশ্রেণী। কৃষক, তাঁতি এবং এ জাতীয় পেশা অবলম্বনকারী অন্যরা ছিল জনগোষ্ঠীর নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান কৃষক ও তাঁতির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। এটা নিতান্ত স্বাভাবিক যে এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত বা এ জাতীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বংশধর। কিছু কিছু পেশা ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া। এমনকি হিন্দুদেরও মুসলমান দর্জিদের ওপর নির্ভর করতে হতো। বাংলার মাঝি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। পরি (পিষ্টক-বিক্রেতা), কাবাড়ি (মৎস্য-বিক্রেতা), কাগজি (কাগজ প্রস্তুতকারক), রংরেজ (বস্ত্র-রঞ্জক), হাজাম (যারা মুসলমানি করে), কসাই এবং শানাকর (তাঁত-নির্মাতা) সহ মুসলমানদের সাধারণ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজন এ সিদ্ধান্তের সত্যতাকেই সমর্থন করে যে ষোড়শ শতকের শেষদিকে মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছিল এবং পর্যালোচনাধীন সময়কালে এ বিকাশের প্রক্রিয়া চলছিল।

বাংলাভাষী মুসলিম মধ্যবিত্তের তখনো জন্ম হয়নি। মধ্যশ্রেণীবিহীন বাঙালি মুসলিমগণ প্রাক-মোঘল যুগেই তার সমস্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর পাশেই অবস্থান করছিল। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের যে ব্যবধান দেখা দিয়েছিল তা আজকের দিনেও অনেক ক্ষেত্রেই ভালোভাবে টিকে আছে। হিন্দু সমাজের স্তরবিন্যাসের সীমারেখাসমূহ ভেদ করে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের মধ্যে যোগাযোগ ঘটত পৌরোহিত্য ও কথকতা জাতীয় অনুষ্ঠান–প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে। সেইজন্য হিন্দু সমাজের একটি সংহত রূপ গড়ে উঠেছিল। এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে ছিল না। তাই এ সমাজ সে-কালে যেমন, আজকের দিনেও তেমনি অসংহত, খ-িত। এ-সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র তেমন একটা নেই। মুসলমানদের শাসনকালে আমির-ওমরা ও উলেমা শ্রেণীর সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর বাঙালি মুসলমানদের যোগাযোগ কমই ছিল।[৪৯]

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর আদৌ সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয় না। মুসলমান শাসকরা 'সংস্কৃত' সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেনি, সংস্কৃত-কে পিছনে ঠেলে দিয়ে ভাষা হিসেবে বাংলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এবং আরো বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করা হয়। ফারসী রাজ ভাষা থাকলেও বাংলা ভাষাকে গড়ে-পিটে

নিতে শাসকগোষ্ঠীর আগ্রহের ফলে বাংলা ভাষা একটি যৌক্তিক মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসার সুযোগ পেয়ে যায়। হোসেন শাহী শাসকরা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে মূল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণে সাহায্য করেছিলেন। জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অ-ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত ভাবেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মোকাবেলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

আলোচ্য সময়কালে ব্যাপক সাহিত্যিক কর্মকা- লক্ষ্য করা যায়। যা ছিল সেকালে তুলনাহীন। দেশী ভাষা ধর্মীয় ও পার্থিব মতো দক্ষতা এবং স্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল। বাংলা ভাষার উন্নতি ও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর স্থানীয় সংস্কৃতির বিজয়ের প্রতীক।

ইলিয়াস শাহী শাসকদের অধীনে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসের শুরু। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা এদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির শক্ত ভিত্তি নির্মাণ করেন। বাংলায় কাব্য রচনা এবং সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ লাভকারী চ-ীদাস, কৃত্তিবাস এবং মালাধর বসু সাহিত্যিক বিকাশের ক্ষেত্রকে আরও সুগম করেন। সে প্রক্রিয়া এতদিন ধরে সক্রিয় ছিল তা হোসেন শাহী আমলেও অব্যাহত থাকে এবং দেশীয় ভাষা নতুন জীবন লাভ করে। সেকালের কবিদের মধ্যে যশোরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এবং শ্রীধর রাজ দরবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[৫০]

শ্রীকর নন্দী, পরাগল খান, ছুটি খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচনা-সময়কাল ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে। আমাদের আলোচনার জন্য এই বিষয়টির কোনো আবশ্যকতা নেই। কাব্যরচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীকর নন্দী বলেন,

পি-তে মি-ত সভা খান মহামতি
একদিন বসে আছে বান্ধব-সংহতি।
শুনিল ভারত-গাথা অতি পুণ্য কথা
মহামুনি জৈমিনির পুরাণ সংহিতা।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়
সভাখ- আদেশিল খান মহাশয়
ব্যাস গীত ভারত শুনিল চারুতর
তাহাত কহিল জৈমিনি মুনিবর।
সংস্কৃত ভারত না বুঝে সর্ব্বজন
মোর নিবেদন কিছু শুন কবিগণ।
দেশি ভাষে এহি কথা করিয়া প্রচার

সঞ্চরউ কীর্ত্তি মোর জগৎভিতর
তাহান আদেশ মান্য মাথে আরোপিয়া
শ্রীকর নন্দী এ কহে পাঞ্চালী রচিয়া ।
সুতরাং হে 'সংস্কৃত' বিদায়– স্বাগতম বাংলাভাষা ।

সাত

শ্রেণী গঠনপ্রক্রিয়া সুলতানী আমলের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল । সামন্তশোষণ পুরোপুরি কী চেহারায় ছিল সে সম্পর্কে আলোচনায় না গিয়েও এটা বলা যায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভালোভাবে চালু হয়েছিল । তাছাড়া অর্থনীতিতে অকৃষিখাতেরও একটা শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়েছিল । প্রাক-পলাশী বাংলায় দেশীয় শিল্পের যে সব খোঁজ-খবর পাওয়া যায় তার অতীত সূত্র সুলতানী আমলে বা তারও আগে রয়েছে ।

আসলে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অখ-তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সীমানার আওতায় অর্থনৈতিক কর্মকা-ের সুস্পষ্ট চিত্র না থাকলে সে সময়ের ছোট ছোট খ- খ- রাজ্যভিত্তিক অঞ্চলের উপর অর্থনৈতিক সমীক্ষা একটি জটিল ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার । এ সবের ওপর যে সব গবেষণা হয়েছে তা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয় । বিদেশীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, জমজমাট দাস প্রথা চালু ছিল । ইংরেজদের সময়ও কলকাতাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাস বেচা-কেনা চলত । দাস কেনা-বেচার বড় বড় হাট ছিল । পর্তুগিজরা মগদের সহযোগিতায় নিষ্ঠুর দাসব্যবসার রমরমা বাজার চালু করেছিল । এই ব্যবসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে । কিন্তু তবুও পূর্ব ভারতের বর্ণিত অঞ্চলে দাস ব্যবস্থা উৎপাদন প্রণালী হিসেবে ইতিহাসের একটা পর্ব জুড়ে চালু ছিল এর সপক্ষে তেমন অর্থবহ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না । দাস কেনাবেচা ও দাসব্যবস্থা সমার্থক নয় ।

আমরা এখানে শুধু একটি বিষয়ের ওপর সামান্য নজর দিচ্ছি । সেটি হল সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত হলে রাষ্ট্রের উদ্ভব অপরিহার্য হয়ে পড়ে । এটা প্রমাণিত হয়নি ইসলাম সাম্যের বাণী নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও মূল্যবোধকে উপড়ে ফেলতে পেরেছে । এটা ঠিক যেসব স্থানে প্রায় সকলেই অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে সেখানে ইসলামী সংস্কৃতির একটা উদ্ভব ঘটে– এটা প্রায় সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তাছাড়া ইসলামের অভ্যুদয় ও দ্বিগ্বিজয় প্রচলিত উৎপাদন প্রণালীর উপরও প্রভাব ফেলেছিল । ইসলামের মধ্যে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে নিশ্চিত আবেদন রয়েছে । ইসলামের ঐতিহাসিক অবদানের উপরও বিস্তারিত গবেষণা আছে । ইসলামের অবদানের উপর মানবেন্দ্র রায়ের লেখা বইটির গুরুত্ব এখনও রয়েছে । কিন্তু ইসলাম বা অন্য যে কোনো

ধর্মের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের বিপক্ষে অনেক গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকলেও সে পর্যন্ত দেখা যায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রভূত্ব বিস্তারকারী শ্রেণী ধর্মকে এমনকি নিষ্ঠুরতম শোষণ-বঞ্চনার পক্ষে সহনশীল করে তোলে। ধর্মকে তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণের পক্ষে ও শাসক-শোষকশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মকা-চালিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে এটা ঠিক বাংলা ও ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইসলামকে লড়তে হয়েছে। সুসংগঠিত জাতিভেদ প্রথা ইসলাম ধর্মের প্রসারের পথে একটি বড় বাধা। অবশ্য এটা ভাঙ্গা তো দূরের কথা জাতিভেদ প্রথা দ্বারা মুসলমান অভিজাতরা প্রভাবিত হয়েছিল। যা হোক, এমন কি বাদশা আলমগীরও উলামাদের পরামর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে রাজি হননি। সাধারণভাবে বলতে গেলে মুসলমানদের শাসনামলে রাষ্ট্র-ধর্ম নিরপেক্ষ থেকেছে।

শ্রেণী গঠন বোঝাবার সবচেয়ে কার্যকর প্রকল্প হলো উৎপাদন পদ্ধতি এবং তদ্দারা সৃষ্ট সামাজিক উদ্বৃত্তই হলো শ্রেণী গঠনের প্রধান হেতু। যদিও জানি, বিপরীত মত বহু লোক তুলে ধরেছেন। 'শ্রেণী' এবং 'উদ্বৃত্ত' শব্দগুলিকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকেই, তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে, 'উচ্চবর্গ' বা 'শিরোমণি', 'মর্যাদা', 'ক্রমবিন্যাস', 'সিদ্ধান্ত-কারণ' ইত্যাদি কথা। উদ্বৃত্তের তত্ত্বকে বাতিল করার জন্য যে কারণ দেখানো হয়, তা হল মানুষ নিজের থেকে অধিক উৎপন্ন করে না, তাদের অধিক কাজ করতে বাধ্য করা হয়, অথবা অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করা হয়। অধিক উৎপাদন করার পিছনে যে কারণই দেখানো হোক না কেন– এ ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও– প্রায় প্রত্যেক নিষ্ঠাবান গবেষকই স্বীকার করেন যে একমাত্র উদ্বৃত্ত উৎপন্নের উপরেই পূর্ণ সময়ের শাসকবৃন্দ, পেশাদার সৈনিকগণ, পুরোহিত শ্রেণী, কারিগরশ্রেণী এবং অনুরূপ বিশেষজ্ঞগণ নির্ভরশীল, যারা নিজেরা খাদ্য উৎপন্ন করেন না।[৫১]

বাঙলাতে ইসলাম ধর্ম শ্রেণীগঠন প্রক্রিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করেনি (করতে পারেও না) ঠিকই কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মতো শ্রেণীসংগ্রামকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নৈতিকভাবে এমনকি বিপুল ধনসম্পদের মালিক হওয়া স্বীকৃত থাকায় যাকাৎ ধনবৈষম্য ঠেকাতে পারেনি। অর্থাৎ আয়কর বা জাকাত ধনবৈষম্য বৃদ্ধিতে বাধা দানের কোনো কার্যকরী পন্থা নয়। ফলে ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ জে. ব্লকের কাছে এক চিঠিতে উপরিকাঠামোর গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। উপরিকাঠামোর বেশ কিছু বিষয় 'ভিত্তি'র উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি

ঐতিহাসিক সংগ্রামের গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের *রূপ* নির্ধারণে বড় হয়ে উঠে।

শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে উপরিকাঠামোর বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে যদি অজ্ঞতা থাকে তবে তা গৌরবের বিষয় হতে পারে না।

আট

আমরা আগেই দেখেছি যে, স্বাধীন সুলতানী আমলের পতন ঘটছে ও মোঘলরা বাংলার বিহার উড়িষ্যা দখল করে নেয় এবং নামকরণ করা হয় সুবাহ বাংলা। মোঘলদের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং কৃষি বাণিজ্য শিল্পেরও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মোঘল শাসন আমলে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার কোনো অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়নি। বরং নবাবী আমলের শুরু থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত দেখা গেল রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান কর্ণধাররাই হয়ে উঠলেন হিন্দুরা।

লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডসে (ব্রিটিশ লাইব্রেরী) রবার্ট ওর্ম সংগ্রহ ও হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় প্রাক-পলাশী বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের দু'টি তালিকা পাওয়া গেছে। প্রথমটিতে (রবার্ট ওর্মের তালিকা) দেখা যাচ্ছে– আলিবর্দীর সময় (১৭৫৪-তে) 'দেওয়ান,' 'তান দেওয়ান,' 'সাব-দেওয়ান' 'বক্সি' প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলংকৃত করেছে। একমাত্র মুসলিম বক্সি ছিলেন মীরজাফর।

আবার ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু। বাংলায় ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান ইয়ান কারসেবুমের তালিকাতেও (১৭৫৫ সালের) নায়েব দেওয়ান উমিদ রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য। ১৭৫৪-৫৫ সালের এই যে চিত্র, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় তার কোনোও পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুসলমান রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতেও বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। সিরাজউদ্দৌলার সময় সর্বক্ষেত্রে এই হিন্দু প্রাধান্য আরও বেড়ে যায়।[৫২]

হিন্দুদের বঞ্চিত করা হয়েছিল– এই ধরনের অভিযোগ খ-নের তালিকা ও বর্ণনা আরো অনেক দেয়া সম্ভব।

কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা না-করার নীতি অনুসরণ করেও মোঘলরা স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এ সময়কার দুটি পরিসংখ্যান

থেকে দেখা যায় যে, ষোলো শতকে তারিখ-সম্বলিত ৭৩টি মসজিদ নির্মিত হলেও সতেরো শতকে এ রকমের নতুন মসজিদের সংখ্যা কমে যায়। তখন নির্মিত হয় মাত্র ২৪টি মসজিদ। পরের অর্ধ শতাব্দীতে নির্মিত হয় আরও কম– মাত্র ৮টি মসজিদ। অপর পক্ষে আলোচ্য সময়ে নতুন করে মন্দির নির্মাণে বিপুল উৎসাহ লক্ষ করা যায়। যেখানে ষোলো শতকে তারিখ সম্বলিত মাত্র সাতটি মন্দির তৈরি হয়েছিল, সেখানে সতেরো শতকে তৈরি হয় ৭৪টি। তারপর আঠারো শতকে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের আগে পর্যন্ত ছয় দশকে নির্মিত হয় আরও ১৩৮টি। মুসলিম আমল যত পুরনো হতে থাকে হিন্দুরা ততো প্রাধান্য এবং আত্মবিশ্বাস লাভ করেন।[৫৩]

কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত যে, মুসলমান হওয়ার প্রক্রিয়া সুলতানি আমলেই শেষ হয়ে গিয়েছিল– মোঘল আমলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি। আসলে মোঘলরা ধর্মান্তকরণে কোনো রাষ্ট্রীয় ভূমিকা না পালন করলেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে নবাবী আমলে বাংলায় বিশেষ করে মালদহ, মুর্শীদাবাদ ও হুগলিতে শীয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি ঘটে।

নয়

১৭৫৭ পরবর্তীতে 'হিন্দুদের এগিয়ে যাওয়া' ও 'মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া'-র তত্ত্বটি ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চার কাঠামোভুক্ত প্রত্যয়।

১৭৫৭ সাল নাগাদ হিন্দুরা যেমন মুর্শিদাবাদের শাসনযন্ত্র ও অর্থনীতিতে দৃঢ় অবস্থান নিতে পেরেছিলেন – তেমনি কলকাতায় সাহেব আধিপত্য বিস্তারের অংশীদার হয়ে দুই তরফে 'এগিয়ে ছিলেন'। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের যে প্রধান তিনটি অভিযোগ তার একটি হল নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয় দান।

কলকাতার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের আদি পুরুষরা সেই সময়ে ইংরেজদের বেনিয়ান বা দেওয়ান ছিলেন। কোম্পানির চাকরির ছিল চারটা গ্রেড, 'রাইটার' দিয়ে শুরু।[৫৪] সুতরাং বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী হিন্দুদের কাছে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব ১৭৫৭ সালের পূর্ব ঘটনা। ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। প্রধান ১৯টি জমিদারির মধ্যে ১৮টা ১৭৫৭-র আগেই হিন্দুদের দখলে। অর্থাৎ বাংলার ভূমিমালিকানা কার্যত চলে গেল হিন্দুদের দখলে।

কর্ণওয়ালিশ সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন করেন। ওয়েলেসলি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাইটারদের মান-উন্নয়নের জন্য ১৮০০ সনে কলকাতায় স্থাপন করেন ফোর্ট উইলিয়াম 'কলেজ'। যে সশস্ত্র দুর্গ নিয়ে নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের এত বিরোধ তার নাম ফোর্ট উইলিয়াম 'কেল্লা'– বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা

হরণের প্রধান সশস্ত্র দুর্গ। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কামান নিক্ষেপ করত গোলা। এবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কামান থেকে বের হবে 'কলম'- নির্ভর ইংরেজ কর্মচারী। পরে হিন্দু বাঙালি এবং বাঙালি। রাজকার্য তো চালাতে হবে গদ্য দিয়ে। দরকার গদ্যের– এই গদ্য কেমন হবে? পথ বাৎলালেন ইংরেজরা। হ্যালহেড লিখলেন বাংলা ব্যাকরণ ধরনের কিছু একটা।

সাহেবরা বাংলা জানতেন না। ... কিন্তু তাঁরা বাংলা গদ্যে কি লেখা হবে সেই বিষয়টি জানতেন। সংস্কৃত পি-তরাও বাংলা গদ্য জানতেন না... কিন্তু তাঁরা ঐ বিষয়ের উপযুক্ত ভাষা কী হতে পারে তার একটা আন্দাজ জানতেন...। আঠার শতকের শেষ থেকেই ইউরোপীয়রা সংস্কৃত আবিষ্কার করেন। তারপর থেকেই সংস্কৃতের প্রতি তাঁদের বাধাহীন অনুরাগ।

হ্যালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন : The grand source of Indian literature, the parent of almost every dialect from the Parsian Gulf to the China Seas, is the Sanskrit, a language of the most venerable and unfathomable antiquity.

সাহেব ও ব্রাহ্মণদের ভিতর, ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভিতর এই কার্যকর আপোস- সমঝোতার অন্য একটি কারণও ছিল। ইংরেজদের দিক থেকে সংস্কৃত পি-তরা যেমন বাংলা ভাষার সাহেববোধ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হিন্দু ব্রাহ্মণদের দিক থেকে সাহেবরা হয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যম।[৫৫]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগে ব্যাপক সংস্কৃতায়ন চলতে থাকে। সে সময়ের সমাজে বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে নিশ্চয়ই এমন কোন ঘটনা ঘটে থাকবে– সমষ্টিগত মনোভাবে এমন কোনো পরিবর্তন, যা এই ব্যাপক সংস্কৃতায়নের জন্য দায়ী। মুসলিম শাসনের পরিবর্তে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হয়। সংস্কৃতায়নের পিছনে একক কারণ হিসেবে সেটিই বোধহয় সবচেয়ে প্রধান। যতদিন মুসলিম শাসন কায়েম ছিল ততদিন ফার্সি-উর্দু এবং তার মাধ্যমে আরবীর প্রভাব বাংলা ভাষায় ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পড়েছিল। নতুন রীতির বাংলায় আরবী-ফার্সি বিতাড়িত হয়, তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে সংস্কৃত শব্দাদি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে সবচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের– এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই একমত। আমার মতে, সেই প্রভাবের প্রথম ফলই হল বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন।... বাংলা ভাষা-সাহিত্যেই যদি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান ফসল বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সংস্কৃতায়ন যখন থেকে আরম্ভ, তখন থেকেই রেনেসাঁসের সূচনা বলে ধরতে হবে।[৫৬] সুলতানরা সংস্কৃতকে বিদায় জানিয়েছেন– ইংরেজরা 'স্বাগতম' জানালেন সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে।

প্রথম দিকে ইংরেজদের প্রধান অবলম্বন ছিল বেনিয়ান, দেওয়ান– মুৎসুদ্দী ও যেকোনো মানের রাইটার। কিছু পরে জমিদার ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি- জানা লোক। ক্ষমতার ভাষাকে অতিদ্রুত আয়ত্ত করার মেধা ও কৌশল যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের ছিল তা কিন্তু স্বীকার করাই শ্রেয়। তবে সুলতানি-মোঘল আমল এবং ঔপনিবেশিক আমলের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল। আগে তো হিন্দুদের এগিয়ে যাওয়ার তত্ত্ব আসেনি। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক ইংরেজদের গোলামি করে ভূ-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইংরেজ শাসন অটুট রাখতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে স্থাপিত হওয়ার কারণে কেন তাদের সেলাম ঠুকতে হবে? এ-তো ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির যে দাবি : তারা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই বক্তব্যকেই আলিঙ্গন করা– ঔপনিবেশিকতার ইতিবাচক দিকের পক্ষে ওকালতি করা। অর্থাৎ এটা স্বীকার করা পুঁজিবাদের যুগে ঔপনিবেশিকতার অবশ্যই ইতিবাচক দিক ছিল। এদেশবাসীর উন্নতি-অগ্রগতির জন্য ইংরেজদের সদিচ্ছাকে প্রথমেই যারা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছে তারাই তো এগিয়ে গেল। হিন্দুরা যে এগিয়ে গিয়ে ছিল তার মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি এটাই।

রামমোহনের সাহেবী বাংলা ব্যাকরণ তেমন পছন্দ হয়নি। তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলা ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে। ভাষা নির্মাণে তাঁর ভাবনা কিন্তু ফেলনা নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটে গেছে সেটা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি ইংরেজ শাসন সম্পর্কে ভারতীয়দের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

– যাদের উচ্চাশা আছে এবং যে সমস্ত প্রাচীন পরিবারের লোকেরা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তারা ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করা অপমানজনক মনে করেন। এবং তারা এই শাসনব্যবস্থার প্রতি সুনিশ্চিতভাবে অসন্তুষ্ট।

– আর যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী অর্জন করেছে এবং যারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পেরেছে, তারা শুধু এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়নি তারা ব্রিটিশ শাসনকে দেশের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করে। রামমোহনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য : ভারতীয়দের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তাঁরা মনে করেন যে, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা থাকার উপরই সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নির্ভর করে।[৫৭]

ইংরেজরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে নেতৃস্থানীয় হিন্দু প্রজাদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হল তারা তো হিন্দুদের দেশ মহান ভারতকে দখল করেনি– বরং অন্যায়ভাবে বাংলা ও ভারত দখলকারী স্বৈরতন্ত্রী শাসক মুসলমানদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।

বিশপ হেবার (১৮২৩-২৬) বার বার হিন্দুদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ব্রিটিশ তো তাদের দখল করেনি, তারা আগে থেকেই মুসলমানদের অধীন ছিল। তিনি মনে করিয়েছেন মুসলমান শাসকরা ব্রিটিশদের মতোই রক্তসম্পর্ক বা ধর্মের দিক থেকে ভারতে বহিরাগত আগন্তুক। এবং তারা ব্রিটিশদের চেয়ে ঢের বেশি অত্যাচারী ছিল।[৫৮]

হিন্দু সমাজপতিদের কাছে প্রতিভাত হল ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ হচ্ছে হিন্দুদের জন্য এক দুঃসহ কালো অধ্যায়। তারা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে নিষ্পেষিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে (যা কম-বেশি প্রসারিত বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্ত) রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ভূদেব, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রসহ আরো সব অনেক বিশাল ব্যক্তিত্ব এক নতুন যুগের সূচনা করেন। এঁদের মধ্যে মতের ভিন্নতা ছিল। কিন্তু অতি বড় বিদ্যাসাগর– তিনিও বেদ-বাক্যের ভিত্তিতে সনাতন ধর্মের সংস্কার করতে চাইলেন। এবং এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ইংরেজ শাসকরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছে।

একদিকে কিছু কিছু শোভন সমালোচনাসহ দ্বিধাহীন চিত্তে ব্রিটিশ শাসন, শাসন কাঠামোর অধঃস্তন অংশীদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আন্তরিক সমর্থন এবং অন্যদিকে ভারতের অতীত ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মর্মবেদনাকে টেনে নিয়ে চলল একজাতি তত্ত্বের দিকে। তারা একটি অখ- একজাতি তত্ত্ব খাড়া করলেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতা একটি মতাদর্শ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

আমাদের বুঝতে হবে যে, সাম্প্রদায়িকতা আমাদের প্রায় কিছুই দিতে পারে না। এর ফলে যে প্রচ- ক্ষতি শুধু ভারত-ইতিহাস চর্চার প্রশ্নে হয়ে গেছে তাই নয়, ভবিষ্যতেও আরো অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। যেমন, মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রণয়নের ঢের আগেই ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা তার একটি পূর্বতন সংস্করণ খাড়া করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে একজাতিতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় জাতির মানে হল হিন্দু জাতি, ভারতীয় জনগণ বললে হিন্দু জনগণকে বোঝায়, মুসলমান শাসন ছিল বিদেশি শাসন সুতরাং ভারতীয় মুসলমানরা বহিরাগত বিদেশি মাত্র ছিলেন, ইত্যাদি।[৫৯]

তবুও বিষয়টি দু'এক কথায় আরো একটু খোলসা করা দরকার। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উৎসমূলে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করা যাবে না– মুসলমানরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর হিন্দু নেতারা হুমকির ভাষায় একটি কথা বার বার নানাভাবে বলতে চেয়েছেন।– ভারত হিন্দুদের দেশ অর্থাৎ দেশের মালিকানার

প্রশ্নটিকে তারা তীক্ষ্ণভাবে সামনে আনলেন। মুসলমানদের সামনে-পিছনে যদি ক্রমাগত এই চীৎকার উঠতে থাকে তবে তারাও আত্মরক্ষামূলক বর্ম খুঁজতে থাকবেন। তারা জানে ভারতের মাটিতেই উদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম একপ্রকার নির্বাসিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সুযোগ ঘটে যায় রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃত্বের পক্ষে এ কথা বলার– তাহলে আমাদের ধর্মের লোকেদের দেশটা কোথায়? ভারতের বাইরের বৌদ্ধরা স্বদেশভূমিতে কিভাবে প্রত্যাবর্তন করবে? কিন্তু তবুও একথা উল্লেখ থাকা দরকার ইসলাম অনেকগুলি দেশেই প্রধান ধর্ম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কিন্তু বর্ণিত সমস্যাটির উদ্ভব ঘটেনি।

১৮৫৭ পূর্বকালীন সময়ে দিল্লীর অতন্দ্র প্রহরী গালিব সাম্প্রদায়িকতাকে কোনো গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখেননি। কিন্তু এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ইকবাল যখন বলেন, এই হিন্দুস্তান আমার; তখন একে কোনো ব্যাঘ্রগর্জন বলা যায় না– মনে হয় কোনো একপক্ষের হম্বি-তম্বির সামনে নিজের বা নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে আত্মপরিচয় নতুন করে প্রমাণসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে হচ্ছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র– সকলের লক্ষ্যই মূলত এক। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র জাতীয় মেলা স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে তৃতীয় সভা থেকে এর নাম করা হয় হিন্দু মেলা। এই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ঐতিহ্যের পুনঃরুদ্ধার, হিন্দু মেলায় যে জাতীয়ভাবের প্রকাশ তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সভায় মনোমোহন বসু বলেন, যবন শাসনে হিন্দু স্বাধীন চিন্তা ও স্বাবলম্বন বিলুপ্ত হয়েছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু বলেন, মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম বিনাশের যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে কৃতকার্য হয়নি।[৬০]

কিন্তু তবুও ভারতবর্ষে মুসলিমদের অস্তিত্ব বাস্তবে অস্বীকার করা যাচ্ছিল না– এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে ভূদেব ১৮৬৭ সালে একটা সমাধান দিলেন : ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপনবক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান। এক মাতার-ই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়– সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ- নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে।[৬১,৬২] অদ্যাবধি ভূদেব সমাধানের মধ্যেই ভারতের প্রায় সব ফ্রন্টের হিন্দু নেতৃত্ব ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন।

১৯০১ থেকে ১৯০৬ রবীন্দ্রনাথের সামাজিক রাজনৈতিক রচনাবলীতে স্পষ্ট পুনরুত্থানবাদী অভিমত প্রকাশ পেল, ১৮৮২-৮৫তেও এটা ঘটেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে প্রাচ্য সভ্যতার পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বললেন, রাষ্ট্র নয়, ঐতিহ্যবাহী সমাজই ভারতীয় জীবনের প্রকৃত কেন্দ্র বলে অভিহিত হল। হিন্দু অতীতকে কাব্যময় ভাষায় জাগিয়ে তোলা হল, বাল্যবিবাহকে, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণকে হিন্দু সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অযৌক্তিক বলা হল না। জাতি বর্ণ, এমনকি সতীদাহর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যাথার্থ্য দেখতে পেলেন। ১৯০৪-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ একটি প্রোগ্রামের রূপ পেতে লাগল। মেলা, বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সমাজের পুনর্জীবনের জন্য তিনি বললেন। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজই ভারতীয় ঐক্যকে বিধৃত করবে।[৬৩]

বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র– সোজাসুজি বক্তব্য হল ভারত হিন্দুদের, মুসলমানরা বিদেশি। এরা বিদ্বেষ ছড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

সিরাজ হত্যার দু'শো বৎসর পর সমস্ত কিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করে পথিকৃৎ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ : ক. পলাশীর রক্তাক্ত যুদ্ধের ময়দান পিছনে ফেলে সূর্য যখন গঙ্গায় অস্ত গেল সেই সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটল এবং আধুনিক যুগের শুরু হল; খ. পলাশী আদতেই জন্ম দিল সত্যিকারের এক রেনেসাঁ যা ছিল কনস্তান্তিনোপল পতনের পর ইউরোপীয় রেনেসাঁর চেয়ে ব্যাপক, গভীর এবং আরো বেশি বৈপ্লবিক; গ. দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন বাঙালীদের একটি 'জাতি'তে পরিণত করেছে। জুন, ১৭৫৭-র কারণেই আমরা ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় প্রবেশ করলাম মহান এক নতুন বিশ্বে।[৬৪]

দশ

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি সাম্প্রদায়িক হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘুও অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িক হবে। সংখ্যাগুরুর মানসিকতা সর্বদাই নিশ্চিত রূপে নির্ধারণ করবে সংখ্যাগুরু মানসিকতাকে এবং সংখ্যাগুরুর অসহিষ্ণুতাই সংখ্যালঘুকে অসহিষ্ণু করবে।[৬৫]

এমনভাবেও দেখা যায়, এটা হল আক্রমণাত্মক সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মরক্ষামূলক সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু আত্মরক্ষামূলক হলে তা সব ক্ষেত্রে নির্বীয এবং নিতান্তই প্রতিবন্ধী রূপে প্রকাশ পাবে তা না- হতে পারে।

আমাদের এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হল ঔপনিবেশিক আমলে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার তত্ত্বটি খতিয়ে দেখা। এবং এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশ যথাযথভাবে অনুধাবন করা। আগেও বলেছি তবু বিষয়টি আর একটু তলিয়ে দেখা দরকার। যদিও সারসংক্ষেপেরও কম ছাড়া গত্যন্তর

নেই।

মোটা দাগে বলতে গেলে তিতুমীর জমিদার ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে শহীদ হন। ঐতিহাসিকরা যদি এখনো বায়না ধরে এই যুদ্ধটি ছিল কালের বার্তা উপেক্ষা করে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার একটি দৃষ্টান্ত, তাহলে বলতেই হবে ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চার কাঠামোটি যথেষ্ট মজবুত রয়েছে। কেউ কেউ দু'কূল রক্ষা করেন। এক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার কৌশলী যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। সরাসরি এ প্রশ্নটার মীমাংসা দরকার। ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধ, যা চলল প্রায় শত বছর ধরে এবং যে পর্বে ব্রিটিশবিরোধী এই সশস্ত্র সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বা বিরোধিতা করে আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটেনি, সেই প্রক্রিয়া প্রগতিশীল ছিল না একটি প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতা।

১৭৬০ সালে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দিয়ে জনগণের পর্যায়ে ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের শুরু। এরপর রংপুর কৃষকবিদ্রোহ, ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ, যশোর-খুলনা প্রজাবিদ্রোহ, তুষখালীর কৃষকবিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ইত্যাদি।

সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ- বিরোধী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সীমানা ছিল অনেক বড়। ১৮০২ সালে দিল্লীতে শাহ্ আব্দুল আজিজ ঘোষণা দিলেন 'দারুল হার্ব'– ভারত এখন শত্রু অধিকৃত দেশ। অতএব সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজশাসন উৎখাত করতে হবে। তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া স্থাপিত হল। সৈয়দ আহমেদ শহীদ হলেন ১৮৩১ সালে। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা আসেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। বারাসাতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে জমিদার ও রাজশক্তির পরাজয়। এবং শেষে ব্রিটিশ সৈন্য ১৮৩১ সালে সরাসরি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ ও ধ্বংস করে। তিতুমীরের লাশ পাওয়া যায়নি।

গোলাম মাসুমের সমাধি গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হয়। আর 'ভারতপথিক' রামমোহন রায়ের সমাধিস্তম্ভ তৈরি হয় ইংলন্ডের ব্রিস্টলে। আরো পরে ১৮৫৭ সালের অগ্নিমুহূর্তে বারাসতের ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাদরদী জেলাশাসক ইডেন প্রথমে যে কাজটা করেন তা হল তিতুমীরের গ্রামের আর পরিবারের উপর খবর নেওয়া আর নজরদারি রাখা, কারণ তিতুমীরের ছেলেকে লোকে শাহজাদা বলছে, তার নামে নানা গুজব রটছে। ঐতিহাসিকরা ভুল করেন কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে চরম সঙ্কটের সময় কে তার সম্ভাব্য শত্রু বা মিত্র তাকে চিনতে রাষ্ট্রক্ষমতা ভুল করেনি।[৬৬]

নবাবী আমলের সঙ্গে লাটের শাসনের ফারাক অনেক। এই তফাৎকে বুঝতে, ধরতে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে লোকদের কেটে গেছে গত দুশ বা তারও

চেয়ে বেশি সময়ের ইতিহাস। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির হদ্দ ছাড়িয়ে লোকায়ত রাজনীতির ডাঙায় পা দিয়ে দিলে বোঝা যায় যে সমূহে আর সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার যুগ্ম সম্পর্কে টান দিয়েছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চাপ। ...

স্বদেশে যারা উদারনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের কথা বলতেন উপনিবেশে তাদের তত্ত্ব জন্ম দেয় কর্তৃত্ববাদ ও আমলাতান্ত্রিক বিধিবদ্ধ শাসনের।

এই দ্বিচারিতার অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে দেশজ বুদ্ধিজীবীদের দাবি। বার বার 'সভ্যতা' ও 'প্রগতির' দোহাই দিয়ে, পূর্বতন শাসনতন্ত্র অপেক্ষা নিজেদের শাসনতন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করে ইংরেজ শাসকরা যে ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন, ঊনিশ শতকে তার জের তুলে, তার মধ্য থেকে সংবিধান ও নাগরিকত্বের দাবি জানাবার পথ খুঁজেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা, মুখর হয়ে উঠেছিলেন ইংরাজ শাসকদের 'অ-ইংরেজ সুলভ আচরণে'।[৬৭]

সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভীর মৃত্যুর পর বাংলা পর্যন্ত তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়ার বিস্তৃতি ঘটে। ব্রিটিশ সরকার নাজেহাল। হান্টারের বক্তব্য অনুযায়ী ১৮৫০-১৮৫৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ষোল বার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়। ১৮৬৩ পর্যন্ত এর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ মোকাবেলা করতে ইংরেজদের প্রয়োজন পড়ে ৬০ হাজার নিয়মিত সৈন্যের এক বাহিনীর। ১৮৬৩ সালে আম্বালায় ব্রিটিশ বিপর্যয়ের পর তারা কতগুলি বিচারের প্রহসন করে। শত শত মুসলিম মুজাহিদকে ফাঁসি এবং যাবজ্জীবন কারাদ- দেওয়া হল বহু সংখ্যক মুজাহিদদের। যুদ্ধের এই দীর্ঘ সময়কালে এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো বিরোধিতা বা সাম্প্রদায়িক হানাহানি হয়েছে এর কোনো প্রমাণ নেই।

ফরায়েজী আন্দোলনও ছিল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন থেকে উদ্ভূত। হাজী শরিয়তুল্লাহ নেতৃত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফরায়েজী শব্দের অর্থ হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। এই সময় মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র দেখা যায় ইসলামী আন্দোলন। এসবের প্রবক্তাগণ ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ফরায়েজী আন্দোলন দেশি-বিদেশি অত্যাচারী শোষককুলের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের আহ্বান জানান। হিন্দু জমিদার ও কোম্পানির শোষণের ফলে সর্বস্বহারানো প্রজারা সহজেই ফরায়েজী আন্দোলনে শরিক হন। বাংলায় নেতৃত্বহারা নির্যাতিত মুসলমানরা তথাকথিত এগিয়ে চলার অন্যতম বাহন ইংরেজি শিক্ষার এলাকার বাইরে অবস্থান করেও নিজেদের মধ্য থেকেই নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটায়। ১৮৬৩ থেকে ৭০ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নির্মমভাবে এই জেহাদী আন্দোলনকে দমন করে। এই সময়কালে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার জোয়ারও এই দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা তো ছিলই কিন্তু ঢাকার জমিদার শ্রেণী রক্ষণশীল মুসলমানদের সহযোগিতায় ইংরেজ সরকার ও তার পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে হাজী শরিয়তুল্লাহকে ১৮৩১ সালে রামনগর ও নয়াবাড়ি থেকে বহিষ্কার করে। হাজী শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কেঁপে উঠে জমিদার ও ইংরেজরা। তিতুমীর ও শরিয়তুল্লাহ এক ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম ও জাতীয় যুদ্ধের সমন্বয়মূলক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটান। তাঁরা বুঝেই গিয়েছিলেন জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তাঁরা পিছপা হননি, যত ত্রুটিই থাক সাহসের এই গৌরবগাঁথা তাদের প্রাপ্য।

হিন্দু জমিদারদের সঙ্গেই তো সংঘর্ষ হবে এবং হলেই তা যদি সাম্প্রদায়িক হয় তবে বলতে হবে ঐতিহাসিকরা তখন আসলে নিজেরাই একটা সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কেননা, সমস্ত প্রেক্ষাপটের মূলে আছে বিদেশি ইংরেজশাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। যারা সেই সময়কালে ইংরেজ আশ্রয়ে পুষ্ট তাদের উত্তরপুরুষদের একটা দায় থেকে যায় ইংরেজ আনুগত্যকে যেন-তেন প্রকারে একটা প্রগতিশীল চরিত্র দান করা। ইতিহাস চর্চার এই ডিসিপ্লিনটা ভেঙে দিতে হবে। পুরনো গবেষণা এবং সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখায় (যথা রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস রচনা) ইসলাম ছাড়া ভারতবর্ষে আর যত জাতি-ধর্মের মানুষ এসেছেন, তারা সবাই এক বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতায় মিশে গেছেন। ভারতীয় ইসলাম যে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান ঐতিহ্য থেকে যথেষ্ট আলাদা, সে প্রসঙ্গটি এরা সযত্নে এড়িয়ে যান। এছাড়া মধ্যযুগীয় মুসলমান রাজাদের প্রসঙ্গ নিয়ে শোষণের যে-ছবিটি এঁরা আঁকেন তা আদ্যিকালের গবেষণা-রসদ নির্ভর। দুটি সম্প্রদায়ের পৃথক সত্তার ছবিটি বর্তমানে জোরদার হয়েছে পোস্ট-মডার্ন চিন্তাধারায়।[৬৮]

১৮৪০ সালে শরিয়তুল্লাহর মৃত্যু হয়। এর পর অল্প বয়সেই তাঁর একমাত্র পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুদু মিয়া দু'জন জমিদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত জমিদারদের কোণঠাসা করে ফেললে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকবৃন্দ, জমিদার ও নীলকররা একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁকে ধ্বংস করতে যাবতীয় ব্যবস্থা করে। দুদু মিয়া ছিলেন একজন অসামান্য বিচক্ষণ ব্যক্তি। শহীদ তিতুমীরের অভিজ্ঞতা খেয়ালে রেখে তিনি সুকৌশলে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। গ্রেফতার ও কারাবরণ প্রক্রিয়ায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া মৃত্যুবরণ করনে।

কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন নয়া মিয়া। নবীনচন্দ্র সেনের মন্তব্য : এই সময় কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়া মিয়ার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে তিনি নিজের একটি আলাদা রাজ্য গঠন করেন। দেখা যাচ্ছে, শত বছর ধরে জমিদার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি বেশ গভীরভাবে জড়িত ছিল।

বঙ্গভঙ্গ রদ পর্যন্ত এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতার খোঁজ পাওয়া যায়। ১৮৪৭'র আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনাধীনে ফরায়েজীরা জুমা ও ঈদের নামাজ পড়ত না। আসলে শত্রু অধিকৃত দেশের ধারণা বজায় ছিল।[৬৯]

ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে নতুন ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে তাঁরা কৃষক-কারিগর-উপজাতি-বিদ্রোহগুলি সমর্থন করেননি। এমনকি তাঁরা ফরায়েজি-ওয়াহাবি আন্দোলনের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেননি। ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহেও তাঁরা দূরত্ব বজায় রেখে বিরোধিতাই করেন। অবশ্য তার কারণও ছিল। ব্রিটিশ শাসনের উপর নির্ভরশীল এই শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনকে মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের তুলনায় একটি অগ্রসর অবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করেন। তাই শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে তাঁরা বিদ্রোহগুলির প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাজসংস্কারের মাধ্যমেই জাতীয় চেতনার ধারাটিকে উজ্জীবিত করেন। সুতরাং সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে দুটো ধারা প্রবাহিত হয়, আর তাদের শ্রেণীগত অবস্থানও ছিল পৃথক। এই দুটো ধারার অর্থাৎ কৃষক কারিগর-উপজাতি-নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের আর ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত সমাজসংস্কারের আন্দোলনের ক্ষণিক মিলন লক্ষ করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলচাষীদের বিদ্রোহের সময়... এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার ফলে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কোনো ঝুঁকি নিতে হয়নি।[৭০]

পরবর্তীকালে চরমপন্থী পর্বের আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি 'জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী' তাঁদেরই বলছি যাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং বিদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংস করে জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য প্রয়াসী হন।... এঁদের মধ্যে বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে, প্রমথনাথ মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সূর্য সেন, ভগৎ সিং ও সুভাষচন্দ্র বসু যে ধারাটির প্রতিনিধিত্ব করেন তাকেই জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী ধারা হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়।[৭১]

তিনি ফরায়েজি আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরো বলেন, যেভাবে ফরাজি মতবাদ রূপায়িত করার চেষ্টা হয় তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ফরাজিরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে। হিন্দুদের ও সাবেকী মুসলমানদের ধারণা হয় যে, ফরাজিরা ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল তাই।

ফরাজি মতবাদ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রসারিত হবার ফলে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা হয়। জমিদার ও নীলকরদের পক্ষে অবাধে কৃষকদের নিপীড়ন করা কষ্টকর হয়, তেমনি ফরাজি প্রভাবিত অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। স্বভাবতই তাদের সঙ্গে ফরাজিদের বিরোধী অনিবার্য।

ফরাজি আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হয় সেইসব অঞ্চলেই যেখানে অগণিত মুসলমান কৃষকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ছিল হিন্দু জমিদারেরা। লক্ষণীয় এই যে, কোনো অর্থবান মুসলমান ফরাজি মতবাদ গ্রহণ করেননি। তাছাড়া অনেক গোঁড়া মুসলমানও ফরাজিদের দ্বারা প্রচারিত আচরণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেননি। আর যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে ফরাজি আন্দোলন পরিচালিত হয় তার সঙ্গে অর্থবান ও শহরবাসী মুসলমানদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকায় তাঁরা ফরাজিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হননি। সুতরাং ফরাজি মতবাদ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদেরই উদ্বুদ্ধ করে এবং পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ মুসলিম সমাজে প্রসারিত হয়।[৭২] আমরা জানি ফরায়েজি এবং তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলন সম্পর্কে অমলেন্দু দে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ওয়াহাবিদের সংগ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৮০০ থেকে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল তাতে সমাজের বিভিন্ন শক্তিগুলোর একটা সাময়িক বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা চলল। সমাজের মধ্যে একটা আর্তবাহী অসন্তোষ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হতে থাকল। এর পর ভারতের জনসাধারণের এই অসন্তোষকে সংগঠিত করতে কৃতসংকল্প হলেন ভারতীয় ওয়াহাবিগণ। ওয়াহাবিগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন এক অধ্যায় সংযোজন করলেন। ওয়াহাবিদের লড়াই ভারতের আদিতম এবং সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক ব্রিটিশবিরোধী লড়াইগুলোর মধ্যে অন্যতম। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় ওয়াহাবিদের ব্রিটিশবিরোধী লড়াই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো ঐতিহাসিক রচনাতেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী এই মহান সংগ্রামকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি।[৭৩]

কিন্তু লক্ষ্যণীয় অমলেন্দু দে, 'জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী' বলে যাদের মনে করেছেন তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তাদের প্রাথমিক সর্তই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তারা 'জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী' হিসেবে ভারতের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে বিখ্যাত হতে পারলেন। কিন্তু তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া বা ওয়াহাবিদের অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ব্রিটিশবিরোধী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রায় একশ' বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া ফরায়েজি আন্দোলনের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা যথাযথ মূল্যায়ন করতে অদ্যাবধি কোনো ভূমিকা পালন করেননি।

তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া ও ফরায়েজীদের সংগ্রাম চলাকালীন অবস্থায় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ১৮৫৭-৫৮ সালের এই মহান মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। ব্রিটিশদের ভয়াবহ অত্যাচার নেমে এল হিন্দু-মুসলমান সকলের ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৫৭-র বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ করে কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন। তাদের ধারণা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলমানদেরই এবং নেতৃত্বও এসেছে তাদের কাছ থেকে। হিসেব করে দেখা গেছে যে বিদ্রোহের সময় ও বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে শুধু দিল্লীতেই অন্তত ২৭,০০০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। পরেও বহু দিন ধরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের দেখত গভীর সন্দেহের চোখে।[৭৪]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন সময়ে বিদ্রোহের নেতারা প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের বিশ্বাস করত না। কয়েক বছর আগের একটি রচনায় রজতকান্ত রায় দেখিয়েছেন : পার্শী এবং বাঙালিরা শ্বেতাঙ্গ বা খ্রিস্টান ছিল না, তথাপি বিদ্রোহীরা তাদের উপেক্ষা করতে পারেনি এ জন্য যে, দিল্লির বাইরে থেকে তারা ইংরেজ শিবিরে মদ্যাদি সরবরাহ করত। নানাসাহেব এই মর্মে আদেশ জারি করেছিলেন যে, 'শহরের বাবুদের এবং ইংরেজি লিখতে-পড়তে পারে এমন লোকেদের ডান হাত এবং নাক কেটে দেওয়া হোক।' কিন্তু সময়মতো ব্রিটিশ বাহিনী এসে পড়ায় তারা রক্ষা পেয়েছিল। গভীরভাবে জনমানসে এই ধারণা স্থান পেয়েছিল যে, যে-সমস্ত দেশীয় লোক ইংরেজদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল তাদের খ্রিস্টান ও পারিহা বলে বর্জন করা হয়।[৭৫]

কেন বখৎ খাঁ ক্রোধে ফেটে পড়েছিল যখন রিসলার সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের জনৈক কেরানি বেরিলির বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাজ করার জন্য হাজার টাকার চাকরি নিতে অস্বীকার করে? "নমকহারাম! বেইমান! হাজার রূপেয়া তংখা ভী কবুল নহী করতে?" "আংরেজ আউর বঙালি সব এক হ্যায়, তুমকো নহী মালুম

হ্যায়, কি হম্ অভি তুম্হারা গর্দন কাটনে কা হুমুক দে সক্তা হ্যায়... খুব মালুম হ্যায় কী আংরেজা কে সাথ তুম্হারী সাজিস্ হ্যায়!" – ইংরেজ এবং বাঙালি সব এক। তুমি জান না যে, আমি এখনই তোমার গর্দানটা কেটে ফেলার হুকুম দিতে পারি... বেশ ভালোভাবেই জানি যে, ইংরেজের সঙ্গে তোমার যোগসাজস্ আছে।[৭৬] মোটাদাগে একথা কথা বলা যাবে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। একেবারেই ব্যতিক্রম ছিল না এটা বলা সঙ্গত হবে না।

সরাসরি যুদ্ধে ভারতীয়রা হেরে গেল বটে কিন্তু তার থেকে বড় হার হল এদেশের মানুষ ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য একশো বছর ধরে যে একটি মাত্র রাস্তা অর্থাৎ বিদ্রোহের রক্তাক্ত পথ শত নির্যাতন উপেক্ষা করে বহাল রাখতে পেরেছিল তা বরবাদ হয়ে গেল। এর অর্থ এটা নয় যে বিদ্রোহ-সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা হল তা হচ্ছে ইংরেজদের দালাল ও সহযোগীরাই এবার ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে কিভাবে সুযোগ-সুবিধা নেয়া যায় ও সে জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার আন্দোলন চালানো যায় সেই লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অর্থাৎ তোয়াজ-তদ্বিরের নতুন মাধ্যমের সূচনা করলেন। কয়েক দশক ধরে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের নেতৃত্বে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকল। সে ধারা এক অর্থে বর্তমান কাল অবধিও চালু আছে।[৭৭]

শুরু হল মুসলমানদের তথাকথিত এগিয়ে চলার কাফেলায় যোগদান পর্ব।

মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরি করবেন – ওকালতি, মোক্তারী ধরনের পেশাতেও যোগ দেবেন। মোট কথা ইংরেজদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বিপরীতে দেখা গেল স্যার সৈয়দ আহমদকে। বাংলায় প্রথম যে তিনজন ব্যক্তি সমাজের অগ্রগতি অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন এঁরা হলেন, নবাব আমির আলী, আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী। উত্তর প্রদেশের মৌলানা মুহম্মদ কাশিম ননৌতভীর পরিচালনায় দেওবন্দে শোভন ইসলাম চর্চা শুরু হল। এই উভয় গ্রুপই ওয়াহাবী-ফরাজীদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের সহযোগিতায় তাঁদের নির্ধারিত পথে অগ্রসর হন।

তিনটি কেন্দ্র হল : আলিগড়, কলকাতা ও দেওবন্দ।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ রাখলে চলবে : বাংলার মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ইংরেজী শিক্ষা ও চাকড়ির প্রশ্নে হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। ইংরেজদের প্রশ্রয়ের আলোকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার একটা চেহারা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সুযোগ এই নিয়েই বিরোধ এবং ক্রমাগত তা উত্তপ্ত হতে থেকেছে।

শিক্ষা নিয়ে যে তিক্ত বিতর্ক এবং বলতে গেলে এখান থেকেই শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্রতার মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রামে জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান– জমিদারবিরোধী লড়াইয়ে কৃষকরা ভূমিকা নিতে গেলে কলকাতায় থাকা জমিদাররা আওয়াজ তোলে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও দাঙ্গা শুরু করেছে। আসলে ১৯০৫ ও স্বদেশী আন্দোলন পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যের ঐতিহাসিক সূত্রপাত ও বিস্তারের লক্ষণ দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গের গ্রাম-গঞ্জ থেকে যারা 'এগিয়ে যেতে' কলকাতায় যাচ্ছিলেন তাঁরা দু' ধরনের হিন্দু-মুসলমান বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের কথা কেউ সম্ভবত ঘুণাক্ষরেও ভেবে দেখেননি। ১৯৩৭- এর নির্বাচনের পরও মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমির কথা ভাবেনি। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মুসলমানরা কংগ্রেসকে হিন্দু স্বার্থের সংগঠন মনে করছে।

৪০'র দশক পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে রক্ষণশীল মুসলিম নেতারা হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আচরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে থাকেন। তাছাড়া মুসলিম প্রজাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিল– অত্যন্ত অপমানজনক ও তিক্ত, ফলে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত আবেদন বিফলে যায়নি – একটা অংশের মধ্যে এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৪০-এর আগে বাঙালি মুসলমানরা সম্ভবত বিশ্বাসই করতেন না– এক হাজার মাইল দূরের মুসলিমপ্রধান একটি বেশ বড় অঞ্চলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভবিষ্যতে একটা মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করবেন। ভারতের মুসলমানরা এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। অস্তিত্ব সংকটের উদ্ভব ঘটে ঔপনিবেশিক কূটকৌশল ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির কংগ্রেসে দৃঢ় অবস্থান এবং কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান ও অন্যান্য অ-হিন্দুদের প্রতি ঐতিহাসিক উদাসীনতা ও অবজ্ঞার ফলে।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে বাঙলা বাদে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ফলাফল সুবিধাজনক ছিল না। অথচ ১৯৪৬-এ দেখা গেল এমনকি ভারতের দক্ষিণের প্রদেশগুলিতেও মুসলিম আসনগুলিতে মুসলিম লীগের বিরাট বিজয় হল। অর্থাৎ কংগ্রেসকে অবিশ্বাস, কিন্তু ভারত ভাগ হলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা মুসলমানদের অবস্থা যে আগত অনেক অনেক দশক পর্যন্ত চরম হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে সেটা তারা বুঝেও রায়টা দিল মুসলিম লীগের পক্ষে।

মুসলমানদের সমস্যাকে আলাদাভাবে কেন গুরুত্ব দিতে হবে সে প্রসঙ্গে কংগ্রেস সময়সময় বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এসেছে। তাৎপর্যপূর্ণ কোনো গুরুত্বই কংগ্রেস দিতে রাজি হয়নি।

সুতরাং বাঙালি মুসলমানদের সমস্যা তখন ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান ও ভারতীয় মুসলমান। বিরাট এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এক জাতিতত্ত্ব'র প্রতিক্রিয়া হিসাবে দ্বি-জাতিতত্ত্বে'র যে উদ্ভব– বিষয়টিকে সেভাবে ভাবতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবিত কংগ্রেসী ঐতিহাসিকরা না দেখার ভান করে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে চলেছেন একজন বিখ্যাত বিতাড়িত কংগ্রেস নেতা জিন্নাহ'র উপর– ভাবখানা একজন ব্যক্তি জিন্নাহ ভারত ভাগের জন্য দায়ী। অবশ্য গত দুই-তিন দশক ধরে ভারতের ঐতিহাসিকদের অনেক মধ্যে আগের চিন্তা বর্জনের প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বাঙালি মুসলমানরা ৩০-৪০ দশকে এটা বুঝে গিয়েছিল বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু শত শত বছর ধরে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে অগ্রসরমান ছিল তাকে খতম করা হয়েছে। বাঙালি হিন্দুরা আর শুধু মাত্র বাঙালি হিন্দু নেই তারা ভারতীয় হিন্দুর স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। হঠাৎ করে যেন বাঙালি মুসলমানরা তাদের কাছে এক বিদেশী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হল– যা ছিল সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ও চরম বেদনাদায়ক এক মর্মান্তিক ঘটনা।

যখন একই ভাষাভাষী হলেও ভারতের অনেকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাঙালি হিন্দুরা 'ভারতীয় হিন্দু এক জাতি'-তত্ত্বের মধ্যে বিলীন হতে থাকে তখন বাঙালি মুসলমানদের উপলব্ধির জগৎ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মকা-ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় শত শত বছর একসঙ্গে বসবাস করার পর যখন ধর্মীয় পরিচয়কে (শ্রেণী সমস্যা ও সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করে) প্রাধান্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের উস্কানির মুখে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার ভূমিকায় যেতে থাকে তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘৃণার পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। সাম্প্রদায়িকতা নিজেই তখন একটি রাজনৈতিক ক্ষমতা।

পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ববাংলার মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হল। কিন্তু দেশবিভাগের সময় নোয়াখালিসহ দু' একটি স্থান ছাড়া কোনো বড় ধরনের দাঙ্গা হয়নি। এখনো দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ বিলুপ্ত না হলেও দাঙ্গা করবে, হত্যা করবে— তা বোধ হয় তারা ভাবে না। তবে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি নাজুক। এই বাংলাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছুই হয়েছে। আমার ধারণা কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলরা যদি বাংলাদেশে একটা অর্থহীন শক্তিতে পরিণত না হত তবে

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার এক অদৃশ্য চাপ দৃশ্যমান হতে পারার পরিস্থিতিকে ঠেকিয়ে দিতে পারত। বাংলাদেশে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগত সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক শক্তি কাজে লাগাতে পারে। এ ব্যাপারে ভারতের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শক্তির ভূমিকাই শেষ ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িয়ে ছিল তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে। ঠিক তেমনি বাংলার কৃষক ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মুসলমানদের অস্তিত্ব যায় যায় হিন্দু জমিদারদের কারণে। এজন্য দেখা যায় ইংরেজরা ভারত দখলের পর ইংরেজের বিরুদ্ধে শত বছরের সশস্ত্র যুদ্ধে মুসলমান বাঙালীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকছে। একদিকে শ্রেণী, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা। এবং এর সমাধান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া সম্ভব নয়, এ বিষয়টি তাদের বোধগম্য হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের নেতৃত্বে সব মুসলমানদের স্বার্থ এক– এই আওয়াজে গরিব মুসলমানরা বড়লোক মুসলমানদের সঙ্গে একপ্রকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রকৃত অর্থে শ্রেণী, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে নেতাদের প্রধান অংশ আপোসের পথেই থাকলেন।

পূর্ববঙ্গে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমর্থনেই হাজার মাইলের ব্যবধান নিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হল। গরিব মুসলমানরা ক্ষমতার প্রশ্নে নেতৃত্বের কথা ভাবেননি। ধনিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তরা সে সুযোগ তাদের দেয়নি। ফলে এবার দিতে হল রক্ত, সম্পদ, ইজ্জত ও জীবন। বাংলাদেশ কায়েম হল।

আজকের দিনে ভাষা বা ধর্মীয়ভিত্তিতে গঠিত জাতিরাষ্ট্র নিপীড়িত মানুষের কোনো মুক্তি দিতে পারে না। অভিজ্ঞতা বলে দিচ্ছে– নিজেদের অবস্থা বদলে নিতে হলে শ্রেণী, সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই। শরীয়াভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের নামে গরিব মুসলমানদের আবারও শ্রেণী সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টার ত্রুটি নেই। অন্যদিকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্রের নামে চলছে জঘন্য শক্তি প্রয়োগ ও ভাঁওতা।

বাঙালী মুসলমানদের আত্মপরিচয় সংকট একটি আরোপিত বিষয় মাত্র। জন্মভূমি, ভাষা, উৎপাদন-অর্থনীতি, ইহলৌকিকতা, দেহবাদিতা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, রাজনীতি, শ্রেণীসমস্যা ইত্যাদি নিয়েই তার আত্মপরিচয়। সংস্কৃতির ফরমাইশি কাঠামো দলীয় কারখানায় তৈরী করা যায় না। বাঙালী মুসলমান বলে কোনো একক স্বতন্ত্র সত্তা কখনো ছিল না, আজও নেই। বরং এই ধরনের ধারণা সৃষ্টি ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার পক্ষেই যাবে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না রেখে বিচ্ছিন্নভাবে এর যে কোনো মূল্যায়ন আমাদের প্রতারিত করবে।

গ্রন্থনির্দেশ

১. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, পৃ. ২৫, অবসর, ঢাকা

২. তপন রায় চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০০৯, পৃ. ১৯৪, আনন্দ, কলকাতা

৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ১৯৯৫, পৃ. ৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, ১৯৯৯, পৃ. ৩১, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

৫. আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, ২০০১, পৃ. ৪২, অনন্যা, ঢাকা

৬. তরফদার, ঐ, পৃ. ৪

৭. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ১৯৯৮, পৃ. ১৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৮. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ১৬

৯. কাজী রফিকুল হক, সংকলন ও সম্পাদনা, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, ২০০৪, পৃ. ৬,৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১০. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খ-, ১৯৮২, পৃ. ৯৬-৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১১. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, ২০০৯, পৃ. ১২৭, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

১২. ঐ, পৃ. ১২৮

১৩. ঐ, পৃ. ১৩৮

১৪. ঐ, পৃ. ২৪৩

১৫. Carter Vaughn Findley, The Turks in the World History, 2005, p. 97, Oxford University Press, New York.

১৬. এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ, *ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা ১২০৬-১২৯০*, অনুবাদ ও ভূমিকা- অনিরুদ্ধ রায়, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৭, পৃ. ৩২, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৭. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Forntier (1204-1760)*, 2002, pp. 23-28, Oxford University Press, New Delhi.

১৮. হবিবুল্লাহ, ঐ, পৃ. ৩২

১৯. ঐ, পৃ. ৭৯
২০. করিম, ১৯৯৯, পৃ. ৮০
২১.হবিবুল্লাহ, ঐ, পৃ. ৩৩
২২. করিম, ১৯৯৯, পৃ. ৯৪
২৩. করিম, ১৯৯৪, পৃ. ২১২
২৪. Richard M. Eaton, ঐ, p. 28
২৫. হবিবুল্লাহ, ঐ, পৃ. ৮৬
২৬. করিম, ঐ, পৃ. ২১৪-১৫
২৭.মাহমুদ মামদানি, *ভাল মুসলমান মন্দ মুসলমান*, ২০০৬, পৃ. ১১৫, ছাতিম বুকস, কলকাতা
২৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খ-, ১৯৮২, পৃ. ৪৯৪-৫০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২৯. ডক্টর এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খ-, ১৯৮২, পৃ. ৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩০. ঐ
৩১. আহমদ শরীফ, *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, ২০০৩, পৃ. ১৩-১৪,১৬,২৬, সময়, ঢাকা
৩২. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ৭২-৭৩
৩৩. করিম, ঐ, পৃ. ১৮৬-৮৭
৩৪. রহিম, ঐ, পৃ. ৮৬
৩৫. রহিম, ঐ, পৃ. ১৫০
৩৬. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ২৯,৬৯
৩৭. বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খ-, পৃ. ২৫০, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
৩৮. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ৮৩
৩৯. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ৬৫
৪০. তরফদার, ১৯৯৫, পৃ. ৬৩-৬৪
৪১.ঐ, পৃ. ৬২-৬৩
৪২. করিম, ঐ, পৃ. ১৭৩
৪৩. ঐ, পৃ. ১৮৪-৮৫
৪৪.শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল*, ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৮৮, পৃ. ৫৮, কলিকাতা
৪৫. ঐ, পৃ. ২০১
৪৬. করিম, ঐ, পৃ. ২৭৫
৪৭.ঐ, পৃ. ৩০৩

৪৮. মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেন শাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮*, ২০০১, পৃ. ২০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৪৯. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ১৯৯৫, পৃ. ১০-১১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৫০. তরফদার, ২০০১, পৃ. ১৬৩, ১৯৮, ১৯৯
৫১. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন*, ১৯৯৮, পৃ. ১৩, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা
৫২. সুশীল চৌধুরী, *পলাশীর অজানা কাহিনী*, ২০০৪, পৃ. ৬২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৫৩. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, পৃ. ৪৬, অবসর, ঢাকা
৫৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, *পুরনো কলকাতার কথাচিত্র*, ১৯৭৯, পৃ. ৩৫৭-৫৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫৫. দেবেশ রায়, *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য*, ১৯৯০, পৃ. ৭১-৭২, প্যাপীরাস, কলকাতা
৫৬. গোলাম মুরশিদ, *কালান্তরে বাংলা গদ্য*, বৈশাখ-১৩৯৯, পৃ. ১৮৭, ১৮৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
৫৭. অমলেন্দু দে, সম্পাদনা, অলককুমার ঘোষ, নিখিল সুর, *ভারতের ইতিহাস– নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০০৫, পৃ. ১২০, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৫৮. মুশিরুল হাসান, *দি মিথ অব ইউনিটি, কলোনিয়াল অ্যান্ড ন্যাশনাল ন্যারেটিভস-* ডেভিড লাডেন সম্পাদিত *মেকিং ইন্ডিয়া হিন্দু* গ্রন্থে সংকলিত, ২০০৭, পৃ. ১৮৬, ২০৮, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী
৫৯. রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপানচন্দ্র, *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা*, ১৯৭৬, পৃ. ৭১, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা
৬০. কমলকুমার ঘটক, *হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ও রাজনারায়ণ বসু*, সম্পাদনা অলককুমার ঘোষ, নিখিল সুর, *ভারতের ইতিহাস নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০০৫, পৃ ১৪২-৪, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৬১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, ২০০৯, পৃ. ১৬৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৬২. তপন রায় চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০০৯, পৃ. ১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৬৩. পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ*, ২০১০, পৃ. ১১৪-১৫, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

৬৪. যদুনাথ সরকার, *The History of Bengal*, vol. II, Dacca University, ১৯৭৬, পৃ ১৯৭-৯, ঢাকা
৬৫. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় মুসলমানদের সংকট*, পৌষ-১৪০৯, পৃ. ১১১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা
৬৬. গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান*, ১৯৯৮, পৃ. ২৯৯, সুবর্ণরেখা, কলকাতা
৬৭. ভদ্র, ঐ, পৃ. ৩০২, ৩০৭
৬৮. রায় চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৬৪
৬৯. ড. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, *ফরায়েজি আন্দোলন : আত্মসত্ত্বার রাজনীতি*, সম্পাদনা ফাহমিদ-উর-রহমান, ২০১১, পৃ. ৪১-৫৭, বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা
৭০. অমলেন্দু দে, *শ্রী অরবিন্দ ও ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন (১৮৭৬-১৯৪৭)*, ২০০৬, পৃ. ১০-১১, রক্তকরবী, কলকাতা
৭১. অমলেন্দু, ঐ, পৃ. ৮-৯
৭২. অমলেন্দু দে, *ফরায়েজি আন্দোলন : আত্মসত্ত্বার রাজনীতি*, সম্পাদনা ফাহমিদ-উর-রহমান, ২০১১, পৃ. ৪১-৫৭, বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা পৃ ১০৯-১১০
৭৩. শান্তিময় রায়, *ফরায়েজি আন্দোলন : আত্মসত্ত্বার রাজনীতি*, সম্পাদনা ফাহমিদ-উর-রহমান, ২০১১, পৃ. ৪১-৫৭, বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা পৃ ১০৯-১১০
৭৪. বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (অনুবাদ: ব্রজদুলাল চট্টপাধ্যায়), ২০০০, পৃ. ২৯, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া
৭৫. রজতকান্তি রায়, 'শাহী হিন্দুস্তানী জেহাদ'-এর রাজনৈতিক তত্ত্ব ১৮৫৭, সম্পাদনা, অলককুমার ঘোষ, নিখিল সুর, *ভারতের ইতিহাস – নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০০৫, পৃ. ১৫৮, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৭৬. ঐ, পৃ. ১৭০-৭১
৭৭. নূর মোহাম্মদ, *পলাশী যুদ্ধের কারণ : ইতিহাসের পুনর্পাঠ*, ২০১৪, পৃ. ১৫৫, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

[লেখক: সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক ও গবেষক।]

বাঙালি মুসলমানের ফাঁড়া

স লি মু ল্লা হ্ খা ন

'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, আর এখন যা বলছেন শুনলে দেশের সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না'– এই কথা আহমদ ছফা ১৯৭২ সনে বলেছিলেন। (ছফা ১৯৭২)

১৯৯২ সনে এসে তিনি ফের বলেছেন: 'আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালরা সমাজকে কিছু দিতে পারছেন না। একটা ক্রাইসিস চলছে।' (ছফা ১৯৯২) প্রমাণস্বরূপ তিনি উপন্যাসের উদাহরণ দিয়েছেন: 'আমি নিজে চেষ্টা করে ছয়টি বাংলা উপন্যাস জার্মানীতে অনুবাদ করানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।'

> আশ্চর্যের কথা হলো ওখানে পাঠানোর মতো ছয়টি উপন্যাস আমি পাইনি। বঙ্কিম বাংলা গদ্যে রেনেসাঁর সূচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি গোঁড়া সাম্প্রদায়িক। তার নাম উচ্চারণ করলেও অজু করতে হয়। তারপরও তিনি সমগ্র বাংলা গদ্যকে একটা স্টার্টিং দিয়েছিলেন। এটা আমাদের সাহিত্যে কেউ দিতে পারেননি। (ছফা ১৯৯২)

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমান সমাজে মজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) উপন্যাস বিপুল আদর লাভ করেছিল। ১৯১৪ সনে ছাপা তাঁর *আনোয়ারা* এখনো ঘরে ঘরে সমাদর পায়। 'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধে আহমদ ছফা যুক্তি দিয়েছিলেন, *শহীদে কারবালা, জঙ্গনামা* প্রভৃতি দোভাষী পুঁথির জগতে মুসলমান কৃষক সমাজের যে অপরিণত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল, উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেনে এসেও তা বহুলাংশে অপরিবর্তিত থেকে গেছে। (ছফা ১৩৯৫)

ভারতব্যাপী জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উন্মেষযুগেও বাঙালি মুসলমানের চৈতন্য কোন পর্যায়ে ছিল তা বোঝার জন্য নজিবর রহমানের লোকপ্রিয় উপন্যাস *প্রেমের সমাধি* থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। এই উপন্যাসের নায়িকা মরিয়ম স্কুলমাস্টার স্বামীকে না জানিয়ে নিজে থেকে কিছু টাকা জমান। সুদে খাটানো সে টাকার অনেক মুনাফা তার ঘরে আসে। মরিয়মের এই সাফল্যের গোপন কথা

লেখক ফাঁস করেন এভাবে: 'মরিয়ম সতী, টাকা পবিত্র– সতীত্বের গুণে মরিয়মের টাকায় এত মুনাফা।' (ল্যাম্বার্ট ১৯৬৩: ২৬০-৬৩)[১]

মুনাফার হার সম্পর্কে এই থিয়োরি অনেক অর্থশাস্ত্রবিদের থিয়োরির চেয়ে তেমন মন্দ নয়। এতে আমি আহমদ ছফার থিসিসেরই আরেকটা সমর্থন পাই। ধনদৌলতের প্রতি নজিবর রহমানের যে ইতিব্যঞ্জক মনোভাব দেখা যায়, মুনীর চৌধুরীর মতে, পরকালের বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তা আর পাওয়া যায় না। (ল্যাম্বার্ট ১৯৬৩: ২৬০-২৬৩)

সম্পত্তিবান ও আমলা-ভূস্বামী শ্রেণীর বিরুদ্ধে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আক্রোশটা প্রকাশিত হয় একটা অলীক সাম্যবাদী ভাবাদর্শরূপে, যা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় পশ্চাৎপদ সমাজের অবস্থান থেকে নবাগত ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে মাথা ঠোকারই সামিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ আধুনিক বলে বন্দিত ঔপন্যাসিক আর আকবর হোসেন প্রভৃতি ঔপন্যাসিক– যাঁরা গ্রাম্য বলে নিন্দিত– উভয় দলই এক ধরনের উঠতি মধ্যবিত্তের ক্রোধ ও লিপ্সাকে নীতিবাক্যের মোড়ক পরিয়েছেন। আহমদ ছফার দুঃখকে তাই নিছক আক্ষেপ বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

গত বিশ-একুশ বছরে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপত্তনের সূত্রে শাসকশ্রেণি গড়ে উঠতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে প্রাথমিক ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন ও ভদ্রসমাজ গড়ে ওার পালা।[২] দেশের সাহিত্যে এই প্রক্রিয়ার বিষয়নিষ্ঠ ছবি এখনো বড় ফুটে ওঠেনি। উঠতি মধ্যবিত্তের ছোট বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বাংলাদেশে এক ধরনের সমাজতন্ত্র বলে পরিচিতি ছিল কিছুদিন। ভাবাদর্শের জগতে সামাজিক ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা যে অস্থিরতার জন্ম দেয় তা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে এখনো কানা করে রেখেছে।

বাংলাদেশে জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, স্থানীয় শাসকশ্রেণির গোড়াপত্তন আর পুঁথির প্রাথমিক সঞ্চয়নের যে নবতরঙ্গ তাকে ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে একটা প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ক্ষমতা বর্তমানে মাত্র সামান্য কয়েকজন লেখকের আছে। আহমদ ছফাকে তাদের অগ্রগণ্য মনে করার একাধিক কারণ আমি খুঁজে পাই। এই নিবন্ধে তার একটা ইঙ্গিত মাত্র হয়তো দিতে পারব।

এক.

আহমদ ছফা খুব বেশি লেখেন না। তাঁর প্রায় বইয়ের পাতার সংখ্যাও অল্প কয়েকটি। তকে একটা পরিকল্পনা অনুসরণ করে লেখেন তিনি। বাংলাদেশে জাতিসত্তার উদ্ভব বিকাশ ও সঙ্কট, তার সমস্যা ও সম্ভাবনাই ছফার সকল লেখার কেন্দ্রীয় বিষয়। *অলাতচক্র* উপন্যাসটি এখনো শেষ হয়নি সম্ভবত।[৩] কিন্তু *ওঙ্কার*, *আলি কেনান*, *অলাতচক্র* এবং আলোচ্য *মরণ বিলাস* উপন্যাসকে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ইতিহাস হিসেবে পাঠ করে আমি উপকৃত হয়েছি।

মরণ বিলাস বাংলাদেশের অর্বাচীন শাসকশ্রেণির শারীরতত্ত্ব, তার নীতিজগতের ফাটল এবং প্রাকৃতিক ভুবন থেকে উত্তরণের পর্যায়চিত্র। সাহিত্যে লক্ষ্যের এই অভিন্নমুখিতা আহমদ ছফাকে আর দশ বাঙালি মুসলমান লেখক থেকে স্বতন্ত্র করেছে। ছফা মনে করেন,

> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সবচাইতে বড়গুণ হল এই, অন্যান্য লেখকরা সবসময় চলমান রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন, তিনি লিখেছেন সমাজ নিয়ে। সমাজটা হাজার বছরের, পলিটিক্সটা খুব রিসেন্ট। এখানে সবাই পলিটিক্স করতে চায় কিন্তু সমাজকে বাদ দিয়ে। পলিটিক্স যদি সমাজকে কন্ট্রোল করে এর ফল শুভ হয় না। সমাজই পলিটিক্সকে নিয়ন্ত্রণ করবে। (ছফা ১৯৯২)

সমাজ কিভাবে পলিটিক্সের ভিত্তি দান করে তা দেখানোর উদ্দেশ্যে আহমদ ছফা বারবার প্লাটফরম বদলানো একজন পেশাদার ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করেছেন *মরণ বিলাস* উপন্যাসিকায়।

অনারোগ্য কর্কট রোগাক্রান্ত ফজলে ইলাহি দেশের কোনো এক সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রায় তিন মাস ধরে তিনি হাসপাতালে। এক রাতে হঠাৎ করে তার উপলব্ধি হয় তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না বেশিক্ষণ। আসন্ন মৃত্যুর সাথে টানাদৌড়ে নামেন। খেদমতগার মাওলা বক্সের সাথে জুড়ে দেন মিঠেকড়া আলাপ। পূর্বজীবনের স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে আপন কৃতকর্মের সমর্থনে যুক্তির অবতারণাও তিনি করতে থাকেন।

ইলাহির স্মৃতিচারণেচ্ছার অদম্য প্রকাশকে মাওলা বক্স এক পর্যায়ে 'এগুলো কিছু না স্যার, হ্যালুসিনেশন' বলে উড়িয়ে দিতে প্রয়াসীও হন। কিন্তু মন্ত্রী সাহেব নাছোড়বান্দা। বান্দা মাওলা বক্সও বন্দি শ্রোতার মতনই শুনে যান, আর মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটেন। মাওলাকে ওখানে থাকতে বলেছেন খোদ দেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীরাও যার হুকুমের চাকর মাত্র। মাওলা বক্স চরিত্রটি নীতিবাগিশ ছোট-বুর্জোয়া মনোভাবের প্রতিনিধি। ফজলে ইলাহির বর্ণনাগুণও মন্দ নয়। এপিসোডের পর এপিসোড গল্পকে টেনে সোজা রাখে।

রাত ১২টা ১৩ মিনিট থেকে শুরু হয়ে ভোর ৫টা ৪৭ মিনিটে মন্ত্রী মহোদয়ের এন্তেকালের পূর্বকুহূর্ত পর্যন্ত এই আধাদার্শনিক বাহাস চলতেই থাকে। ফজলে ইলাহি সাহেবের দার্শনিক উক্তি কখনো- বা মনে হয় আহমদ ছফারই স্বগতোক্তি। যেমন:

> কোনো মানুষের ফোড়া হলে নিজের হাতে গেলে দিতে পারে না। তেমনি হাজার সাহস এবং সততার সঙ্গে চেষ্টা করলেও মানুষ নিজের সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করতে পারে না। যে সকল জীবনী এবং আত্মজীবনী আমরা পাঠ করি তাতেও সত্য খুঁজে পাবে না। আসল মানুষের জীবনটি ভিন্নরকম।

ডাকসাঁইটে লোকেরা হতে পারতো জাতীয় এক ধরনের রচনা সৃষ্টি করে। মানুষ তাদের লেখার টেকনিক, বাচনভঙ্গি, সন তারিখের নিখুঁত প্রয়োগ, কল্পনার উদ্দামতা এ সব উপভোগ করে। বাহবা দেয়, পিঠ চাপড়ায়, কিন্তু প্রকৃত সত্য অধরা থেকে যায়। (ছফা ১৯৮৯: ৩১)

নিজ জীবনের বৈধতা ও ন্যায্যতা প্রতিপাদনের আপ্রাণ একটা চেষ্টা ইলাহি সাহেবকে চালাতে হয় তার বাক্সবন্দি শ্রোতা মাওলা বক্সের সামনে। নিজেদের নীতিনিষ্ঠ জীবনের গর্বে গর্বিত পড়ুয়ারাও ইলাহিকে একইভাবে কিংবা আরো তীব্রভাবে আক্রমণ করে বসতে পারেন। তাই আহমদ ছফা নিযুক্ত সর্বজ্ঞ কথককে প্রায়ই দেখি ফজলে ইলাহির পক্ষে ঝুঁকছেন। তবে সব সময় না।

অনেকেই বলে থাকেন *আনা কারেনিনা* উপাখ্যানে তলস্তয় আপন মুখপাত্র হিসেবে কনস্তান্তিন লেভিন চরিত্রটি দাঁড় করিয়েছেন। তবে যেসন জায়গায় লেভিন স্পষ্টত ভুল যুক্তি পেশ করছেন তলস্তয় সেখানে তা আড়াল করছেন না। ফলে তলস্তয়ের বিমূর্ত চিন্তা থেকে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি হিসেবে লেভিন নিজেকে ব্যক্ত করার সুযোগ পাচ্ছেন। (লুকাচ ১৯৭২)

ফজলে ইলাহি দেশের মোল্লামৌলবি-প্রধান কোনো এক জেলার মানুষ। তাদের গেরস্ত পরিবার। বাবা দেওবন্দ পাশ বড় মওলানা। পীরফকির প্রথা, কবরপূজা প্রভৃতির ঘোর বিরোধী। মাজারপূজার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন পরিচালনা করে তিনি ব্রিটিশের যুগে তিন-চার বছর কয়েদ পর্যন্ত খেটেছেন। ভাগ্যের পরিহাস, আপন ভক্তরা এই মওলানাকেই নতুন পীরের আসনে বসিয়েছেন। বাবার এই কারাবাস-কালেই ফজলে ইলাহি প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করেন, বখে যান।

ফজলের বাবা বিয়ে করেছিলেন একটু উঁচু পরিবারে, খানদানে, সৈয়দ বংশে। সংঘাত কিন্তু তাতেই শেষ হয়ে যায়নি। ফজলের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় পক্ষই ইংরেজি লেখাপড়ার বিরোধী। তবুও গেরস্ত ঘরের খ্যাতিমান মওলানাকে জব্দ করার মতলবে নানাবাড়ির লোকজন ফজলে ইলাহিকে ইংরেজি স্কুলে পড়তে প্ররোচিত করে। ফজলের পরবর্তী জবানবন্দি অনুসারে: 'গাও গেরামের ছেলে। কি এমন বিদ্যেবুদ্ধি ছিলো। কোনোরকমে ঠেলে ঠুলে মফস্বল কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছিলাম।'(ছফা ১৯৮৯: ২৪)

এই ফজলে ইলাহি ১৯৩৯ সনে মুসলিম লীগের চোঙ্গা-ফোঁকা কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে ঢোকেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটি যখন আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করছিল তখন, ইলাহির ভাষায়, 'আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত অক্ষমতা সামাজিক অক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে একটা গ-গোল সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তৈরি করে নিতে পেরেছিলাম।' (ছফা ১৯৮৯: ৫৪) ফজল সাহেবও গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের একজন নায়কস্থানীয় ব্যক্তি, হত্যা না করলে হত হতে হত এই যুক্তিতে কিছু খুনখারাবিও করেছেন আবার নিজের কোনো স্বার্থ নেই এমন জায়গায় গিয়ে কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন।

ইলাহির মতে, 'পলিটিক্স করতে হলে বিদ্যেবুদ্ধির চাইতে ঘ্রাণশক্তিটার প্রয়োজনই সবচাইতে বেশি। ওই বস্তু প্রচুর পরিমাণে আমার মধ্যে ছিলো বলেই জীবনে এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি।... সোহরাওয়ার্দীর সময়ে প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলাম। আইয়ুব খানের মাঝখানের সময়টুকু ছাড়া সবসময় মন্ত্রী থেকেছি। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিটি সরকারের আমলেই মন্ত্রী থেকে যেতে পেরেছি।' (ছফা ১৯৮৯: ২২, ২৫) তার স্বীকারোক্তি প্রাঞ্জল: 'জীবনে আমি বেহেশত্ চাইনি। ও নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। অস্তিত্বের শক্তি, সাহস, ধৈর্য্য সবকিছু সংহত করে আমি শুধু চেয়েছি ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি। তুমি জানো আমি আমার লক্ষ্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণও করেছি।' (ছফা ১৯৮৯: ৩০)

> কি সেই স্বর্ণশিখর? কাকে বলে প্রতিষ্ঠা? মাওলা বক্স লক্ষ্য করেন:
> মন্ত্রীর বড়ো বড়ো ছেলে মেয়ে আছে। দুদুটো বেগম সাহেবা আছেন। অথচ রাতের বেলা কেউ হাসপাতালে থাকেন না। এমনকি বাসার চাকরটিও না। অন্যান্য মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব যখন হাসপাতালে আসেন, সকলে শয্যার চারপাশে এমন করুণমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন যে দেখলে আপনাআপনি দুঃখবোধ জেগে ওার কথা। কেমনতরো জীবন মন্ত্রীর। (ছফা ১৯৮৯: ২৩)

ফজলে ইলাহি জানেন, যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন তা মানবজীবন নয়। পশুর জীবন। কিন্তু কেন তিনি কাটাতে বাধ্য হলেন এহেন জীবন? সমগ্র উপন্যাসিকা এই প্রশ্নেরই তদন্ত রিপোর্ট বললে বেশি বলা হয় না। এর উত্তর এক কথায় প্রতিযোগিতা। 'আমার মৃত্যুর পরে এই দেশের সমস্ত খেঁকশিয়াল মিলে আমাকে রয়্যাল বেঙ্গলের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে দুর্গন্ধযুক্ত বাগডাঁশ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে, সেটা অসম্ভব। আমার প্রেতাত্মা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রাপ্য আদায় করে ছাড়বে।' (ছফা ১৯৮৯: ৩০) সব উপলব্ধিরই কিন্তু একটা শেষ উপলব্ধি থাকে, ফজলে ইলাহিরও আছে:

> মনে রাখবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ওসব নেহায়েতই ফাঁকা জিনিস। জীবনে ওসবের কানাকড়িও মূল্য নেই। আমি কথাটা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি সারাজীবন খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্ষমতা ওসবের পুজো করেছি। এটা মানুষের আত্মার একটা রোগ বিশেষ। জীবনে কোনোদিন কথাটা মনে হয়নি। (ছফা ১৯৮৯: ১৯)

দুই.

তলস্তয়ের *ইভান ইলিচের মৃত্যু* (১৮৮৬) উপন্যাসিকায় মৃত্যুপথযাত্রী ইভান একদিন একটা রহস্যজনক কালো বস্তা দেখতে পান, তখন রাত তিনটার মতন। তার সময় আর বেশি নেই। সেই রাতেই ইলিচের পরিবারবর্গ থিয়েটারে বার্নহাটের নাটক দেখতে গিয়েছিল। ফজলে ইলাহির পরিবারেও তুল্য ঘটনা: 'ছোটো বেগম

সাহেবার লায়নেস ক্লাবে পার্টি ছিলো, তাই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বড় বেগম সাহেবা অনেকক্ষণ ছিলেন।' (ছফা ১৯৮৯: ১১)

আজীবন শশব্যস্ত কেতাদুরস্ত সরকারি কর্মচারী ইভান ইলিচ নিজের ঔরসজাত শিশুপুত্রের সাথে কাটাবার মতন সময়ও পাননি কোনদিন। মৃত্যুর পূর্ব দিনগুলোতে শিশুপুত্রের হাতের একটু ছোঁয়া, বাড়ির কাজের ছেলে গেরাসিমের চাহনি তলস্তয়ী শান্তির জোগান দিয়ে যায়। ফজলে ইলাহির সে ভাগ্য হয় না। 'আমার পুত্র দুটো হারামজাদা। শকুনের মতো ওঁত পেতে অপেক্ষা করে আছে কখন আমার মৃত্যু হয়। কবরে মাটি চাপা দেয়ার আগে বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংকে জমানো টাকার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মেয়েরা ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তি অধিকার আদায়ের জন্য হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দেবে।' (ছফা ১৯৮৯: ২০)

মন্ত্রীও জানেন ব্যাপারটা নিছক তার পরিবারেই বিশেষ নয়, ভদ্র সমাজে সামান্য: 'অন্য দশটা হঠাৎ ক্ষমতাবান বাঙালী মুসলমান আপস্টার্ট লোকের স্ত্রী পুত্রেরা যা করে এরাও তা করবে।' (ছফা ১৯৮৯: ২১) এক কথায় 'একটা উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে শত্রুরা আমার নামের ওপর কালি মাখিয়ে দেবে।' (ছফা ১৯৮৯: ২১)

কনিষ্ঠাকে– বুড়ি তার নাম– নিয়ে জটিলতায় ভোগেন মন্ত্রীমহোদয়। তিনি নিজে ঘ্রাণশক্তির জোরে গেরস্তসমাজ থেকে ভদ্রসমাজে উঠে এসেছেন, কিন্তু জনৈক স্কুলমাস্টারকে– ইনি গেরস্তসমাজেরই হবেন– বিয়ে করার অপরাধে ঐ কন্যাকে তিনি প্রকাশ্যেই ত্যাগ করেছেন। প্রতিযোগিতা রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে সন্দেহ নেই। প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে ভালোবাসা অযোগ্যতার প্রতীক, তাছাড়া গেরস্ত-জীবনের স্মৃতি যত দ্রুত অপসৃত হয় ততই মঙ্গল।

ফজলে সাহেব সম্পূর্ণ অঁল নন। বুড়ির কথা ভেবে তার আত্মা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। ফজলে ইলাহির গেরস্ত জীবনের নীতিবোধ মাথাচাড়া দেয় বুড়ির প্রতীক আকারে। 'ব্যাংকের টাকা বাড়িঘর আমার লোভের কারণে সঞ্চয় করেছি, আমি হিসেব করে দেখেছি স্ত্রীপুত্র বাড়িঘর আমার যা কিছু অর্জন, তার সঙ্গে কিছু না কিছু পাপ জড়ানো রয়েছে। সুতরাং আমার লোভের জমানো সম্পদ আমার পাপ সম্পর্কের লোকজনের হাতেই পড়বে।' (ছফা ১৯৮৯: ২৬)

বুড়িকে সারাজীবন আধপেটা খেকে কাটাতে হবে– এ কথাটি মন্ত্রী জলের মতন বারবার বলতে থাকেন ঘুরে ঘুরে, তিনি কিন্তু জানেন 'দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা গভীর নিয়ম ক্রিয়া করে যাচ্ছে।'

জয়েসের 'ব্লুমে'র সাথে ছফার 'ইলাহি'র এই জায়গায় এক ধরনের মিল দেখা যায়। ব্লুমের বাবা আত্মঘাতী, তার সন্তান অকালমৃত। ব্লুমের সামাজিক ভবিষ্যৎহীনতার সাথে *ইউলিসিস* উপন্যাসের ২৪ ঘন্টা বিরাজকালের যোগসূত্র সমালোচকরা নির্ণয় করেছেন। (মোরেত্তি ১৯৮৩: ১৮২-০৮) ফ্রাঙ্কো মোরেত্তি

দেখিয়েছেন, *ইউলিসিসের* স্থাণুগতি কিভাবে বিশ শতকের গোড়ার দিককার ধনতন্ত্রের নিখিল ইউরোপীয় সঙ্কটের ছবি হয়েছে।

আহমদ ছফা বাঙালি মুসলমান শাসকশ্রেণির সামাজিক ও আত্মিক সঙ্কটের চুম্বকচিত্র আঁকার জন্যই এই উপন্যাসিকাকে নিয়ে গেছেন হাসপাতালে। এই হাসপাতালকে মাওলা বক্সের মনে হয় বর্ধিত একটি কবর। *অলাতচক্র* উপন্যাসের সিংহভাগ ঘটনাও হাসপাতালে অথবা হাসপাতালকে ঘিরে। *মরণ বিলাসে* সঙ্কটের ঘনত্ব অনেক বেশি। এই উপন্যাসিকার প্রায় পৌনে ছয় ঘণ্টা বয়ানকালের সাথেও সঙ্কটের তীব্রতর একটা যোগ আছে। ফজলে ইলাহির সামাজিক ভবিষ্যৎ নাই, আত্মিক ভবিষ্যতের জন্য তার লড়াই চলে।

সময়ের এই নতুন বোধ নগর-জীবন গড়ার সাথে জড়িত। বাঙালি মুসলমানের মনটি এখনো আদিম কৌম সমাজের। তার পা কিন্তু এখন প্রবেশ করেছে আধুনিক ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর চৌহদ্দিতে। গ্রামীণ জীবন থেকে নগর-জীবনে, কৃষক জীবন থেকে ভদ্রসমাজে উত্তরণের এই পর্যায়ে বোঝাবার জন্য সময়ের এই ব্যবহার বালজাকই প্রথম সবচেয়ে সফলভাবে করেন। (মোরেত্তি ১৯৮৩) বাঙালি মুসলমান শাসকশ্রেণির গড়ন পত্তন ও নৈতিক অধঃপতনকে একযোগে ধরার জন্য সময়ের এই পীড়ন নতুন ব্যঞ্জনা বহন করে।

বাঙালি মুসলমান বলতে যে মানবগোষ্ঠীকে সচরাচর বোঝানো হয়ে থাকে, তারা ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই নিজস্ব শাসকশ্রেণির জন্ম দিতে পারেনি। আহমদ ছফা এক জায়গায় লিখেছেন: 'ধর্ম পরিবর্তনের কারণে তাদের মধ্যে একটা সামাজিক প্রভুত্ব অর্জনের (আকাঙ্ক্ষার) উন্মেষ হলেও তাদের জাগতিক দুর্দশার অবসান ঘটেনি।' (ছফা ১৩৯৫: ২২) তাদের পূর্বপুরুষেরা এক সময় উঁচু বর্ণের হিন্দুদের হাতে মার খেয়েছিলেন বলে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের থেকে বাংলার মুসলমানরা তফাত খুঁজেছেন। অপরদিকে মধ্য এশিয়া থেকে আসা কথিত মুসলমান রাজশক্তির সাথে সহায়তা করার মতন আর্থিক ও সামাজিক যোগ্যতা না থাকায় সেখানেও তারা কব্জে পাননি।

সর্বাত্মক জনযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই সম্ভবত এই জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক কীর্তি। ইবনে খলদুন রাষ্ট্রকে বলেন 'অনস্বীকার্য অপবস্তু'। আর হেগেলের মত, কোনো জনগোষ্ঠীর বালেগ হয়ে ওঠার দলিল তার রাষ্ট্র। আহমদ ছফা রাষ্ট্রকে হেগেলের বা ক্রোচের মতন একটা সর্বৈব চোখে দেখেন। ধর্ম পরিবর্তন বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিক হীনম্মন্যতার অবসান ঘটাতে পারেনি; প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিবর্তন কি পারবে? সমাজের কায়িক গড়ন আর উৎপাদনের ঐতিহাসিক ধরন যদি না বদলায় তো তেমনি পরিবর্তন বোধ করি সম্ভব নয়।

তিন.

ঐতিহাসিক বিচারে বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভদ্রসমাজের উদ্ভব একান্তই বিশ শতকের ঘটনা। এই ভদ্রসমাজ তার নিজস্ব রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি গড়বার প্রথম সুযোগ পেল ১৯৭১ সনের যুদ্ধের পর মাত্র। এর আগে পর্যন্ত তাকে বিদেশের বা উপমহাদেশের অন্যান্য অধিপতি শ্রেণির তাঁবে চলতে হয়েছে। নিজেদের শাসকশ্রেণি হিসাবে কায়েম করার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন পড়েছে এদেরও। কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে সংগঠিত শাসকশ্রেণি আজ পর্যন্ত নিজের ভাবাদর্শকে সংহত করে উঠতে পারেনি। তার ধর্ম, তার ভাষা নানা সময়ে তার হাতিয়ার হয়েছে। এতদিনে মাত্র আসল প্রভুর দেখা মিলেছে।

কিন্তু মুনাফার ধর্ম সততই প্রতিশ্রুতি ভাঙা। আজ বাংলাদেশে ভদ্রসমাজ গড়ার– মানে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের– চাকরিতে রাষ্ট্র তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল। ফলে এই সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার কুশীলব খোদ রাষ্ট্রদখলের লড়াইয়েই ব্যস্ত থাকবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। নগ্ন বলপ্রয়োগেই ভদ্রসমাজের ধাত্রী– বাংলাদেশেও তার নব নব প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত বিশ একুশ বছরের রক্তারক্তি অভ্যুত্থান, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সংবিধানের ওলট-পালট, সমাজে ও রাষ্ট্রে নীতি-দুর্নীতি বিভাজনরেখার ক্রমবিলুপ্তির রহস্য প্রাথমিক সঞ্চয়ন ও রাষ্ট্রের যোগসাজশেই খুঁজতে হবে।

বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির এই নিরঙ্কুশ হিংস্রতারই সংক্ষিপ্তসার ফজলে ইলাহি চরিত। অর্ধেক পৈতৃক সম্পত্তির দাবিদার, সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী, বৈমাত্রেয় ভাইকে বিষ দিয়ে মেরেছেন তিনি। চাচাতো ভাইয়ের বউকে গর্ভবতী করে ঠেলে দিয়েছেন আত্মহত্যার পথে। শুধু অন্ধ আক্রোশে আগুন দিয়েছেন প্রবীণ হিন্দু হেডমাস্টারের বাড়িতে। পিতার দ্বিতীয় বিবাহের পর একদিন দুপুরে মিলনলিপ্ত পিতা ও বিমাতাকে খুন করার তীব্র ইচ্ছাও জেগেছিল ফজলে ইলাহির।

হিংস্রতা ও যৌনতার একটা প্রায় অভেদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ফজলে ইলাহির জীবনে। তার বৈমাত্রেয় ভাই ও চাচাতো ভাইয়ের বউয়ের পাশাপাশি কবর সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। বাবার মুরিদ চাষি আবদুর রহমানের স্ত্রী চেমনবাহারের সঙ্গে সম্পর্কই হেডমাস্টারের বাড়িতে আগুন দেওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। পরদিনও চেমনবাহারের শরীরের স্পর্শে তার ঘুম ভাঙে। চেমনবাহার বলে: 'গতরাতে খোঁজ করতে এসে দেখি ছোটো হুজুর বিছানায় নেই। আমি চিন্তা করলাম অন্য কোথাও মজার সন্ধান পেয়েছেন। তাই না?' (ছফা ১৯৮৯: ৭০) দুই মজার প্রভেদ তেমন স্পষ্ট নয়। মজা ধর্মেও আছে, হিংস্রতায়ও আছে।

ফজলে ইলাহি নিজে ভারি বস্তুবাদী মানুষ। সাংঘাতিক ইহলৌকিক। বেহেশতের আশা তার নাই। প্রার্থনা-টার্থনায় তার আস্থা নাই। প্রেতাত্মাও তিনি মানেন না। কিন্তু চলতি বিচারে তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেই রাষ্ট্রীয় জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশের তথা সারা উপমহাদেশের রাজনীতিতে

সাম্প্রদায়িক সমস্যার ভিত্তিটা নতুন করে আলোকিত হয় এই চরিত্রের অভিজ্ঞতায়। ফজলে ইলাহিরা যে স্কুলে পড়ালেখার জন্য যেতেন সে স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট চার শয়ের মতন। তার মধ্যে মুসলমান ছাত্র পঞ্চাশ জনের বেশি ছিল না। অথচ এই এলাকায় জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। স্কুল কমিটির অধিকাংশ সদস্য ছিলেন স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোক। সাধারণভাবে 'গ্রামে ডাক্তার কবিরাজরা ছিলো হিন্দু, রোগীরা মুসলমান। উকিল হিন্দু, মক্কেল মুসলমান। মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান। জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান'। (ছফা ১৯৮৯: ৬৫) উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গরিব খেটে খাওয়া মানুষ ছিল প্রচুর। হিন্দু জনসংখ্যার বেশির ভাগও ওই গরিবের দলেই। 'কিন্তু হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন উঠলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ জীবিকা উপার্জনের নিরেট বাস্তব সত্যটি ভুলে যেতো।' (ছফা ১৯৮৯: ৫৭)

সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেও এই সাম্প্রদায়িক চৈতন্য কতখানি ডালপালা ছড়িয়েছে তার নমুনা চেমনবাহারের কথায় পাই: 'একটা মুসলমান ছাত্র হেডমাস্টারের সঙ্গে থাকতো। তারও অবস্থা নাকি খুব খারাপ। উচিত শাস্তি হয়েছে। মুসলমানের ছেলে হয়ে হিন্দুর সঙ্গে থাকা কোনো?' (ছফা ১৯৮৯: ৭১)

মুসলমানের দেওয়া আগুনে পুড়ে সে-ও মরবে। আরেক নমুনা। ফজলের বাবা ও তার সৎমায়ের সঙ্গম-পূর্ব আলাপ: 'একবার হেই কাজ করলে আল্লাহ একেকটা জিহাদের ছরয়াব বখশিস করেন। ...জিহাদ কি জিনিস গো। ...সত্তুর হাজার হিন্দু মরলে যে ছরয়াব হয়, খসমের সঙ্গে বিবি একবার ঘুমাইলে আল্লাহ সে ছরয়াব বখশিস করেন'। (ছফা ১৯৮৯: ৩৯)

'গ্রামের অশিক্ষিত গরীব মুসলমান চাষা, সম্পন্ন হিন্দুদের কাছ থেকে এতো বেশি লাথি ঝাঁটা খেয়েছে' যে তারা অপেক্ষায় ছিল আবদুল বাকি ফজলে ইলাহির মতন ত্রাণকর্তাদের আগমনের।

সমস্ত ঘটনাকে ইলাহি দেখেন 'ইতিহাসের উপাদান' হিসেবে। মনে করিয়ে দেন: 'আমরা পাকিস্তান সম্ভব করেছিলাম বলে আজকে তোমাদের বাংলাদেশ হয়েছে।' (ছফা ১৯৮৯: ৭৬) সাথে সাথে নিজের করা কিছু ভালো কাজের তালিকাও তিনি পেশ করেন। তিনি অনেক হাসপাতাল করেছেন, তাতে কোথাও নিজের মা-বাবার নাম জুড়ে দিয়েছেন কিনা সেটা বাহ্য। রাস্তা তৈরি করেছেন, খাল কেটেছেন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন, বেকার যুবকের চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, দুঃস্থ অসহায়দের সেবা করেছেন এবং 'সন্ত্রাসবাদী' রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দিয়েছেন। কম ভালো কাজ করেননি মন্ত্রী হয়ে।

কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্ত কয়েক আগে তার মনে পড়ছে '... পার্ক সার্কাস এলাকায় একজন কিশোরকে আমি খুনীদের হাত থেকে প্রাণের বিনিময়ে বাঁচিয়ে দিলাম।' (ছফা ১৯৮৯: ৮০) এই কিশোরই তাকে উদ্ধার করবে, তাকে তার পাপকর্ম থেকে আড়াল করবে এই ভরসা ফজলে সাহেবের। ফজলে সাহেব নিজ কাজের যৌক্তিকতা এই রকম দুইভাবেই প্রতিপাদন করেন– প্রথমত ইতিহাসের গভীর

প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপে। দ্বিতীয়ত ভালো কর্ম মন্দ কর্মের ভারসাম্য গোছের উদারনৈতিক নুড়িগণিত (ক্যালকুলাস) কষেও।

অবশ্য শেষ বিচারে তিনিও একজন প্রকৃত ভদ্রলোকই, অন্তত ভাবাদর্শে: 'ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যে এসব কখনো আমার মনোবেদনার কারণ ঘটাতে পারেনি। আমি ধনুকের ছিলা থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো লক্ষ্য অভিমুখে ছুটে গেছি।' (ছফা ১৯৮৯: ৩০) ধনতান্ত্রিক কর্মনিষ্ঠাই (ওয়ার্ক এথিক) তার ধর্ম। ফজলে ইলাহি সত্য সত্য একজন ষোলকলা ভদ্রলোক।

চার.

মরণ বিলাস উপন্যাসিকার কেন্দ্রীয় সমস্যা ফজলে ইলাহির সমস্ত কৃতকর্মের নৈতিক যোগফল কী? এর পরম দায়িত্বই-বা কার? হামবড়া নীতিবাগিশ পড়ুয়ার মতন মাওলা বক্স যতই ব্যক্তির দায়িত্ব বোঝার চেষ্টায় হিমশিম খান ততই দেখা যায় ইতিহাসের বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া মূর্তরূপে সর্বদা হাজির হচ্ছেন। এই মূর্ত প্রক্রিয়ার নাম অবাধ প্রতিযোগিতা। ধনতান্ত্রিক জগতের এটাই মূল চালিকাশক্তি। প্রতিযোগিতা যতই সার্বজনীন ও বিস্তৃত হতে থাকে ইতিহাসের অদৃশ্য নৈর্ব্যক্তিকতাও তত দৃশ্যমান হয়। পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের সময় বলপ্রয়োগ প্রতিযোগিতারই অংশ মাত্র। গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটতে থাকে ধনতন্ত্রের বিকাশপর্বে।

ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে ব্যক্তির ভাগ্য নির্ণীত হতে থাকে। পুঁজিপতি ও মজুর উভয়ে এই প্রক্রিয়ার অধীন হয়ে পড়ে। ফলে দায়িত্ব বিচারের একান্ত ব্যক্তিভিত্তিক মাপকাঠিটা ক্রমশ ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা হারিয়ে বসে– তার জায়গায় নতুন প্রক্রিয়াভিত্তিক বিচার কায়েম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। গোটা প্রক্রিয়াকেই বদলানোর প্রশ্ন ওঠে যদি প্রক্রিয়াই দায়ী হয়। নিজেকে বাঁচাবার জন্য মৃত্যুপথযাত্রী মন্ত্রী অনবরত নৈর্ব্যক্তিক প্রতিযোগিতার এই শক্তিকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন:

> আমি মন্ত্রীত্বের পদটা গ্রহণ না করলে বেটা ডাকু আলিম চোখের সামনে এই আসনে চড়ে বসতো।... সে পারলে দেশের মাটি পর্যন্ত নিলামে বেচে দিতো। আলিমকে ঠেকিয়ে নিজে মন্ত্রী হওয়াটা খুব মহৎ না হলেও নিতান্ত ছোটো কাজ না। (ছফা ১৯৮৯: ২০)

কর্মনিষ্ঠা ও প্রতিযোগিতা– এই দুই বুর্জোয়া বা ভদ্রলোকী মনোভাব ইলাহির অস্তিত্বে মিশেছে: 'ফজলে ইলাহি জীবনে কোনো গুনাহ করেনি। ভালো বলো মন্দ বলো সব কিছুই প্রয়োজনের চাপে বাধ্য হয়ে করেছে। পরিষ্কার বিবেকেই সব কাজ করেছে। তার আফশোস করার কিছু নেই।' (ছফা ১৯৮৯: ১৪)

অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাইকে বিষ খাইয়ে খুন করার জন্য ইলাহি 'সৎভাইটি জারজ, সৎমা খানকি এবং বাবাকে একজন ভেড়ুয়া ধরে মনে যুক্তি দাঁড়' করান। 'তাকে বাঁচতে দিলে ময়াল শেখের নাতির কাছে কাটাখালির সৈয়দ বাড়ির খানদান খাটো

হয়ে যেতো'। (ছফা ১৯৮৯: ৪৩) 'ওই জারজকে যদি আমি বেঁচে থাকতে দিতাম, একদিন সেই আমাকে বাপ পিতামহের ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে দিতো। (ছফা ১৯৮৯: ৪৪)

মন্ত্রী হওয়ার পরও তাকে নিত্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেখা যায়– ফরিয়াদ পত্রিকার মালিক বেজন্মা খোঁড়া আফজাল তার বিরুদ্ধে মৃত্যুর পর কি লিখবে তা নিয়ে মন্ত্রী চিন্তিত। হয়তো 'লিখবে আমি একটা জাতীয় বেঈমান। দলের সঙ্গে প্রতারণা করে সরকারে যোগ দিয়েছি। খোঁড়ার তো নীতিধর্মের বালাই নেই।' (ছফা ১৯৮৯: ১৯) সরকার যোগ দেওয়ার মধ্যেও প্রতিযোগিতা কাজ করছে। 'আগে যে দলটিতে ছিলাম, সরকারী দলে যোগ না দিলেও তারা আমাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিতো... আমি যোগ না দিলে সরকারের মন্ত্রীত্বের আসন কি খালি থাকতো? কখনো কোনো মন্ত্রীত্বের আসন খালি থাকতে দেখেছো? সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফরের আমল থেকে শুরু করে গোটা বাংলার ইতিহাসটা খুঁজে দেখো।' (ছফা ১৯৮৯: ১৯-২০)

মাওলা বক্সের কাছে যাকে মনে হয় 'পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে আপন অপকর্মের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা' ফজলে ইলাহির তাকে মনে হয় 'বড়ো ঘটনার মর্মবেগ'। আমরা কপট পড়ুয়ারা ঘটনার দায়দায়িত্ব যতই এই বা সেই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাতে অস্থির হয়ে উঠি না কেন, ঘটনার বেগ/ত্বরণ সকল দায়দায়িত্ব নিরন্তর কোনো এক ঐতিহাসিক পদ্ধতির– ধনতান্ত্রিক আদি সঞ্চয়ন ও প্রতিযোগিতার– উপর ন্যস্ত করতে থাকে। ইউরোপীয় উপন্যাসের ইতিহাস গবেষকরা বলেন: উপন্যাসে প্লটের সূত্রকে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকে সরিয়ে অতিব্যক্তিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় স্থাপন করা বালজাকের বড় উদ্ভাবনা। (মোরেত্তি ১৯৮৭: ১৪৭) সুদখোর গবসেক বলেন: 'আমার দৃষ্টি ঈশ্বরের মতন। হৃদপি-ের ভিতরটাও আমি দেখতে পাই। আমার কাছে গোপন কিছু নাই।' (মোরেত্তি ১৯৮৭)

লুকাচের মতে বালজাক ভাবাদর্শের পরিম-লে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের প্রক্রিয়াই চিত্রিত করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী লেখকদের কাছে– যেমন ফ্লবেরের জগতে– পুঁজির অস্তিত্ব প্রাকৃতিক ঘটনার স্তরে পৌঁছেছিল। (লুকাচ ১৯৮৭: ৬৩) একই সাথে ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণের সূচনা করছে গবসেকের মতন মহাজনের মাধ্যমে বালজাক তার প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন– সর্বজ্ঞ কথকের ঔপন্যাসিক টেকনিক ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার যৌক্তিক অভিক্ষেপ মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রাঙ্কো মোরেত্তি লুকাচের চাইতেও বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন এই বক্তব্যটির উপর। (মোরেত্তি ১৯৮৭)

আহমদ ছফার সর্বজ্ঞ কথক একজন আছেন, তবে বর্ণনার বেশির ভাগ কাজ ফজলে ইলাহির কথোপকথনেই সম্পন্ন হচ্ছে। নৈর্ব্যক্তিক কথক আর ব্যক্তি ফজলে ইলাহি এক বিন্দুতে এসে প্রায়ই অভিন্ন দৃষ্টিকোণের অধিকার ভোগ করেন। মাওলা বক্স একদিকে ক্ষুদে মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধি আবার অন্যদিকে ফজলে ইলাহিরই ভিন্ন

সংস্করণ। লক্ষণীয় দুজনের নামের অর্থও একই দাঁড়ায়, দুজনেই স্ট্রংম্যানের পূজারি, যার যার স্তরে তোষামুদে ব্যবসায়ী– তিনিও শেষ পর্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণের কাছে নত হন: 'মাওলা বক্সের একটা দুঃখ থেকেই গেল। মানুষ সম্পর্কে সে অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা ধারণা পোষণ করেছিলো।' (ছফা ১৯৮৯: ৮০)

ফজলে ইলাহির জীবনচরিত আহমদ ছফার হাতে স্পেন দেশীয় পিকারেস্ক বা বখাটে উপন্যাসের ভিন্ন অধ্যায় হয়নি, হয়েছে সেরভান্তেড়সের ছোট ছোট নীতিধর্মী উপন্যাসকণিকার মতন। বাংলাদেশের ক্ষুদে মধ্যশ্রেণির অভিধানে যেসব ক্রিয়া দুর্নীতি নামে অভিহিত, আসলে তা ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নেরই অন্তঃপাতী নীতি।

মাওলা বক্সের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পাসকালের উক্তির প্রতিধ্বনি: 'মানুষ একটা খাগড়া, প্রকৃতির সবচে ঠুনকো সৃষ্টি। কিন্তু চিন্তাপ্রবণ খাগড়া। তাকে মারতে আস্ত নিখিল সশস্ত্র করার দরকার পড়ে না। একটুখানি ভাপ বা এক্তটুকুন পানির ফোঁটাই তাকে খতম করতে যথেষ্ট। নিখিল যদি ধ্বংসও করে ফেলে তবুও মানুষ তার খুনিদের চেয়ে মহৎ থেকে যাবে, কারণ মানুষ জানে সে মরে, জানে নিখিল তাকে কী বাগেই না পেয়েছে। নিখিল এর কিছুই জানে না।' ফজলে ইলাহি অনেক বেশি বস্তুতান্ত্রিক: 'প্রকৃতির সঙ্গে যখন মিলিয়ে দেখি আমি শব্দটির কোনো অর্থ খুঁজে পাইনে। আবার মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গ মিলিয়ে বিচার করতে যখন প্রবৃত্ত হই, আমি শব্দটা কি অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কি অপূর্ব ব্যঞ্জনা ধারণ করে সে কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' (ছফা ১৯৮৯: ৭৭)

এই মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই আহমদ ছফার প্রকল্প। 'আমি' সেখানে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এই আমির জগৎ হেগেল-কথিত 'আধ্যাত্মিক পশুর জগৎ'। ধনতান্ত্রিক লড়াইয়ের এই জগতে কুকুর কুকুরের মাংসভুক। 'সংসারে লড়াই করে, বলের বিরুদ্ধে বল, ছলের বিরুদ্ধে ছল প্রয়োগ করে জীবনের মহৎ সুকুমার বোধগুলো অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছি'– স্বীকার করেছেন ফজলে ইলাহি। (ছফা ১৯৮৯: ২৬) ফজলে ইলাহির জগৎ ভাবালু মধ্যশ্রেণির কল্পনাবিলাসের জগৎ নয়, নিঠুর বস্তুতান্ত্রিক। নেত্রকোনার কবি ও গায়ক জালাল উদ্দীন খাঁর কৃষক-জগৎই ফজলে ইলাহির পটভূমি বলে মনে হয়। জালাল সেই যুগে লিখেছিলেন যখন ফজলে ইলাহি সত্য রাজনীতিতে ঢুকেছেন:

আমি গেলেই গেলো সকল, জালাল কয় মোর নামটি কেবল
থাক্‌বে বাকী, তুই রসাতল, ছুটবে যেদিন ধরাধরি।

'আধ্যাত্মিকতাকে ভেতর থেকে বুর্জোয়া ব্যক্তিতান্ত্রিক অহংকার দিয়ে বিনষ্ট করার এই চেষ্টা' বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভদ্র-সমাজ গড়ার দার্শনিক বহিঃপ্রকাশ। (মজহার ১৯৯১: ৪০০) আহমদ ছফার মতন তা খুব কম লেখকই ধরতে পেরেছেন আজকের বাংলা লেখার জগতে।

পাঁচ.

আমি এই প্রবন্ধে আহমদ ছফার সাথে ইউরোপীয় লেখকদের তুলনা দিয়েছি, সমসাময়িক বাংলা লেখকদের কথা বড় তুলিনি। আমি সত্য সত্যই আহমদ ছফার সাথে তুলনা করবার মতন লেখক আজকের বাংলাদেশে খুঁজে পাই না। সেই কারণেই আমি ইউরোপের শরণাপন্ন হয়েছি। বাংলাদেশের পরিচিত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা সৈয়দ শামসুল হকের কথা মনে রেখেই আমি এ কথা বলেছি। এই কথা প্রমাণ করার মতন পরিসর এখানে নেই।

সৈয়দ শাসসুল হকের *খেলারাম খেলে যা*-ই একমাত্র উপন্যাস যা পাকিস্তানি জামানায় ঢাকায় গড়ে ওঠা নতুন ধনিকশ্রেণির আধ্যাত্মিক শূন্যতা চিত্রিত করেছিল। আহমদ ছফাই প্রথম এবং একমাত্র লেখক যিনি বাংলাদেশে জাতিসত্তার উন্মেষ ও জাতীয় রাষ্ট্রের সঙ্কটকে বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিক উপলব্ধি হিসেবে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সঙ্কটকে সমাজের অন্তর্গত টানাপড়েনের নির্যাস রূপে দেখাতে ছফাই প্রথপ্রদর্শক। *বাঙালী মুসলমানের মন* প্রবন্ধে ছফা লিখেছিলেন 'যে জাতি উন্নত বিজ্ঞান, দর্শন এবং সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে পারে না, অথবা সেগুলোকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না তাকে দিয়ে উন্নত রাষ্ট্র সৃষ্টিও সম্ভব নয়'। (ছফা ১৩৯৫: ২৭) *মরণ বিলাস* আখ্যানে তার কিছু নগদ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'মুসলমান সমাজে যে কোনো মনীষী জন্মাতে পারেন নি তার কারণ,' আহমদ ছফার মতে, 'সামাজিক লক্ষ্যের দ্বি কিংবা ত্রি-মুখিনতা।' (ছফা ১৩৯৫: ২৫) সেই ফাঁড়া এখনো কাটেনি।

বাংলাদেশে সাহিত্য সমালোচকরা ছফার রচনাবলিকে যে এখনো বুঝতে, আদর করতে বা অনুসরণ করতে সক্ষম নন তা থেকেই আমার শঙ্কা হয়– সঙ্কট কাটেনি আজও।

প্রথম উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী'র দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে ১৯৮২ সনে আহমদ ছফা কিছু নির্মম সত্য কথা বলেছিলেন। সেই কথাগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক।

এই দেশে সাহিত্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং মূল্যায়নের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের অনুভূতি কী পরিমাণ ভোঁতা, বিচারবুদ্ধি কী রকম স্থূল এবং কিভাবে পরের মুখের ঝাল খেয়ে তারা সাহিত্যের ভালোমন্দ উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয় করেন তার একটা কঠোর পরীক্ষা আমাকে দিতে হয়েছে। আমাদের দেশে এখনো যাঁরা তরুণ আছেন এবং সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে দেশের মানুষের অন্তরে একটা ভালোবাসার আসন পেতে চান, তাঁরা গোড়া থেকেই যেন একটা ধারণা পেতে পারেন, কী রকম অবহেলা উপেক্ষা তাঁদের সইতে হবে, রসবোধ-বিবর্জিত সাহিত্যের চেলাদের উৎপাত নীরবে হজম করতে হবে সে জন্য এই কথাগুলো বললাম। (ছফা ১৯৮২: আনুপূর্বিক বক্তব্য)

পাদটীকা

১. যে রচনা থেকে এই মন্তব্য চয়ন করেছি তার লেখক এ. এফ. এ. হুসাইন জানিয়েছেন বিশ্লেষণটি মুনীর চৌধুরীর করা।

২. ভদ্রসমাজ কথাটি আমি সম্প্রতি গ্রামসি'র সূত্রে বহুল প্রচারিত ইংরেজি 'সিবিল সোসাইটি'র তর্জমা হিসেবে নিয়েছি। হেগেলের জার্মান শব্দবন্ধ 'বুর্গারলিশে গেশেলশাফেট' অনুসারে এর তর্জমা 'বুর্জোয়া সমাজ' করাও চলে।

৩. সম্ভবত ১৯৮৫ সনে এর একটি খসড়া ঢাকার কোনো এক সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

দোহাই

১. আহমদ ছফা, *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (ঢাকা, ১৯৭২)।

২. আহমদ ছফা, *সূর্য তুমি সাথী*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা, ১৯৮২)।

৩. আহমদ ছফা, *বাঙালী মুসলমানের মন*, ২য় সংস্করণ (কলকাতা, ১৩৯২)।

৪. আহমদ ছফা, *মরণ বিলাস* (ঢাকা, ১৯৮২)।

৫. আহমদ ছফা, *'আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার,' বাংলাবাজার পত্রিকা*, ৭ আগস্ট ১৯৯২।

৬. ফরহাদ মজহার, 'শামসুর রাহমানের কবিতার রাজনৈতিক পাঠ,' *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯১।

৭. Richard Lambert et al., *The Role of Savings and Wealth in Southern Asia and the West* (Paris, 1963).

৮. Georg Lukacs, 'The Intellectual Physiognomy of Literary Characters,' in Lee Baxandal, ed., *Radical Perspectives in the Arts* (Haymondsorth, 1972).

৯. Georg Lukacs, *Studies in European Realism* (London, 1978).

১০. Franco Moretti, *Signs Taken for Wonder* (London, 1983).

১১. Franco Moretti, *The Way of the World: The Bildungshoman in European Culture* (London, 1987).

উৎস: গ্রন্থ: বাঙালি মুসলমানের ফাঁড়া

[লেখক: অধ্যাপক, ইউল্যাব। গবেষক, প্রাবন্ধিক ও বক্তা।]

বাংলার মুসলমান

এ. এফ. এম. আ ব্দু ল জ লি ল

বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। দেশি-বিদেশি ঐতিহাসিক ও লেখকগণ এ বিষয় বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। ব্লকম্যান, হান্টার, রিজলি প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁহাদের নিজস্ব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে দেওয়ান ফজলে রাব্বি বহু মূল্যবান তথ্য তদীয় পুস্তক 'হকিকাতে মুসলমান-ই-বাংলা'। (Origin of Mussalmans of Bengal) নামক ফার্সি গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। সকলদিকে লক্ষ রাখিয়া আমরা এই জটিল বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব।

বিশ্বের সেরা ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইসলামের আলোকবর্তিকা সমগ্র বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। দিকে দিকে উড়িয়াছিল বিজয়নিশান। মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় দূরপ্রাচ্যেও সে ঢেউ জাগিয়াছিল। যাহার ফলশ্রুতি ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

দুইটি কারণে বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা দেয়। প্রথম প্রধান কারণ সুফি সাধকগণ কর্তৃক ইসলাম প্রচার, দ্বিতীয় কারণ ৫০০ বৎসরের মুসলিম শাসন। ইসলাম প্রচারের কথাই প্রথমে বলিয়া রাখি।

ইসলাম প্রচার ও সুফি সাধক

পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও আফগানিস্তানে যেভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল প্রায় সেইভাবেই এবং সমসাময়িককালে ইসলামের প্রবর্তন হয় সুদূর বঙ্গদেশে। মুসলমানদের পূর্বে এদেশে আগমন হয় গ্রিক, শক ও হুন্‌দের। তাহারা আসিয়াছিল স্থলপথ অর্থাৎ খাইবার, বোলান প্রভৃতি গিরিপথ বহিয়া।

কিন্তু মুসলমানেরা নানা পথ গিয়া পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া যখন মুসলমানে ভরিয়া যায় সেই সময় হইতে দলে দলে খাইবার ও অন্যান্য পথ দিয়া সীমান্ত দেশসমূহে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটে।

এই সময়ের পূর্বে যখন পাক-ভারত বিজিত হয় নাই তখন মালাবারের হিন্দুরাজা চরুমণ পেরুমল সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন, মালয়, জাভা, বোর্নিও, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে ধর্মযাজক ও বণিকেরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশে মুসলমানদের সহিত ভিন্ন মতাবলম্বীদের কোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ সংঘর্ষ হয় নাই।

বাংলাদেশের সহিত আরবদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আরবীয় নাবিকেরা নৌপথে জাহাজযোগে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলে এবং দূরপ্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রচার করিতেন। বহু আরবীয় মুসলিম পরিবার এদেশে স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হন সেকথাও জানা যায়।

সিন্ধু, বোম্বাই অঞ্চল মালাবার উপকূল প্রভৃতি স্থানে যে সময় ইসলাম প্রবর্তিত হয় সেই একই সময় বঙ্গে ইসলামের আলো প্রজ্বলিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা ধর্মকর্মে যেভাবে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবা করিয়া ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যে কোনো মুসলিম দেশের অনুকরণীয়।

কিভাবে বঙ্গে ইসলাম প্রচার হয় সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া আবশ্যক। আদর্শের বলেই বিশ্বে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল। সুফিদের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে ফরাসি লেখক মেনিসিও বলিয়াছেন, "মুসলমান শেখ ও দরবেশগণ জনগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিয়া এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, অসংখ্য হিন্দু ও মালয়ীকে ইসলামে দীক্ষার পথ সুগম হইয়াছিল। বিদেশাগত দিগ্বিজয়ীদের অত্যাচার ও ধর্মান্ধতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইসলাম প্রচারকদের বিনয় ও নম্রতায় সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের নামে বহু অলৌকিক ঘটনা পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ইসলামের আদিযুগেই বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের ঢেউ আসিয়াছিল। ডক্টর আবদুল করিম অনুমান করেন যে, হিজরি সনের প্রথম শতকেই বঙ্গে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল। আউলিয়া দরবেশ ও জ্ঞানসাধকদের গুণ-মাধুর্য অলৌকিক ক্ষমতা এবং জ্ঞানস্পৃহার আশ্চর্য নিদর্শনসমূহ এদেশের মানবগোষ্ঠীর অন্তরে দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল।

বঙ্গদেশ বিজিত হইবার পর ধর্মপ্রচারের পথ সুগম হইয়াছিল। যে সমস্ত মনীষী সংসার ধর্ম ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সুদূর বঙ্গে আগমনকরত ইসলাম প্রচার করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পুণ্য স্মৃতির কথা লোকে ভক্তির সহিত স্মরণ

করে। মুসলিম-বিজয়ের পূর্ব হইতে আউলিয়া ও ধর্মযাজকগণ এদেশে ইসলাম প্রচার করিয়া রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

ধর্মপ্রচারকগণ যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহাই মুসলমান শাসকদের রাজ্য গঠনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। রাজশক্তির মূলে ছিল সুফি সাধকদের প্রেরণা এবং তাঁহারাই গৌড় সুলতানদের হস্ত শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কোনো কোনো সুলতান স্থানে স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলাম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সুফি দরবেশদের আত্মত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। দুর্গম পাহাড়, পর্বত, কান্তার মরুভূমি, দুস্তর পারাবার, বন-জঙ্গল ও নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়া আস্তানা করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া ভিন্নধর্মীর হাতে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুফি দরবেশদের বিনয় ও সদয় ব্যবহার মূর্তি-পূজকদের নিকট যাদুকরি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কোন সালে সর্বপ্রথম বঙ্গে ইসলাম প্রচার হয় সঠিক বলা দুষ্কর। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পাহাড়পুর খননের সময় বাগদাদের খলিফা হারুনার রশিদের একটি সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় (১৭২ হিজরি = ৭৮৮ খ্রি.)। পাহাড়পুরের স্থাপয়িতা বৌদ্ধরাজা ধর্মপাল এবং ময়নামতি শালবন বিহারের বৌদ্ধ রাজা ভবদেব হারুনার রশিদের সমসাময়িক। পূর্বোক্ত মুদ্রা প্রাপ্তিতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হারুনের সময়ই প্রথম বঙ্গে ইসলাম প্রচার হয়।

সুফি সাধকগণ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি তুলিয়া ধরেন তাহাই এদেশে স্বতন্ত্র মুসলিম সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এইভাবে বঙ্গ ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে।

সুলতান রুমি, সুলতান বলখী মাহিসোয়ার, বাবা আদম, জালালউদ্দীন তাব্রিজী এবং হযরত শাহদ্দৌল্লা বঙ্গে আগত প্রাথমিক যুগের দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কথিত আছে যে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে শেষভাগে শাহ্ জালালউদ্দীন তাব্রিজী নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া স্বধর্ম প্রচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র লিখিত 'শেক শুভদয়া' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। পা-ুয়ার দেওতলায় তাঁহার সমাধি অবস্থিত। এক শিলালিপিতে জালালউদ্দীন জালাল্লাহু জালালে আরেফা'বুদ-এই ফার্সি বয়াত লিখিত আছে, অর্থাৎ তিনি আল্লাহর প্রদীপ ও দরবেশদের শিরোমনি। সৈয়দ মুর্তজা আলী বলিয়াছেন, তাব্রিজী সাহেব সম্রাট আলতামাসের রাজত্বকালে (১২১০-১২৩৬) এদেশের আগমন করেন। তাঁহার সহিত লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী

ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করি। প্রখ্যাত দরবেশ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

আজমির ও দিল্লির খাজা গরিব নেওয়াজ, খাজা কুতুবউদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী এবং হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া ইসলাম প্রচারে যতটুকু করিয়াছেন কোনো মুসলিম সম্রাট বাহুবলে তাহা করিতে পারেন নাই।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বহু দরবেশ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারকল্পে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পা-ুয়ার তাপসপ্রবর খাজা নূর কুতুব-উল আলমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদু (জালালউদ্দিন) এই মহাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সেকথা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে হযরত শাহজাদা মখদুম শাহদ্দৌলা দ্বাদশ জন আউলিয়া ও অসংখ্য শিষ্যসহ ইয়েমেন হইতে আসিয়া উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি পূর্ববঙ্গে আগত প্রথম দরবেশ। তিনি স্থানীয় হিন্দু-রাজার সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁহার দেহ শাহজাদপুরে এবং মস্তক বিহারে দাফন করা হয়। তাঁহার পবিত্র দরগাহ উত্তরবঙ্গের তীর্থক্ষেত্র। এই জেলার হযরত খাজা শাহ সুফি ইউনুস আলী নকশবন্দি আসাম ও বাংলার অসংখ্য অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

ইবনে বতুতার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, গৌড় সুলতান ফকরুদ্দীন মোবারক শাহের রাজত্বকালে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সাদকাওন,' বা চাটগাঁ ভ্রমণ করেন। সেই সময় চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল।

আরব বণিকেরাই ছিলেন আদি ধর্মপ্রচারক। আরবের এই সমস্ত বণিকেরা সে দেশের পৌত্তলিক ধর্ম ছাড়িয়া ইসলাম গ্রহণের পর প্রাচ্য দেশসমূহে ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার করিতেন।

ভাটি ও বঙ্গের আর্দ্র আবহাওয়া, বৃক্ষলতা শোভিত শ্যাম কুঞ্জবন ও নদনদী বিধৌত প্রদেশে মানুষের অন্তর আগত সুফি দরবেশদের বিনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। আরবের বণিকেরা ও তাঁহাদের সঙ্গী প্রচারকগণ এদিক দিয়া অগ্রণী ছিলেন। গৌরববঙ্গের পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর দিকে হিন্দু বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। দক্ষিণে আদিম অধিবাসী ও বৌদ্ধদের বাস ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে আশ্চর্যভাবে মুসলমান বসতি গড়িয়া উঠার ইতিহাস বিস্ময়কর। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা, উচ্চ শ্রেণির হিন্দু অস্পৃশ্যদের হেয় প্রতিপন্ন করার বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি।

রামপালের নিকটবর্তী আব্দুল্লাপুর গ্রামে বাবা আদম সদলবলে আগমন করিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বল্লাল নামক জনৈক স্থানীয় হিন্দু

রাজার সহিত যুদ্ধে আদম নিহত হন এবং পরে দুর্ভাগ্যক্রমে রাজপরিবারের সকলেই অগ্নিকুে- পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অগ্নিকুে- আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য রাজার উপাধি হইয়াছিল "পোড়ারাজা"। আদমের মৃত্যুসংবাদে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। পরে বহু দরবেশ ঢাকা অঞ্চলে আসিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। জালালউদ্দীন ফতেশাহ নির্মিত মস্‌জিদের সম্মুখে আজিও বাবা আদমের সমাধি বিদ্যমান।

বগুড়ায় আদমদিঘির আদম শাহ সম্ভবত পৃথক দরবেশ। এই সময় মির সৈয়দ আলী তাব্রিজী সদলবলে ধামরাই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। ধামরাই শহরের বড় দরগা উক্ত তাব্রিজী সাহেবের শেষ চিহ্ন রক্ষা করিতেছে। তাঁহার কবরগাহ্ সর্বজনসম্মানিত। চট্টগ্রাম শহরে পির বদর সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন। ইসমাইল গাজি উত্তরবঙ্গে, বরখান গাজি, মোবারক গাজি ও গোরাই গাজি দক্ষিণবঙ্গে এবং জাফর খাঁ গাজি প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গে ইসলাম প্রচার করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিখ্যাত মহিলা দরবেশ রওশন আরা বসিরহাট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। ইসমাইল গাজির সুখ্যাতি উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ব্যাপৃত। তিনি ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে শহিদ হন। ইনি খানজাহানের প্রায় সমসাময়িক। শাহ্ মখদুম রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। দরগাপাড়ায় পদ্মাতীরে শাহ্ মখদুমের কবরগাহ সবর্জনসম্মানিত।

ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে সুলতান রুমী এবং মহাস্থানগড়ের সুলতান বলখী মাহিসোয়ার প্রভৃতি বহু দরবেশ বঙ্গে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। ৪৪৫ হিজরিতে (১০৫৩ খ্রি.) কতিপয় শিষ্যসহ সুলতান রুমী মদনপুরে আসেন। শাহ সুজা প্রদত্ত পীরোত্তর সম্পত্তি দানের সময় ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত দলিলে এ বিষয় বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে তিনি মৎস্যাকৃতি নৌকারোহণ করিয়া আসেন সেজন্য তাঁহাকে মাহিসোয়ার বা মৎস্যারোহী বলা হয়। তাঁহাকে মস্তান বলা হইত এবং এই মস্তান হইতে মহাস্থান নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যমতে মজনুশাহ মস্তান ইংরেজ আমলে এক দুর্গ নির্মাণ করেন বলিয়া মস্তানগড় নাম হইয়াছে।

শাহ্ নিয়ামতুল্লা বুৎশিকানের মাজার ঢাকা নগরীর পুরান পল্টন এলাকার দিলকুশা বাগের সংলগ্ন অবস্থিত। তিনি ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়ের শাহ নিয়ামতুল্লাহ্ পৃথক দরবেশ। বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন শাহ তুর্কান শহীদ। তিনি স্থানীয় এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শেরপুরে তাঁহার খ-িত শিরের দাফন স্থানকে শিরমোকাম, দেহ বা ধড়ের সমাধিস্থানকে ধড়মোকাম বা ধরমোকাম বলা হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সৈনিক ও তাপসপ্রবর শেখ জালাল শ্রীহট্ট বা সিলহটে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইতিহাসে শাহ্জালাল বোখারী, শাহ্জালাল

তাব্রিজী ও শাহ্জালাল গঞ্জের নামে আরও তিনজন দরবেশের উল্লেখ আছে। প্রবাদ সিলেটের মহাত্মা শাহ্জালাল ইয়েমেন প্রদেশের কারণীয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ শেখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তিনি ইয়েমেনি বলিয়া পরিচিত। শাহজালাল গুরু পরম্পরায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষ। হোসেন শাহি আমলের এক শিলালিপিতে তাঁহার নাম দেওয়া আছে, "শেখ জালাল মোজাররদ বিন মোহাম্মদ।" মোজাররদ শব্দের অর্থ চিরকুমার। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ গাউস মা-ভী লিখিত 'গুলাজারে আরবার' গ্রন্থে তাঁহাকে "তুর্কিস্তানজাত বাঙালি" বলা হইয়াছে। ৯১১ হিজরিতে (১৫০৫ খ্রি.) এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহাতে তাঁহার নাম ও জন্মস্থান দেওয়া আছে "শেখ জালাল মোজাররদ কোনিয়াভি"। ইহাতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে তাঁহার জন্মস্থান প্রাচীন এশিয়া মাইনরের (রুমদেশ) অন্তর্গত কুনিয়াতে, পূর্বোক্ত ইয়েমেনে নহে। 'সুহল-ই-ইয়ামান' গ্রন্থ রচিত হয় ১৮৫৯ খ্রি.। উক্ত গ্রন্থে তাঁহাকে ইয়ামেনি বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত শিলালিপি জেমস ওয়াইজ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং ব্লকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

শাহ্জালাল দীর্ঘ তিরিশ বৎসরব্যাপী দিবারাত্র শাস্ত্রালোচনা ও কঠোর তপস্যার পর বারোজন সঙ্গীসহ গুরুর আদেশে দামেস্ক, পারস্য, গজনী বেলুচিস্তান প্রভৃতি নগর ও দেশের মধ্য দিয়া হিন্দুস্তানে উপনীত হন। নাসিরউদ্দীন হায়দার কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত "সুহল-ই-ইয়ামান" নামক পুস্তকে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে, হযরত শাহ্জালাল মোজাররদ-ই-ইয়ামানী। হযরত শাহ্জালাল ও হযরত খানজাহান আলীর নিষ্ঠা ও ইসলাম প্রচারের কাহিনী পাক-বাংলার লোকে গ্রাম্য কাব্য গাথা ও ছড়ায় জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ত্রয়োদশ শতকে সিলেট গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া– এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমান সুনামগঞ্জ মহকুমার একাংশ তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন গৌড়গোবিন্দ। তিনি আকিকা উপলক্ষে গো কোরবানির জন্য বোরহানুদ্দীনের পরিবারের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেন। তিনি বোরহানুদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত কর্তন করেন এবং তাঁহার শিশুপুত্রকে হত্যা করেন। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সেকান্দর গাজিকে সসৈন্যে সিলেট প্রেরণ করেন। সেকান্দর যুদ্ধবিশারদ গোবিন্দের সেনাদলের হস্তে পরাস্ত হন। এই সংবাদ দিল্লির সুলতান ফিরোজ তোগলকের কর্ণগোচর হইলে তিনি গাজি সেকান্দরকে দ্বিতীয়বার সৈন্যবাহিনীর কর্ণধার করিয়া সিলেটে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি এবারও পরাজিত হইয়া লজ্জায় ও অপমানে ফিরিয়া যান। অতঃপর দিল্লির সুলতানের ইচ্ছাক্রমে

শাহ্‌জালাল ও সৈয়দ নাসিরউদ্দীন নামক আর একজন শক্তিধর রাজনৈতিক সাধক সিল্‌হট আক্রমণ করেন।

প্রবাদ আছে যে পথিমধ্যে শাহ্‌জালালের শিষ্যসংখ্যা ৩৬০ জনে পরিণত হয়। তন্নিমিত্ত সিলেট জেলা ৩৬০ আউলিয়ার মুল্লুক বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা একযোগে সুরক্ষিত সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া গৌড়গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণ করেন। হিন্দু রাজা পরাজিত হইয়া শাহ্‌জালালের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। রাজ্য অধিকারের পর সেকান্দর গাজির উপর সিলহটের শাসনভার অর্পিত হয়। এই সময় ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, রংপুর ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। পরে সিল্‌হটের অন্তর্গত তরফ রাজ্য বারোজন অধিনায়কের দ্বারা বিজিত হয়। সেইজন্য তরফ নগরের অন্য নাম "বারো আউলিয়ার মুল্লুক"। হিজরি ৭০৩ সালে (১৩০৩ খ্রি.) নাসিরউদ্দীন ও শাহ্‌জালাল শ্রীহট্ট বিজয় সম্পন্ন করেন। ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত হোসেন শাহের আমলে এক শিলালিপিতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩৪৬-৪৭, খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা শাহজালাল দেহত্যাগ করেন। সুবিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা মহাত্মা শেখ জালালের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদীয় ভ্রমণকাহিনী "রিহালা"য় এ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। চৌধুরী শামসুর রহমান "পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো" পুস্তকে বলিয়াছেন যে, যে মহান দরবেশের সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ হয়, তিনিই শাহজালাল মোজাররদ। তাব্রিজী সাহেব ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে এদেশে আসেন এবং বতুতা চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি চীনের পথে কামরূপ ত্যাগ করেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী বলেন ইবনে বতুতার সাক্ষাৎকার এতদুভয়ের সঙ্গে নহে, অন্য কোনো তৃতীয় দরবেশের সহিত। শাহজালালের মৃত্যুতারিখ এবং ইবনে বতুতার সিলেট বা কামরূপ ত্যাগের সন-তারিখে কিছু অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে করি। তন্নিমিত্ত এরূপ মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। শাহ্‌জালাল তাব্রিজীর নাম "রিহালা"য় দৃষ্ট হয়। বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় বহু বর্ষ পরে। তজ্জন্য ভুলক্রমে "তাব্রিজী" নামে উল্লিখিত হইয়াছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। "রিহালা" পাঠে সততই মনে জাগরূক হয় যে, ইবনে বতুতা যে দরবেশের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি শাহ্‌জালাল মোজাররদ।

একটি নির্জন পাহাড়ের উপর অদ্যাপি বিশাল গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ ও সমাধিসৌধ শাহ্‌জালালের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। তাঁহার সমাধি ও মসজিদগাত্র হইতে এ পর্যন্ত সাতখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে আরবি তোগ্‌রা অক্ষরে উহার নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও তারিখ লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত আজিও এই ঐতিহাসিক দরগায় মৃগচর্মের জায়নামাজ, জুলফিকার তরবারি,

তৈয়ম্মম প্রস্তরফলক সযত্নে রক্ষিত আছে। ইয়েমেন প্রদেশের রাজকুমার শেখ আলীর দেহ গুরু শাহ্জালালের সমাধির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

সিলহটের "জিন্দাবাজার মহল্লায়" জিয়াউদ্দিনের সমাধি বিরাজমান। সেখানে আরও চারিজন আউলিয়া চিরশয্যায় শায়িত। ওই স্থানের নাম "পাঁচপিরের মোকাম।" শাহ্জালালের শিষ্যদের মধ্যে আরবের জাকারিয়া, আবু দায়ুদ, গজনীর মখদুম জাফর, সৈয়দ মোহাম্মদ সুলতান আরেফ, আজমিরের শরীফ, সৈয়দ মোহাম্মদ সমরখন্দি, নুরুল হুদা (হায়দর গাজি) বিখ্যাত। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত বহু সংখ্যক আউলিয়ার নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৈয়দ মুর্তজা আলী প্রণীত 'শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস' পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

খানজাহানের সঙ্গে শাহজালালের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তিনি শাহ্জালালের প্রায় ১০০ বৎসর পরে এদেশে আসেন। কথিত আছে যে দ্বাদশ জন আউলিয়া ও অসংখ্য শিষ্যসহ ধর্মপ্রচারের জন্য খানজাহান যশোর অঞ্চলে আসিয়া ভৈরবতীরে যে স্থানে আস্তানা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম হইয়াছিল বারোবাজার বা আউলিয়ার আস্তানা। আরও কথিত আছে যে খানজাহানের শিষ্যসংখ্যা এক সময়ে ৩৬০ জন ছিল এবং প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি করিয়া মোট ৩৬০টি দিঘি খনন এবং ৩৬০ মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অনুরূপ প্রবাদের জন্য সিলেটকেও ৩৬০ আউলিয়ার মুল্লুক বলা হয়। শাহ্জালাল যুদ্ধ করিয়া সিলেট জয় করিয়াছিলেন এবং খানজাহান বিনাযুদ্ধে যশোর অঞ্চল অধিকার করিয়া ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সিলেটের সঙ্গে যশোর-খুলনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যশোর-খুলনা অঞ্চলে পাঁচপীরের খ্যাতি বা পাঁচপীরের মোকাম, পীরবদর, মানিকপীর এবং গাজির স্মৃতি যেমন বহন করিয়া আসিতেছে সিলেটের ইতিহাসেও তেমনি এই মহাপুরুষদের নাম বিশেষভাবে জড়িত। সিলেটে জিন্দাপীরের নামে জিন্দাবাজার মহল্লা আছে। তথায় তাঁহার সমাধি অবস্থিত খুলনায়ও জিন্দাপীরের মাজার ও স্মৃতিচিহ্ন আছে।

হেনরি ব্লকম্যান বলিয়াছেন, "খানজাহান একজন সাধু পুরুষ ও বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বহু অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। অনুরূপ একজন বিজয়ী যোদ্ধাও সাধক শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন। তিনি সিলেটের মহাত্মা শাহ্জালাল। তিনি এদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বিধর্মীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে আউলিয়া-দরবেশগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে এদেশবাসীকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন।"

সোনারগাঁয়ে শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ নামক বিখ্যাত দরবেশের দরগাহ অবস্থিত। ইহা এক তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। তিনি তাসাউফ তত্ত্বে সুপ-িত ও প্রখ্যাত

বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহারই দরগায় থাকিয়া শিক্ষাসমাপ্তির পর মাওলানা শরফুদ্দীন ইয়াহিয়ার ন্যায় সাধকের সৃষ্টি হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন শাহ্ মাহমুদ গজনবী। তিনি রাহী পীর নামে খ্যাত। বর্ধমান জিলার মোঙ্গলকোটে তাঁহার মাজার অবস্থিত। চব্বিশ পরগণা জিলার ঘুটিয়ারী শরিফে শরিফ শাহ্ সাধকের দরগাহ্ আছে। এখানে প্রতি বৎসর বিরাট ওরস হয়।

সে যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচারে জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় ছিল। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ভয়ে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। জাজপুরে ১৬০০ ব্রাহ্মণ পরিবার বিভিন্ন স্থান হইতে জুলুম করিয়া দক্ষিণা আদায় করিত। যাহারা এই কর দিতে পারিত না, ব্রাহ্মণরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিত। ধর্মদেবতার পূজা করিলে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর ব্রাহ্মণগণ কিরূপ জুলুম করিত এবং কিভাবে তাহাদের মূলোচ্ছেদ হইয়াছিল তাহা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। সামাজিক অত্যাচারে কিভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান আউলিয়াদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা 'শূন্য পুরাণে'র নিম্নোক্ত কবিতাংশ হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

"ধর্ম হৈল্যা জবনরূপী শিরে পরে কালো টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হইল ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার।।
জতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।।
ব্রহ্মা হইল মহামত বিষ্ণু হইলা পেকাম্বর
আদস্ফ হৈল সুলপানি।।
গনেশ হইল গাজি কার্তিক হইল কাজী
ফকির হইল জত মুনি।।"

"চৈতন্য ভাগবত" আদিকালে বর্ণিত আছে যে অনেক ব্রাহ্মণও স্বইচ্ছায় মুসলমান হইয়া যায়।

"হিন্দু কুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লেখক গোপাল হালদার বলিয়াছেন, "সুফি, ফকির দরবেশ ও গাজিরা তখন হতে নববিজিত ভূমিতে ইসলাম বিস্তারের চেষ্টা করতে

লাগল। লুণ্ঠন ও ধ্বংস অপেক্ষা ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিক বিচারই হতে থাকে রাজ্য বিস্তারের প্রধান অঙ্গ।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের নিয়োজিত করলেন– দেবতারা এলেন মুসলমানরূপে।" 'শূন্য পুরাণে'র বৌদ্ধ কবি নবাগত মুসলমানদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মুসলমান শাসনে ইসলামের বিস্তৃতি

গাজিরা ধর্মপ্রচারক ও বীর যোদ্ধা। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত গাজিদের নাম করা হইয়াছে তাঁহারা ধর্মপ্রচারে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের অনেকের বিস্তারিত পরিচয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খ- গাজি-কালু প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

একথা সত্য যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বহু বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। রাজশক্তির সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। শুধু বৌদ্ধ নহে হিন্দু সমাজের লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল তখন ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক ও বাহকেরা প্রমাদ গণিলেন। কবির ভাষায়;

"কলিকালে লোকসব বড়ো দুরাচার
প্রধান কারণ তার যবন অধিকার।"

পাক-ভারতের যে কোনো প্রদেশ বা এলাকা অপেক্ষা বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের নানা কারণ পরিলক্ষিত হয়। তুর্ক-আফগান আমলে নানাসূত্রে মুসলমানেরা বঙ্গে আসিতে থাকে। অনেকেই আসিত সরকারি চাকরি ও রুটি-রুজির সন্ধানে। আবার কেহ আসিত বাণিজ্য ব্যাপদেশে। ফকির-দরবেশদের সঙ্গে যেমন অসংখ্য বহিরাগত মুসলমান বঙ্গে আসিত, তেমনই আসিত রাজশক্তির সঙ্গে। অনেকে আবার দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া শান্তির নীড় বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

ক্রমে বহিরাগত মুসলমানেরা দেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে থাকে এবং বঙ্গকে স্থায়ী বাসভূমি করিয়া লয়। বঙ্গদেশের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ অতি সহজে বহিরাগত ব্যক্তিদের মন-মেজাজ ও সংস্কৃতি বদলাইয়া দেয়। কথিত আছে যে, বঙ্গদেশে প্রবেশের বহু পথ খোলা আছে কিন্তু বাহির হইবার একটি পথও নাই।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হয় ১১৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে। মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গদেশের শাসন তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গাধিকারের মোটামুটি কাল ১২০০ সাল ধরিয়া লইলে উহা এইরূপ দাঁড়ায়।

(ক) প্রাথমিক পর্যায়– ১২০০ সাল হইতে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত ১৪০ বৎসর। এই সময় বঙ্গদেশে দিল্লির সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্তা বা সুবাদার কর্তৃক

শাসিত হইত। এই যুগে প্রায়ই গৌড় সুলতানগণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। সেইজন্য দিল্লিতে গৌড়ের অন্য নাম হইয়াছিল বলগকপুর বা বিদ্রোহী নগর।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়– ১৩৪১ সাল হইতে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত মোট ২৩৪ বৎসর। ১৫৭৫ খ্রি. মার্চ মাসে গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতানের পতন ঘটে মোঘল সম্রাট আকবরের সময়। এই দুইশত চৌত্রিশ বৎসর গৌড় সুলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা দিল্লির কোনো ধার ধারিতেন না। হুমায়ুন ও শেরশাহকে বঙ্গের স্বাধীন সুলতানগণের মধ্যে গণ্য করা হয়।

(গ) তৃতীয় পর্যায়– ১৫৭৫ সাল হইতে ১৭৬৭ সাল বা বাংলার স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার পর হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব আরম্ভের সময় পর্যন্ত ১৯১ বৎসর।

মোঘলেরা এদেশ শাসন করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোনো চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, পক্ষান্তরে তুর্ক-আফগানদের সুশাসন ও কীর্তিসমূহ এখনও বিদ্যমান। এই সমস্ত কীর্তিরও একটি বিশেষত্ব আছে। তুর্কি-আফগান আমলের ন্যায় ব্যাপক না হইলেও মোঘল যুগেও ইসলাম প্রচার হইয়াছিল।

মুসলমান বিজয়ের পূর্বে এদেশে "হিন্দু" নাম ছিল না। বিভিন্ন জাতির নামানুসারে তাহারা পরিচিত হইত, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতি। তখন হিন্দুধর্মও ছিল না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর হিন্দু নাম সৃষ্টি হয়।

এখন আমরা বাংলাদেশের তথা সুন্দরবনাঞ্চলের অধিবাসীদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এদেশের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ সকলেই হিন্দু ছিল। তুর্ক-আফগান আমলের কিছু পূর্ব হইতে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। মোহাম্মদ বিন বখতিয়ারের আমল হইতে সুফি-দরবেশ ও আউলিয়ারা ইসলাম প্রচার করেন সে কথা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। রাজশক্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণের উদাহরণ এদেশে বিরল। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের অসংখ্য নজির পাওয়া যায়।

তুর্ক-আফগান আমলে অসংখ্য মোঘল-পাঠান ও অন্যান্য মুসলমান উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে বঙ্গের অভ্যন্তরে বসবাস আরম্ভ করে। খানজাহানের সময় এতদঞ্চলে অসংখ্য মুসলিম জঙ্গল আবাদ করিয়া মনুষ্যবসতি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাও আলোচনা করিয়াছি। সমগ্র ভারত জুড়িয়া তখন কম-বেশি বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে অসংখ্য পাঠান বঙ্গদেশে হিজরত করিতে বাধ্য হয়। কারণ তখনও বঙ্গদেশ স্বাধীন। পাঠানেরা বিজেতা মোঘলদিগকে শত্রু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিষনজরে দেখিত। সরাসরি মোঘল শক্তির নিকট

নতিস্বীকার না করিয়া তাহাদের অনেকেই বঙ্গদেশে আসিয়া মোঘল সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। বারোভূঞার মসনদ-ই-আলা ঈসা খাঁ, তৎপুত্র মুসা খাঁ, ভাওয়ালের চাঁদ গাজি, হিজলির স্বনামধন্য ওসমান খাঁ প্রভৃতি পাঠানেরা এদেশীয় হিন্দু-মুসলমানদের সহযোগিতায় বঙ্গদেশে মোঘলবিরোধী বূহ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও এদেশে বসবাস করিতেছে।

রাজশক্তি যদি ইসলাম প্রচারের মাপকাঠি হইত তবে দিল্লি, রাজপুতনা, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থান মুসলমানে ভরিয়া যাইত। বঙ্গদেশের মধ্যে গৌড় অঞ্চলেই অধিকাংশ যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বাকেরগঞ্জ, যশোর, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ (নাসিরাবাদ) প্রভৃতি অঞ্চলে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। অথচ ওই সমস্ত স্থানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের পরিমাণ খুব বেশি। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক হান্টার বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ এক সময় পাঠান-মুসলমানদের আড্ডায় (Dumping ground of Pathans) পরিণত হইয়াছিল। এখানে হিন্দু বৌদ্ধদের ধর্মান্তকরণের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নহে। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের বঙ্গাধিকারের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম দেশ হইতে বিলীন হইয়াছিল। অতএব বৌদ্ধদের দলে দলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার কথা অতিরঞ্জিত। ঈশ্বরীপ্রসাদ আরও বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ যখন বিপুল সংখ্যক লোককে নিজ ধর্মে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলেন তখন তাহারা বাধ্য হইয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

আরব, ইরান, এশিয়া মাইনর (রুম), আবিসিনিয়া ও মধ্য এশিয়া হইতে অসংখ্য আগন্তুক সুলতানদের দরবারে চাকরি করিবার জন্য আসিতেন। তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়াছিল। অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া বাঙালি বনিয়া গিয়াছিল। রাজসরকার হইতে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিবার অসংখ্য নজির আছে। স্বদেশ ও বিদেশীয় মানুষের সংমিশ্রণে মিশ্র জাতির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

তুর্ক-আফগান আমলে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ইতিহাসও বহুলাংশে পাওয়া যায়। পিরালি মুসলমানদের ইতিহাস উহার জ্বলন্ত প্রমাণ। পূর্ব পাকিস্তানে এখনও বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছে যাহাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল তাহারা সে ইতিহাস জানে। এইরূপ ইতিহাস বংশানুক্রমে চালু থাকাই স্বাভাবিক। ফরিদপুরের কুশলী ও গোবরার চৌধুরীরা কোটলিপাড়ার ব্রাহ্মণ। মওলানা আকরম খাঁর পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন সে কথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে বর্ণহিন্দুদের পূর্বে বহু বহিরাগত মুসলমান জঙ্গল আবাদ করিয়া গ্রাম ও শহর গড়িয়া অসংখ্য জনবসতি স্থাপন

করিয়াছিল সে বিষয় প্রথম খণ্ডে আলোকপাত করিয়াছি। এখানকার আর্দ্র মৃত্তিকা, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাদ্য, সংস্কৃতি অতি সহজে বহিরাগত ভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানকে বাঙালিতে পরিণত করিয়াছিল। এইরূপ অবাঙালিকে বাঙালিতে পরিণত হইতে এক পুরুষের অধিক সময় লাগে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বিভাগোত্তরকালে যে সমস্ত পাঞ্জাবি, দিল্লিওয়ালা, বিহারি, উড়িয়া প্রভৃতি পূর্ববঙ্গে আগমন করে তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা এখন অনেকে পুরাদস্তুর বাঙালি। ফাতেহাবাদ (ফরিদপুর), খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট), শাহ্জাদপুর (পাবনা), পায়গ্রাম কসবা ও লাবসা (খুলনা), শায়েস্তাবাদ (বাকেরগঞ্জ) প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত অবাঙালি মুসলমান তুর্ক, আফগান, মোঘল ও ইংরেজ আমলে বাস করিত তাহাদের সকলেই এখন বাঙালি। মরহুম খাজা মোহাম্মদ আলী (নোয়াপাড়ার পীর সাহেব) কজর বংশের রাজত্বকালে সরাসরি ইরানভূমি হইতে যশোরে আগমন করেন। তিনি পুরাদস্তুর বাঙালি না হইলেও তাঁহার সন্তান-সন্ততি পুরাপুরি বাঙালি। খুলনার মরহুম জালালউদ্দিন হাসেমীর পিতামহ পূর্বে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। এখন এই বংশের মধ্যে পাঠানি সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে।

এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় কিছু কিছু ভিন্ন সংস্কৃতির ছাপ ছিল। তবে একথা সত্য যে মুসলমানদের উপর হিন্দু সংস্কৃতির কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল এবং এদেশের হিন্দু সমাজের উপরও মুসলমানি কৃষ্টির ছাপ পতিত হইয়াছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার একচ্ছত্র শাসক বনিয়া যায়। সে সময় এই তিন প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা ছিল মাত্র তিন কোটি, উহা বর্তমানে প্রায় ১৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অত্যধিক। ১৭৭০ খ্রি. বাংলার লোকসংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। তন্মধ্যে এক কোটি ছয় লক্ষ মুসলমান এবং এক কোটি এক চল্লিশ লক্ষ ছিল হিন্দু। অবশিষ্ট বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাতি।

ডক্টর এম. এ. রহিম তদীয় গ্রন্থে (*Social and Cultural History of Bengal*) তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম জন্মের হার আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৭২-১৮৮১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১৭ এবং হিন্দুর সংখ্যা মাত্র ১/২। ১৮৮১-১৮৯১ সালে মুসলমানদের হার ৯.৬, হিন্দুর হার ৪.৭। ১৮৯১ সালে সংখ্যালঘু মুসলমান হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ মুসলমান ১৯৫৮২৩৪৯ এবং হিন্দু ১৮০৬৮৬৫৫ জনে দাঁড়ায়। ১৯১১ খ্রি. মুসলমানেরা বঙ্গে ৫২.৩ এবং হিন্দু ৪৫.২-এ দাঁড়ায়। ১৯৪১ সালে মুসলমানের সংখ্যা তিন কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছে। অন্যূন ৭০

বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা ১ কোটি ৬ লক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেশবিভাগের সময় মুসলমানদের শতকরা হার ৫৬-এ উন্নীত হয়। ইহা নিঃসন্দেহে জন্মহারের বিস্ময়কর ঊর্ধ্বগতির ইতিহাস। ইহাই পাকিস্তান হাসিলের প্রধান উৎস।

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরও কারণ বিদ্যমান। পূর্ববঙ্গের উন্মুক্ত শ্যামায়মান প্রান্তর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য স্থানের চেয়ে বেশি এবং এখানকার শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অধিবাসী মুসলমান। শহর-বন্দর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে জন্মের হার বেশি। মুসলমানেরা প্রায়ই গ্রামে বাস করিত। এবং সমাজের মধ্যে একাধিক বিবাহ, বিধবাবিবাহের অবাধ প্রচলন, তালাকপ্রথা এবং পুনরায় বিবাহ প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবিভেদ, শহরবাস, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যব্রত গ্রহণ প্রভৃতি কারণে হিন্দু জনসংখ্যার হার তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। শত শত বৎসর পর বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যকে বে-আইনি ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বিধবাবিবাহ ও তালাকপ্রথা চালু হইয়াছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে আমরা অভিমত প্রকাশ করিতে পারি যে বাকেরগঞ্জ, যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের অধিকাংশ মুসলমানদের পূর্বপুরুষ এদেশীয় হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য জাতীয় লোক ছিল না। রাজশক্তির দাপটে যদি ইসলাম প্রচার হইত তবে খুলনা-বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ মহকুমায়-বিপুল হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকিত না। ওই সব স্থানের কোনো কোনো এলাকায় এখনও মুসলমানের নাম গন্ধ নাই। হাট-বাজার, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে এখনও শুধু হিন্দু সমাজের লোক বিদ্যমান।

এতদঞ্চলে শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান, মুন্সি, শরীফ, সরদার, খাঁ, বেগ প্রভৃতি প্রায় সকলেরই পূর্বপুরুষ এতদ্দেশীয় হিন্দু নহে। অনেকের পদবি পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন মোল্লা, মুন্সি, বিশ্বাস, হাওলাদার, ইজরাদার, কাজি, গাজি, চৌধুরী প্রভৃতি। এ বিষয় আমরা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের লইয়া বিভিন্ন সময় আলোচনা করিয়াছি। আমাদের মতে এদেশের মুসলমান অধিবাসীর গড়পড়তা শতকরা ২৫ জনের অনধিক এ দেশীয় হিন্দু হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

ধারাবাহিক ইতিহাস না জানিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে এদেশের মুসলমান প্রায় সবই হিন্দু বংশজাত। ইহা মারাত্মক ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য এবং ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত।

মোঘল শক্তির অত্যাচারে যেমন মধ্য ভারত ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু পাঠান বঙ্গে হিজরত করিয়াছিল তেমনই মুহম্মদ বিন তুঘলক, জালালউদ্দীন ও আলাউদ্দিন খিলজির সময় অসংখ্য মোঘল দিল্লি প্রভৃতি স্থানে বসবাসের অনুমতি না পাইয়া

বঙ্গে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। তৈমুরের আক্রমণের পরও বহু মুসলমান শান্তিতে বসবাস করার জন্য বঙ্গে আসিয়াছিল।

প্রাক-বিভাগ যুগে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা চরম আকার ধারণ করে। তখন কলিকাতাস্থ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এক আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান চ-াল ও পোদ হইতে উদ্ভূত। তখন কলিকাতা ও অন্যত্র ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় বহিয়া যায়। এইরূপ মন্তব্যের মূলে কোনো সত্য নাই বলিয়া মনে করি। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দেওয়ার জন্য এ হেন বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছিল।

সুপ্রকাশ রায় তদীয় "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশই আসিয়াছে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে। নিম্নশ্রেণির হিন্দুগণ উচ্চ বর্ণের সামাজিক উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ প্রথমদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল না। বিশেষত বঙ্গদেশের মুসলমানগণের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই আসিয়াছে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণির হিন্দু।"

ইংরেজ আমলে এক প্রকার ভুল ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনা হইতে উপর্যুক্ত মন্তব্যের সঠিক জবাব পাওয়া যাইবে।

বর্তমান বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিসবঙ্গ ছিল রাঢ় দেশ, উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্র বা পৌন্ড্রবর্ধন এবং পূর্ববঙ্গ ছিল বঙ্গদেশ। মুসলমান বিজয়ের পর গৌড়রাষ্ট্রের অধীন সমস্ত এলাকা রাঢ় দেশসহ বৃহৎ বঙ্গদেশে পরিণত হয়। সেই সময় হইতে রাঢ় দেশ (পশ্চিমবঙ্গ) বঙ্গদেশের সঙ্গে মিলিত হয়। দেওয়ান ফজলে রাব্বি বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ নির্দেশ করিয়েছেন। তাঁহারই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ের আলোচনা কিছুক্ষণ সীমাবদ্ধ রাখিব।

সুদীর্ঘকাল বাঙলা মুসলিম শাসনাধীন ছিল। অন্যান্য যে কোনো অঞ্চল বা প্রদেশ হইতে এখানে অধিক পরিমাণ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করিত। আর মুসলমানেরাই ছিল এ দেশের শাসকগোষ্ঠী। প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, দূরত্ব প্রভৃতি কারণে বঙ্গদেশ বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত। বাংলা ছিল অফুরন্ত সম্পদের দেশ। ভূমির উর্বরতার খ্যাতি ছিল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ধনধান্যের প্রাচুর্যের জন্য বহিরাগতদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম বঙ্গের উপর নিপতিত হইত। ফলে এদেশের যত্রতত্র মুসলমান পল্লি গড়িয়া ওঠে।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়কাল হইতে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬৩ বৎসর কালের মধ্যে অনেক শাসক বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছেন। উহার

মধ্যে রাজা গণেশ, যদু, তোডরমল্ল ও রাজা মানসিংহ ব্যতীত সকলেই ছিলেন আফগান, তুর্কি, মোঘল, পারসিক কিংবা আরব বংশের সন্তান। বাংলার এই শাসকগোষ্ঠী বিদেশজাত এবং স্বভাবত তাঁহাদের পক্ষ হইতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বহিরাগত মুসলমানদের উপর পতিত হইত।

সুবাহ বিহারের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার কসবা দেওগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সে জেলায় তাঁহার আত্মীয় ও সঙ্গীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ নিষ্কর ভূমি দান করেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে বহু মুসলমান বঙ্গে চলিয়া আসে। *তারিখ-ই-ফিরিশতায়* সে কথা লিপিবদ্ধ আছে।

হোসেন শাহ, তৎপুত্র নসরত শাহ, হাজি ইলিয়াস গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ প্রমুখ সুলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। দিল্লির সহিত তাঁহাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেজন্য তাঁহারা এদেশকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

হোসেন শাহ, নসরত শাহ, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ এবং যদু বা জালালউদ্দীন প্রমুখ সুলতান খাঁটি বাঙালি ছিলেন। তাঁহারাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা। তাঁহাদের কাহারও পূর্বপুরুষের নিবাস দূরদেশে হইলেও তাঁহারা বাঙ্গালার মাটিতে বসবাস করিয়া খাঁটি বাঙালিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

হোসেন ও তৎপুত্র নসরতের গুণকীর্তনে বাঙালি কবিদের ভাষা মুখর ছিল। কবি বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তদীয় কাব্যগ্রন্থ 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন। কবি হোসেন শাহের প্রশংসাসূচক এক কবিতায় বলিয়াছেন :

"ঋতু শশী বেদশশী পরিমিত শক
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।"

কবি ছোট বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন :

"নসরত সাহা নামে তথি অধিরাজ
রাম সমপালে প্রজা করে রাজকাজ।"

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় দেশে শান্তি ছিল। পরবর্তীকালে লোকে বলিত যে 'হোসেনি যুগ' আর নাই। তিনি বহু শেখ, সৈয়দ, মোঘল ও আফগানকে স্বাধীন বঙ্গের রাজকর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করেন। বহু ধার্মিক ও সম্মানীয় আগন্তুকদের তিনি নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পতনে অসংখ্য পাঠান শরণার্থী হিসেবে বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখনও বঙ্গদেশ স্বাধীন। দায়ুদ খাঁ কররাণীর পতনে এদেশ আফগান ও তুর্কি জাতির লোকে ভরিয়া যায়। দায়ুদের ৪০ হাজার অশ্বারোহী ৩০০ হস্তী, ১৪০ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। তদ্ব্যতীত অসংখ্য বন্দুকধারী সৈন্য, তীরন্দাজ ও ধনুর্ধর ছিল। তারা অনেকেই বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে থাকিয়া যায়।

বদায়ুনির 'মনতাখাবাত তাওয়ারিখ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের শক্তি দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

মোঘল শাসকদের আমলে বিপুলসংখ্যক মুসলমান বিভিন্ন দেশ হইতে বাংলায় আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিত। দিল্লির দরবার কর্তৃক বহু তুরাণী বা আরব বংশীয় লোক নাজিম বা সুবাদার নিযুক্ত হইতেন। নওয়াব শায়েস্তা খাঁর সময় বঙ্গের গৌরবময় শাসনকালে এইরূপ বহিরাগতদের আগমন বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিনি অনেককে নিষ্কর ও জায়গিররূপে বহু ভূ-সম্পত্তি দান করেন।

সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খানের সময় পারস্যের বাদশাহ নাদির শাহ দিল্লি প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করেন। তথাকার বহু অধিবাসী সুজাউদ্দিনের আশ্রয়লাভের জন্য বঙ্গদেশে পলায়ন করে। 'তারিখ-ই-মনসুরী' গ্রন্থে সুজাউদ্দিনের উদার ব্যবহার, শরণার্থীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দান এবং উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

শুধু স্থলপথে নহে, জলপথেও বহু শরণার্থী বঙ্গে আসিয়া নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইসলাম প্রচারকদের সঙ্গে অসংখ্য মুসলমান এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল।

নৃকুলতত্ত্ব

এখন বাঙালি মুসলমানদের নৃকুলতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। বাঙলার মুসলমানদের দৈহিক গঠন, রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভার্লি লিখিয়াছেন যে, এই জাতির কোনো লোককে যদি চ-াল বা রাজবংশীর সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে তাহাদের পোশাক ও চুল ছাঁটার ধরন ব্যতীত কোনো পার্থক্য দেখা যাইবে না। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানদের মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠন এদেশের হিন্দুদের মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠনের চাইতে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক এবং অনেক স্থানে উৎকৃষ্টতর। বিভার্লির মন্তব্য আপত্তিজনক।

জলবায়ু ও আবহাওয়ার সঙ্গে বিদেশি আকৃতি ও প্রকৃতি সেই দেশের মতো হইয়া যায়। ইহার জন্য খুব বেশি সময় লাগে না। ইহার বহু উদাহরণ আমরা

ইতিপূর্বে দিয়াছি। ইংরেজ গোয়েন্দা কর্নেল লরেন্স ছোটো পীর করম শাহ নামে বহু বৎসর আরব জগৎ ও মধ্যপ্রাচ্যের সর্বনাশ সাধনে লিপ্ত ছিলেন তাহা অনেকের জানা আছে। কেহ তাঁহাকে ইংরেজ বলিয়া চিনিতে পারে নাই।

একথা বলা হইয়া থাকে যে, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, রাশান ও ইরানিরা একই আর্যজাতির বংশধর। কিন্তু তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের কেন? বৃত্তি ও পেশা মানুষের দেহের আকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশেও মানুষের আকৃতি পরিবর্তন ঘটে। অর্থশালী ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব সত্ত্বেও আরব-ইরান প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর গঠন ও আকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

এইচ.এইচ. রিজলি বাংলার উপজাতি ও গোত্রগুলির একটি নৃকুলতত্ত্বমূলক জরিপ প্রস্তুত করার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে তাহাদের দৈহিক পরিমাপের ফলাফল নির্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমানদের বেলায় সামগ্রিকভাবে প্রশ্নটি পরীক্ষা করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছেন।

এদেশের মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছা সুকঠিন। অন্যান্য গোত্রের সংমিশ্রণের ফলে এবং আবহাওয়া, পেশা ও খাদ্যের জন্য তাহাদের দৈহিক গঠনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইলেও মুসলমানদের দেহ ও মুখাবয়ব, অভ্যাস ও রীতিনীতি সম্পর্কে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিলে প্রমাণিত হইবে যে, তাহাদের অধিকাংশই বিদেশি পূর্বপুরুষদের বংশধর।

ইংল্যান্ডের Ethnological society-তে রিজলী সাহেবের নৃতাত্ত্বিক জরিপের ফলাফল পেশ করেন। উহার সংক্ষিপ্তসার এখানে লিপিবদ্ধ হইল :

– মানুষের দৈহিক পরিমাপ ও নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা বাংলাদেশে দুইটি স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করে। এগুলির একটির নাম আর্য, অপরটির নাম আদিম অধিবাসী। ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও শিখেরা প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল ও সুন্দর নাসিকা। শেষোক্ত জাতির নমুনা হইল কোল জাতি। তাহারা কৃষকায় মলিন ও খাঁদা নাকের অধিকারী এবং চেহারায় আফ্রিকার নিগ্রোদের কাছাকাছি।

– একটি লোকের জন্ম যত নিম্নতর বংশে হইবে, তার নাক তত চেপ্টা হইবে। তার জন্ম যত উচ্চ বংশে হইবে ততই সে চেহারার দিক দিয়া ইউরোপীয়দের ন্যায় হইবে।

দেওয়ান ফজলে রাব্বি রিজলি'র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, শিখদের জাতি হিসেবে গণ্য করা ভুল। শিখেরা একটি ধর্মসম্প্রদায় মাত্র। শিখ একটি পাঞ্জাবি শব্দ যার অর্থ শিষ্য। যে কোনো উচ্চ-নীচ শ্রেণির লোক শিখধর্ম গ্রহণ করিতে পারে।

রাজপুতদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তারাও মুসলিম রাজপুত। রিজলি সাহেব মুসলমানদের সম্পর্কে বড় অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে তিনি এদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতির নাকের গড় উচ্চতা ও বিস্তারের বিবরণ দিয়াছেন;

কয়েকটি উপজাতির নাম	নাকের গড় উচ্চতা	নাকের গড় বিস্তার
ব্রাহ্মণ	৪৯.৭	৩৫
মুসলমান	৪৯.৪	৩৮.৩
কায়স্থ	৫০.২	৩৫.৩
বাগদী	৪৬.৭	৩৭.৬
চ-াল	৪৬.২	৩৭.৭
মুচি	৪৯.১	৪১
পোদ	৪৯.১	৩৬.৮
রাজবংশী	৪৮.৯	৩৭.৫
সদগোপ	৪৫.৬	৩৭.৭

পূর্বেই বলিয়াছি মুসলমানদের শ্রেণিবিভাগ না করার দরুন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিলে ফলাফল অন্যরূপ দাঁড়াইত।

রিজলি সাহেব পূর্ব বাংলার ১৮৫ মুসলমান প্রজাকে পরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে ২৭ জন চট্টগ্রামে, ৫৭ জন ময়মনসিংহে, ১৩ জন ত্রিপুরায়, ৩৮ জন ঢাকায়, ৩৩ জন ফরিদপুরে এবং বাকি ১৭ জন বরিশাল, নোয়াখালি ও পাবনায়। এ বিষয়ে আরও জানা যায় যে, রিজলি সাহেব শুধু দরিদ্র মুসলমানদের মাপজোক গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য ইহাকে পক্ষপাতমূলক পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। এইজন্য তাঁহার লিখিত নৃতাত্ত্বিক ও মানবজাতি বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার ফলাফলকে সন্দেহজনক বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে।

দেওয়ান ফজলে রাব্বির মতে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের নাক একই মর্যাদাসম্পন্ন হিন্দুদের নাক অপেক্ষা সাধারণত অধিকতর সুন্দর। এই সমস্ত কারণে ইহা সুপ্রমাণিত হইবে যে, বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় আদিম জাতি বা কোনো উপজাতি বংশধর নহে।

বাংলা ভাষায় মুসলমানি প্রভাব

বিদেশগত মুসলমান ও ধর্মান্তকরণের ফলে এদেশে এক মিশ্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। মুসলমানেরা বাংলার মাটির সহিত সৃষ্টি করিয়াছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

এদেশেই হইয়া গেল তাহাদের স্বদেশ। মুসলমান শাসকগোষ্ঠী কিভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করিয়া খাঁটি বাঙালি বনিয়া গিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

মুসলমানদের সঙ্গে বঙ্গভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আলোচনার পূর্বে উহার জন্মকথা ও উন্মেষকালের দুই-একটি কথা বলিয়া রাখি।

বৈদিক যুগ অবসানের পর লোকমুখে 'হিন্দু আর্যভাষা' প্রচলিত ছিল। উহার নামকরণ হয় 'প্রাকৃত' বা প্রাকৃত জনের ভাষা। হিন্দু রাজগণ ও পি-তদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। বৈদিক যুগে বঙ্গকে পা-ববর্জিত দেশ বলিত এবং অসম্মানের চোখে দেখা হইত। বঙ্গ জাতিকে 'বায়াংসি' বা পক্ষীজাতীয় বলা হইত। প্রাচীন বাংলা ভাষা প্রাকৃত ও সংস্কৃতের উত্তরাধিকার। ক্রমাগত এই ভাষায় বহু ফার্সি ও আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

এখনও ভাষার জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। হেমচন্দ্র বলেন, বাংলা ভাষার জন্ম সংস্কৃত হইতে। গ্রিয়ারসনের মতে মাগধি প্রাকৃত হইতে। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, প্রাকৃত হইতেই এ ভাষার জন্ম। তাঁহার মতে ইহা গৌড়ীয় প্রাকৃত যাহার একটি অপভ্রংশের নাম ছিল গৌড়ীয় অপভ্রংশ। তবে সংস্কৃতের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

ডক্টর এনামুল হক বলিয়াছেন : "বাঙালি একটি রক্তশঙ্কর জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টির মৌখিক ও লৈখিক রূপের আধুনিক নাম বাংলা ভাষা।" এই ভাষার প্রথম রচনা হয় "বৌদ্ধগান ও দোহা"-এর মাধ্যমে। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' সহরপাদের 'দোহাকোষ' ও কাহ্নদেবের 'ডাকার্ণব'— এই তিনখানা পুঁথির সম্পাদনা করিয়াছেন ঐতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চর্যাপদের রচয়িতা ছিলেন সিদ্ধাচার্যগণ, সংখ্যায় ৮৪ জন। দশম ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে 'চর্যাপদ' রচিত বলিয়া অধিকাংশ পি-ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শহীদুল্লার মতে বাংলা ভাষার জন্মকাল সপ্তম খ্রিস্টাব্দে।

নাথপন্থী ও সহজীয়া বৌদ্ধদের সাধনতত্ত্বের কথা চর্যাপদের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার ভাষা সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় আবছায়া। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'ই একমাত্র খাঁটি বাঙালির লেখা কবিতা বা পদ। এই পদ সাহিত্যগান হিসাবে গীত হইত। চর্যাপদের পরেই খনার বচন, ডাকের বচন, ব্রতকথা, ছড়া প্রভৃতি রচিত হইত। একটি চর্যাপদের উদাহরণ দেওয়া হইল :

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী
মোরাঙ্গী পিচ্ছ পরহিন শবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল সবরো মাকরগুলি তোহৌরী
নি-অ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী—

—উঁচু উঁচু পর্বত, তথায় বাস করে শবরী বালিকা;
ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা সেই শবরী, গলায় তাহার গুঞ্জার মালা,
উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না। তোমার
গোহারী, তোমার নিজ গৃহিণী, নাম সহজ সুন্দর–।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন : ব্রাহ্মণেরা প্রথমত ভাষাগ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য কীর্তিবাস ও কাশীদাসকে তাহারা সর্বনেশে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদগণের জন্য রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয় এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। গৌড় সুলতানদের নির্দেশে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হয়।

রাজকীয় ভাষা ফার্সি থাকিলেও বাংলা ভাষার অবাধ প্রচলন শুরু হয়। তুর্ক-আফগান শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গৌড় সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ মালাধর বসুকে সাহিত্য প্রতিভার জন্য গুণ-রাজ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি লিখিয়াছেন :

নির্গুণ অধম মুঞি নাহি কোনো গ্রাম
গোরেশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান

কীর্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রোকনউদ্দীন বরবক শাহ। হোসেন শাহ বিজয় গুপ্তের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হোসেন শাহি আমলে সর্বাগ্রে চ-ীদাসের নাম শ্রুত হয়। মহাকবি চ-ীদাস রচিত সেই বহুবিশ্রুত পদ :

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে গৌড়ীয় সুলতানগণ বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লির রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঙালির সহানুভূতি আকর্ষণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় বৈষ্ণবসাহিত্য দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মোঘল আমলে ফার্সিসাহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইলেও এ যুগে সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন প্রমুখ কবিপ্রতিভার বিকাশ লাভ ঘটে।

আলোচনা দীর্ঘ করা সম্ভব নহে। এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বাংলা ভাষার স্রষ্টা এদেশের বৌদ্ধজাতি। হিন্দু রাজশক্তি হানিয়াছিল এই ভাষার উপর নির্মম আঘাত। লক্ষ্মণ সেন পর্যন্ত এই হামলা অপ্রতিহত ছিল। পরবর্তীকালে তুর্কি সুলতানগণ বঙ্গভাষাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বাধীন বাংলার ইতিহাস বঙ্গভাষার সুবর্ণ যুগ। এ যুগের বাংলা ভাষা ছিল মুক্তবুদ্ধি-সৃষ্ট।

মোঘল যুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে পাওয়া না গেলেও দেশের আপামর জনসাধারণ এই ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইকালে অসংখ্য আরবি-ফার্সি শব্দ বঙ্গভাষায় অনুপ্রবেশ করে। সেজন্য ইহার নাম হয় 'যাবনি মিশাল ভাষা।'

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে কলিকাতায় হিন্দু সমাজ বাংলাকে নিজেদের ভাষা হিসাবে আঁকড়িয়া ধরে। এখানেই সৃষ্টি হয় গদ্যসাহিত্য। এই সময় শত বৎসর ধরিয়া মুসলিম সমাজ বাংলা ভাষাকে করিয়াছিল অবহেলা। ইহার পর আসে রেনেসাঁ যুগ।

সুখের বিষয় দেশবিভাগের পর বহু ত্যাগের মাধ্যমে বাঙালিরা বাংলাকে দিয়াছে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

বাংলা মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা বলিলে অন্যায় হইবে না। এই পূর্ববঙ্গেই বাংলা ভাষা জন্মলাভ করিয়াছিল। বাংলার মুসলমানদের সেজন্য গৌরববোধ করা উচিত।

উৎস: গ্রন্থ: *সুন্দরবনের ইতিহাস*।

[লেখক: এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল বহু-গ্রন্থপ্রণেতা। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯৫৪'র সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত-ফ্রন্টের টিকেটে পূর্ব পাকিস্তান এসেমব্লির এম. পি. এ. নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগের ডেপুটি চিফ হুইপ নিযুক্ত হন। মার্শাল ল'র পরে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে কয়েকবার হাজতবাস করেন।]

বাঙালি মুসলমানের নামায়ন

ই ক বা ল কা গ জী

"নাসরিন তাকে আজ পর্যন্ত তার নাম ধরে একদিনও ডাকেনি। কেবল বীণা বলত রীম ভাই। সুজয় নামটা হিন্দু হিন্দু লাগে। তোমার নামও কিন্তু বীণা। ওটা ডাক নাম। সুজয়ও তো তাই। কিন্তু গন্ধটা বেশি। সুজয় অজয় অজিত অমরেশ সমরেশ সুধাংশু এসব নাম মুসলমানরা রাখে না। রাখলেই পারে– নাম হতে পারে স্যুধাংশু রহমান– বাংলা নাম তো, হতেই পারে। নামের আবার হিন্দু-মুসলমান আছে নাকি। কখনো এসব বলবে না, এসব খুব আপত্তিকর, কম্যুনাল ব্যাপার, আমি ভাবতেই পারছি না, বীণা তুমি...।" [হামীম কামরুল হক, মোহমুদগর, *সুবর্ণরেখা* (ঈদ সংখ্যা ২০০৫), আজকের কাগজ, পৃষ্ঠা : ৩০৪, স্থম্ভ : ৩]। এই বর্ণনাটি ব্যক্তিনাম সম্পর্কিত সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপনের একটি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা, আর সেটি করা হয়েছে একটি উপন্যাসের একটি মুখ্য চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের সচেতন অভিপ্রায়ে, যা বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ পরিসরে বিদ্যমান বাঙালি মুসলমানের নামায়ন বা মাতৃভাষাবিচ্ছিন্নতাক্রান্ত নামনির্মিতির সাংস্কৃতিক বিকৃতিকে প্রতিফলিত করছে।

এরকম জটিলতার প্রমাণ পাওয়া যাবে যদি বর্তমান প্রজন্ম থেকে আরম্ভ করে অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পিতামহ পর্যন্ত একগুচ্ছ ব্যক্তিনাম কিংবা স্থাননাম নিয়ে একটি ঠিক সমীক্ষা নয়, একটু পর্যালোচনা চালানো হয় তবেই। সম্প্রতি সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত একটি বইতে সর্বমোট ৯৮ জন গীতিকারের গানের সঙ্গে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে গীতিকারের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, গ্রাম ও ডাকঘরের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে একজন নারী গীতিকারসহ ৮৫ জন মুসলিম গীতিকার রয়েছেন। এদিক থেকে বিবেচনায় বইটিতে ১৬৯টি মুসলিম পুরুষের ও ৮৬টি মুসলিম নারীর নাম আছে এবং সংখ্যায় ৮৫টির বেশি কিন্তু ১৭০টির কম স্থাননাম রয়েছে বলা যায়। বইটিতে ব্যবহৃত ব্যক্তিনাম ও স্থাননামের ভাষাগত উৎস সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের প্রাথমিক প্রণোদনায় কয়েকটি স্বীকার্যে উপনীত হওয়া যায়। যেমন : ১. ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় সকল পুরুষের নামে অ-

বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ২. ব্যতিক্রম ব্যতীত অধিকাংশ নারীর নামে বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ৩. ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল স্থাননামে অ-বাংলা শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে, ৪. অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ব্যক্তিনামে অ-বাংলা শব্দের ব্যবহার বেশি, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে এবং ৫. একটু আগেকার সময়ের ও নারীদের নামে বাংলা শব্দের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বইটিতে একজন গীতিকারের নাম শাহ মো. আবদুল আলীম, জন্ম ১৯৫৯-এ অর্থাৎ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে। তাঁর বাবা ও মায়ের নাম যথাক্রমে কালা গাজী ও কাঞ্চনমালা (পৃষ্ঠা : ৬৩)। গীতিকারের পিতামাতার জন্ম আনুমানিক ১৯৪০-এর আগে ধরলে তাঁরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের লোক। কালা ও কাঞ্চনমালা দুটিই বাংলা শব্দ, কিন্তু তাঁদের পুত্রের নামটিতে একটিও বাংলা শব্দ নেই। অর্থাৎ মাত্র এক প্রজন্মের ব্যবধানে পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) লোকেরা অ-বাংলা নামকরণে বা ব্যক্তি-নামকরণে মাতৃভাষাবিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে ও ব্রিটিশ আমলে বাংলা নামকরণে অভ্যস্ত ছিল অর্থাৎ তারা তৎকালে (১৭৫৭-১৯৪৭) ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতার একটি উপজনন ভাষাচ্ছিন্নতায় ততটা আক্রান্ত ছিল না। মায়ের নাম বাংলা শব্দে কিন্তু ছেলের নাম অ-বাংলা শব্দে, ব্যক্তি-নামকরণে এমন ভাষাবিচ্ছিন্নতার অনেক উদাহরণ আছে এই বইতে। যেমন : মা চন্দ্রবান, ছেলে ইউসুফ আল আজাদ (পৃষ্ঠা : ৪১); মা ফুলতারা বেগম, ছেলে ইসলাম উদ্দিন (পৃষ্ঠা : ১৭৯); মা সূর্যবান বিবি, ছেলে আব্দুর রউফ (পৃষ্ঠা : ৩৫); মা নাইওরজান বিবি, ছেলে শাহ আবদুল করিম (পৃষ্ঠা : ২১); মা কাচুনি বিবি, ছেলে সফর আলী (পৃষ্ঠা : ১৯) ইত্যাদি। আমাদের সমাজে ছেলে, যেহেতু সে পুরুষ, বহির্মুখী ও মা, যেহেতু তিনি নারী, অন্তর্মুখী চরিত্র। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান বন্দরে আরবি-ফারসি ও অন্দরে খাঁটি বাংলা নামে আত্মপরিচয় প্রকটিত করতে অভ্যস্ত। বন্দরের মানুষের কয়েকটি নাম : মোহাম্মদ মকরম আলী শাহ, জন্ম ১৯১৬ (পৃষ্ঠা : ১৭); আলহাজ্ব শাহ সৈয়দ সিরাজুল হক বাগদাদী, জন্ম ১৯৪২ (পৃষ্ঠা : ৩৭); শাহ সৈয়দ এস. এইচ. আফরাজ করবী, জন্ম ১৯৬১ (পৃষ্ঠা : ৬৯) ও শেখ মো. এমদাদুল হক মারুফ, জন্ম ১৯৯৮ (পৃষ্ঠা : ২০৫)। অন্দরের মানুষের কয়েকটি নাম কেছনি বিবি, রূপজান বিবি, সোনাবান বিবি, ফুলজান বিবি, কাঁচা বিবি, আদর বিবি, গেদা বিবি, চম্পা বিবি, উজ্জ্বলা বিবি, পরিতারা, ফুল বিবি, তোরাবানু, ফুলবানু ইত্যাদি। তা ছাড়া ব্যতিক্রম ব্যতীত (দুর্গাপাশা ও দুর্গাকান্দি যথাক্রমে দরগাপাশা ও দরগাকান্দি হয়ে গেছে ইতোমধ্যে) প্রায় সব স্থাননাম বা গ্রামনামের অকৃত্রিম বাংলাভুবনে ভাষাবিচ্ছিন্নতার ঔপনিবেশিক থাবার বিস্তার লক্ষ করা যায়নি যেমন নির্বাচিত কটি নাম এরকম : তেঘরিয়া, ব্রহ্মোত্তর, লক্ষ্মণশ্রী, ছনখাইড়, চরেরবন্দ, মজুমদারী, চিনাকান্দি, বিনাজুরা, তেরাউড়িয়া, চিলাউড়া, লাউতলা, বাখরপুর, পলমাটি, কলাগাঁও ও হরিনগর ইত্যাদি। (*সুরমা পাড়ের গীত*, দ্বিতীয় খ-, প্রকাশনায় : সুনামগঞ্জ জেলা গীতিকার ফোরাম, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪।)

বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিনামকরণ স্ব স্ব ধর্মমত থেকে প্রসূত। এ সম্পর্কে এক প্রাবন্ধিক প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন : "কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ব্যক্তিনাম তাদের নিজস্ব ধর্মমতপ্রসূতভাবে রাখেন। যেমন হিন্দুদের নাম : ভবানীপ্রসাদ, বিষ্ণুপদ; মুসলমানদের নাম : মোহাম্মদ আজিজুল হক, শফিউদ্দিন আহমদ।" (রহমান হাবিব, আবদুল হক : সমাজদর্শন, *কালি ও কলম*, দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪১২, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২২)। আমাদের উভয় বঙ্গে মুসলমান তথা বাঙালি মুসলমানের নামের অবিমিশ্র আরবি, ফারসি অথবা তুর্কি শব্দসমূহ ধর্মপরিচয়প্রস্ফোটক নামকরণের বিভাষী উপাদান। ধর্মপ্রসূত এ পদ্ধতিতে নামকরণের প্রচলন ধর্মান্তরের বা ইসলাম ধর্মাবলম্বনের কাল থেকেই ছিল, এখনও আছে। আবার এই ধর্মপ্রভাবিত প্রথার ভিতরে ফল্গুধারার মতো আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দ সহযোগে নাম রাখার ব্যাপক প্রচলনও জায়মান, এমনকি অধুনা বিশুদ্ধ বাংলা শব্দে নাম রাখারও প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শেষোক্ত প্রবণতাটিকে নামগোত্রপরিচয়হীনতার সংকটে নিমজ্জিত বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ে প্রত্যাবর্তনের একটি নামসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলে, তা হবে প্রকারান্তরে ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বরূপোন্মোচনের সমার্থক একটি ইতিবাচক প্রচেষ্টা।

বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের, মায়ের নাম রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরানী ও স্বামীর নাম খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। এই সব নামের মধ্যে একমাত্র চৌধুরী [চতুঃ(>চৌ)+ধুর+ইন(<ঈ)] শব্দের স্ত্রীবাচক (স্ত্রীলিঙ্গার্থক কখনও ব্যবহার করবেন না। 'স্ত্রীলিঙ্গ' শব্দটিতে যৌনতার মিশেল আছে বলে ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনায় শব্দটিকে বর্জন করুন।) শব্দনির্মিত চৌধুরানী সংস্কৃতমূল বাংলা শব্দ। অন্য সবকটি শব্দই মধ্যপ্রাচ্যীয় ভাষার। খান ফারসি, বাহাদুর মঙ্গোলীয়-মূল ফারসি, বেগম তুর্কি ও আলী আরবি। উক্ত উদাহরণে এরকম আরো দুয়েকটি শব্দের ঠিকুজি বাংলা অভিধানে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সবকটির নয়, সেগুলো আরবি, ফারসি ও তুর্কি যে কোনো ভাষারই হতে পারে। বাঙালি মুসলমানের নাম আরবি-ফারসি-তুর্কিতে রাখার একটি কারণ ভারতে আগত মোগলদের ধর্মের ভাষা আরবি, মাতৃভাষা তুর্কি আর দরবারি বা রাষ্ট্রপরিচালনার ভাষা ছিল ফারসি। তাছাড়া ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের মাতৃভাষাও ছিল ওই ভাষা কটিই। এমন একটা ঔপনিবেশিক কারণের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত কারণ অবশ্যই ধর্মান্তর আর তার সঙ্গে লগ্ন আছে ভারতবর্ষে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত মুসলিম ও ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত মানুষজনের মানসতায় বিশ্বজোড়া মুসলিম জাতীয়তার (প্যান ইসলাম) এক অদ্ভুত স্বপ্নবিলাসের উদগ্র তাড়না, আর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সর্বাগ্রে অন্য ধর্মাবলম্বী তথা

হিন্দুধর্মাবলম্বী থেকে নিজের ধর্মসত্তাকে পৃথকভাবে প্রকটিত করার সুতীব্র আত্মসচেতনতা। আমাদের বিশিষ্ট যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭)-এর এক রচনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে একজন লিখেছেন : "প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন, নামের এ-ধর্মীকরণ দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি করে।" (রহমান হাবিব, আবদুল হক : সমাজদর্শন, *কালি ও কলম*, দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪১২, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২২)।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর রচনাবলি সম্পাদনা করেছেন আব্দুল কাদির। বইটির পরিশিষ্টাংশে তিনি শিরাজীর মূল্যায়ন করে একটি প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ সন্নিবেশ করেছেন। সেখানে 'মুসলমানদের জাতীয়তা' সম্পর্কে শিরাজীর একটি চমকপ্রদ অভিমতের উদ্ধৃতি আছে। উদ্ধৃতিটি এরকম– "মুসলমানদের জাতীয়তা (Nationality) 'মুসলমান' ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। সমস্ত জগতের মুসলমান এক, ধর্ম এক, স্বার্থ এক, চিন্তা এক, কর্ম এক, ইসলামের এই মহান ঐক্যের বন্ধনে সমস্ত নবীন যুবকে প্রমত্ত করিতে হইবে।" (*সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী রচনাবলি*, সম্পাদনা আব্দুল কাদির, স্বদেশ প্রকাশ, জুন ২০০৬, পৃষ্ঠা : পরিশিষ্ট ২৬)। শিরাজীর বক্তব্য পাঠে সর্বাগ্রে যে মর্মার্থটি বোধগম্য হয় তা হল, তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে জাতীয়তা সংক্রান্ত চূড়ান্ত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসত্তাগুলোর সঙ্গে কোনওরূপ পরামর্শ না করেই, অর্থাৎ এই সব জাতিসত্তা ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতিসত্তায় স্বজাতিসত্তাকে বিলীন করে দিতে প্রস্তুত আছে কি না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই। কেবল তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বজোড়া মুসলিম জাতীয়তা প্রতিপন্ন করে, স্বপ্নসম্ভব এক জাতীয়তার বিরাট জাতীয়তার্ণবে আরবি, ইরাকি, ইরানি, আফগান ইত্যাদি এমনকি বাঙালি জাতিসত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে একীভূতরূপে কোনও এক অন্য জাতিসত্তা আবির্ভূত হওয়া আবশ্যম্ভাবী, যা শিরাজীর কল্পনায় সম্ভব হলেও বাস্তবে একেবারেই অসম্ভব। তবে তাঁর 'জাতীয়তা' শব্দটির স্থলে 'ভ্রাতৃত্ব' প্রতিস্থাপন করা হলে তা মোটামুটি মন্দ হয় না। কিন্তু ইদানিং ফিলিস্তিনে ইজরায়েলি বর্বরতার সমুচিত জবাব দিতে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বের বাস্তব অনৈক্য প্রতিপন্ন করে যে, বিশ্বমুসলিম-ভ্রাতৃত্বের ধারণা একটি অন্তঃসারশূন্য বাস্তবায়ন-অযোগ্য প্রপঞ্চ। বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাও কেবল একটি স্বপ্নসম্ভব অন্তঃসারশূন্য অসম্ভব বাস্তবতা, স্বপ্নবিলাসী স্বল্পসংখ্যক মানুষের কল্পনার উৎপাদ মাত্র। ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় চৌদ্দ শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরও ধর্ম, স্বার্থ, চিন্তা, কর্ম— এই চার চিন্তা-ভাবাদর্শের ভিত্তিতে ইসলামি ঐক্যের বিশ্বরূপ বলে পরিচিত হতে পারে এমন সামাজিক-রাজনীতিক বাস্তবতা আজও পর্যন্ত কল্পনাশ্রয়ী প্রপঞ্চ বা অবাস্তবায়িত স্বপ্নই রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কেবল ধর্মের ভিত্তিতে ইসলামের খ-িত বিশ্বরূপকে পরিলক্ষিত করা গেলেও পৃথিবীর কোথাও শিরাজী কথিত চারটি প্রপঞ্চের (ধর্ম, স্বার্থ, চিন্তা ও কর্ম) সমন্বয়ে একটি 'মুসলমানদের জাতীয়তা' তথা ইসলামি জাতীয়তাভিত্তিক বিশ্বার্থ-সমাজব্যবস্থার

আবির্ভাব ঘটেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারের ফলে সেখানকার মানুষেরা মুসলমান হিসেবে একটি ধর্মীয় পরিচয় লাভ করেছে বটে কিন্তু স্বীয় জাতীয়তা পাল্টে ফেলেনি। তাই তারা মুসলমান হয়েছে কিন্তু থেকে গেছে ইরানি, ইরাকি, তুর্কি, ইন্দোনেশিয়ান, বাঙালি অথবা পাঞ্জাবি। যেমন তারা কেউ বাঙালি মুসলমান, কেউ-বা পাঞ্জাবি মুসলমান। ধর্মান্তরিত মানুষের ধর্মের বদল ঘটলেও জাতীয়তার বদল ঘটেনি। অর্থাৎ আবারও বলি, বিশ্বপরিসরে ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্নটাই তো বাস্তবে এখনও একটি অবাস্তবায়িত পরিকল্পনা স্বরূপ এবং ইসলামি বিশ্বজাতীয়তা আদপেই অবাস্তব স্বাপ্নিকতার প্রতিরূপ। অর্থাৎ মোদ্দাকথা মুসলিমভ্রাতৃত্ব একটি ভাজা বরফ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারতবর্ষের মুসলমানরা তথা বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানরা ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বনামকরণ করেন আরবি-ফারসি-তুর্কিতে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই কতিপয় মধ্যপ্রাচ্য ভাষার শব্দ দ্বারা নামকরণের তাৎপর্য কিন্তু নামকরণে ব্যবহৃত শব্দপ্রতীকের দ্যোতনা কিংবা অর্থের মধ্যে নিহিত নয় বরং নামকরণের সমগ্র তাৎপর্যটা নিহিত এই সব ভাষার শব্দপ্রতীকাঙ্গে আরোপিত ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি কিংবা ইসলামি অহম। কারণ বাঙালি মুসলমানের নামকরণের ভিত্তি কেবল ধর্মীয় অহম, নামের সঙ্গে ভাষা ও শব্দার্থের প্রকাশ নয়। অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান তাদের আরবি নামের অর্থ জানে না। তারা মনে করে নাম মধ্যপ্রাচ্য ভাষায় রাখা হলে ধর্মরক্ষা ও ধর্মাভিজ্ঞান প্রকটিত হয়, অন্যদিকে বাংলা শব্দে নামকরণে সেটা হয় না। কিন্তু স্বার্থ, চিন্তা, কর্ম এই তিনটির সমন্বয় ব্যতীত আপাতত কেবল সমভাষায় সমধর্মপ্রকাশক নামের মিলের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ইসলামি ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশের মূর্ত নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান হওয়ার মূল শর্ত ইসলাম ধর্ম পালন করা ও নামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামান্য ও শিথিল ঐক্যটুকুর মতো অনুঘটকের উপস্থিতিতে বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় শিরাজী কথিত ঐক্য একবারেই অসম্ভব। মনে রাখতে হবে কোনও আরবীয় কোনও বাঙালির সঙ্গে কেবল ধর্মৈক্যের ভিত্তিতে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তার জাতিগত বিশুদ্ধতা বিসর্জন দিতে কদ্যপি, নিতান্ত সহজে, সম্মত হবে না। আরও মনে রাখা দরকার মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে আগত মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় মুসলমানকে 'আতরাফ' (নিম্ন সমাজ বা বংশের লোক) শ্রেণিভুক্ত ভেবে অবজ্ঞা-অবহেলা কম করেনি। কিন্তু এই সত্যটি কতিপয় বাঙালি মুসলিম মৌলবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণিগত অন্ধ আনুগত্যতাবশত বুঝেও না বুঝার ভান করে ভ- হয়ে উঠতে কসুর করেন না, মুসলিম বিশ্বভ্রাতৃত্বের নামে বাঙালিকে আরবীয়দের সমপঙ্‌ক্তির বলে প্রচার করেন। প্রকারান্তরে ভারতবর্ষে কিংবা বাংলাদেশে জাতীয়তার সংজ্ঞার্থের ধর্মায়ন সম্ভব হয়ে ওঠে এবং বর্ণগত ও ধর্মীয় জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে। ড. শহীদুল্লাহ এ দুই ধর্মপ্রসূত জাতীয়তার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ দৈশিক জাতীয়তার প্রস্তাব করেন। রহমান হাবিব বলেন : "জাতীয়তা

বলতে হিন্দু বোঝে বর্ণগত জাতীয়তা, মুসলমান বোঝে ধর্মগত জাতীয়তা; কিন্তু ড. শহীদুল্লাহ দেশগত জাতীয়তাকে কামনা করে সর্ববিধ অমঙ্গলের কারণ হিসেবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন।" (রহমান হাবিব, আবদুল হক : সমাজদর্শন, *কালি ও কলম*, দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪১২, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১)।

বিশ্বপরিসরে মুসলমানদের তথা মুসলিম দেশ-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শিথিল সম্পর্কের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ আরব ও ফিলিস্তিনের সম্পর্ক। ইসলামবিরোধী ইসরাইলের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি শক্তিগুলোর অনৈক্যই তথাকথিত ইসলামি ঐক্যের একমাত্র মূর্ত বাস্তবতা। ভারতীয় এক বিশ্লেষকের পর্যবেক্ষণে বিশ্বব্যাপী ইসলামি ঐক্যের প্রতিরূপ প্যান-ইসলামের ধারণাটি প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্তঃসারশূন্য। তিনি বলেন– "যদিও প্যান-ইসলামের একটা শক্তি আছে, তবু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ইসলামি দেশগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে কখনও দ্বিধা করে না, যেমন ইরান-ইরাক, ইরাক-কুয়েত, আফগানিস্তানের বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠী। এ ছাড়া এমনও নয় যে মুসলমানের বিরুদ্ধে কোথাও অত্যাচার হলে অন্য জায়গার মুসলমানেরা সে বিষয়ে প্রতিবাদমুখর হয়– যেমন, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার সার্ব-রা যদিও বসনিয়ান মুসলমানদের গণহত্যা করেছে, তবু তার বিরুদ্ধে যেটুকু প্রতিবাদ তা পশ্চিমারাই করেছে, বাকি মুসলিম দুনিয়ায় বিশেষ হেলদোল দেখা যায়নি।" (তথাগত রায়, আমেরিকা কি এখন পৃথিবীর নিয়ন্তা?, *দেশ*, ৬৯ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৮ মে ২০০২, পৃষ্ঠা-২৯, স্তম্ভ-১)। বিশ্বজোড়া 'প্যান-ইসলাম'-এর এরকম অনৈক্য ও বৈরী বাস্তবতাকে অভিজ্ঞতায় নিয়ে যে কেউ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একটি জাতির জাতিগত আত্মপরিচয় ডিঙ্গিয়ে বিশ্বজোড়া ইসলামের যে বন্ধন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সেই 'প্যান-ইসলাম'-এর মতো একটি উচ্চাভিলাসী প্রকল্প বাস্তবায়ন একেবারেই অসম্ভব, তা হলে এমন সিদ্ধান্তকারীকে দোষারোপ করা সঙ্গত হবে না।

বর্তমানে পেট্রো-ডলার অন্য ইসলামি দেশে শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার বদলে একধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে আছে নামে-বেনামে বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠন। অভিযোগ আছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির যুদ্ধাপরাধী নেতা গোলাম আজমের সফর-প্রচেষ্টায় আরবীয় তথা মধ্যপ্রাচ্য ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ হতে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিধ্বস্ত মসজিদ বিনির্মাণের বাহানায় চয়িত অর্থ বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিবাদের উত্থানের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মকে শিখি- করে এই রকম সব তৎপরতা পরিচালনাকে কোনো যুক্তিতেই ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা যায় না, যা শিরাজীর মতো বিশুদ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদদের স্বপ্নকে বাস্তবে মূর্ত করে তুলতে পারে। শিরাজী কথিত ইসলামি ঐক্যের বাস্তবায়ন ভারতবর্ষে অথবা বিশেষ করে বাংলাদেশে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নিজের তথা ব্যক্তিবিশেষের

ইসলামি (পড়ুন আরবি অথবা ফারসি) নামকরণ পর্যন্ত সীমিত, তাতে শিরাজী কথিত স্বার্থ, চিন্তা ও কর্মের কোনও স্থান নেই। হুমায়ুন আজাদ বলেন– "মুসলমানদের নাম আরবি-ফারসি-তুর্কিতে রাখার একটি রীতি চ'লে আসছে কয়েক শতক ধরে;...।" (হুমায়ুন আজাদ, *বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র*, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা : ৫৫।) নামের ধর্মীকরণের ফলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে, বা জন্মগতভাবে যে মুসলিম তার নাম 'ইসমাইল' কিংবা 'আবদুল' রাখা হচ্ছে, 'লখিন্দর' কিংবা 'চন্দ্রধর' নয়।

১৯৪৮ সালে ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে তো স্বাপ্নিক ইসমাইল হোসেন শিরাজীর ইসলামি ঐক্য একেবারে বালির বাঁধের মতো মর্মান্তিকভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, যখন পাকিস্তানের কর্ণধার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরকালে (২১ মার্চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। যারা এর বিরোধিতা করছে তারা পাকিস্তানের শত্রু।' আর জিন্নার এই দম্ভোক্তির গুণে গুণে ২৩ বছর তিন দিন পরে শুরু হয়েছিল নয়-মাস-দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধ, যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বিত্ত-রক্ত-মান-প্রাণের বিনিময়ে বিশ্বমানচিত্রে, কোনও কোনও তাত্ত্বিক বলেন, একটি ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব। আজ পর্যন্ত বিশ্ববাস্তবতার প্রেক্ষিতে কখনো ইসলামের বিশ্বরূপ পরিলক্ষিত হয়নি অর্থাৎ উদ্ধৃতিতে কথিত ইসলামি ঐক্য বিশ্বপরিসরে কখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল না, এখনও নেই।

একটি নির্দিষ্ট ভাষায় ব্যক্তিসত্তার বা বিভিন্ন সামাজিক সংঘ-প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের নামকরণ ও একটি নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বনের সুবাদে বিশ্বজোড়া বিশ্বমানবের মধ্যে এক ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তা গড়ে ওঠার কোনো নিরঙ্কুশ সামাজিক-রাজনীতিক বাস্তবতা এখনো পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এই অবস্থাটা যেমন বাস্তব তেমনি প্যান-ইসলামের স্বপ্নবাস্তবতার প্রেরণারূপ অনুঘটক আরবিতে নিজের নামকরণের আরোপিত সংস্কৃতিটাও বাস্তব ও বাঙালির অস্থিমজ্জায় বহমান, সেটাও একটি বাস্তব সত্য।

আজ থেকে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে থেকেই নাম রাখার রীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে ও বর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষে একেবারেই পাল্টে গেছে, অর্থাৎ প্যান-ইসলামের স্বপ্নবাস্তবতার প্রেরণাসঞ্জাত আরবিতে নিজের নামকরণের প্রবণতায় ভাঙন ধরেছে ও ভাটা পড়েছে। বিপরীতে অভিযোগ আছে "দাঁতভাঙা আরবি-ফার্সি নামের প্রচলন ঘটেছে" (ফিরোজ আহমদ, পুব-পশ্চিমের বাঙলা ভাষা, *আলোকিত বাংলাদেশ*, ঈদ সংখ্যা ২০১৩, পৃষ্ঠা : ৩৭৭) বলে। বিশ্ব-ইসলামের স্বপ্নবাস্তবতার প্রেরণা বা প্রতিবেশী ধর্মের সঙ্গে প্রভেদরেখা অঙ্কনের মানসতা থেকে আরবিতে নাম রাখার প্রবণতা বর্তমান সমাজবাস্তবতায় ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার এক নিয়মিত কলামে লিখলেন– "স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মুসলমান বন্ধুরা তাঁদের জন্মসূত্রে

পাওয়া নামের পাশে ব্রাকেটে ডাকনাম লিখছেন। তারপর এক সময়ে ব্রাকেট উঠে গেল। ইমদাদুল হক মিলনকে তামাম বাঙালি চেনে মিলন বা মিলনভাই বলে। তারও পরে সুন্দর বাংলা শব্দ প্রথম নামের দখল নিল। সৈকত হাবিব...। এখন বন্যা বললে এই দুই দেশের বাঙালি সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র নিবেদিত একটি তীর্থযাত্রীর মুখ মনে করতে পারেন। আমার অস্বস্তি ক্রমে কমে আসছে।" (সমরেশ মজুমদার, নিবেদন, *কালি ও কলম*, প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৫)। এই মন্তব্যের প্রতিমন্তব্য পাওয়া গেল, এক পাঠকের পক্ষ থেকে, *কালি ও কলমের* ওই একই বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায়। লেখা হল– "বাংলা ডাকনাম বাঙালি মুসলমানরা বহুকাল ধরেই ব্যবহার করছে, সমরেশ মজুমদার আগে তা টের পাননি। সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধা এম আর মুকুলের নাম নিশ্চয় সমরেশ মজুমদার জানেন; এই নামেই তো আমৃত্যু তিনি লিখে ও বলে গেছেন। 'মিলন' 'বন্যা'– এসব নামও হঠাৎ করে বাংলাদেশ আমলে গজিয়ে ওঠেনি। এর আগের আমলেই, তাদের বাবা-মায়েরা এসব রেখেছিলেন। আজকের মতো আগে আগে কাগজে-পত্রে লিখত না, তা ঠিক। অন্যরাই তো তাদের নামধাম লিখে দিত।" (সবিনয় নিবেদন, কাদের মাহমুদ, *কালি ও কলম*, প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৫, পাঠকের চিঠি, পৃষ্ঠা- ৩, স্তম্ভ- ২)।

এরপর পত্রলেখক মুসলমানদের নামকরণে বাংলা শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করে বলেন– "রক্ত-মান বিসর্জনে বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর, স্বাধীনতার সুফল হিসেবে পুরনো কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার সুযোগ এসেছে, – ন্যায্য পাওনা হিসেবেই এসেছে। না এলেই অস্বাভাবিক হত। তবে সবারই স্বীকার করা কর্তব্য যে, বাঙালি মুসলমানদের নাম লেখায় এই যে বিবর্তন এসেছে, তা এসেছে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও মর্জিতে।" (সবিনয় নিবেদন, কাদের মাহমুদ, *কালি ও কলম*, প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৫, পাঠকের চিঠি, পৃষ্ঠা- ৩, স্তম্ভ- ২-৩)।

১ জানুয়ারি ২০১৪-এর *দৈনিক সমকালে* পরিবেশিত বিভিন্ন সংবাদে আরংলা (আরবি+বাংলা) শ্রেণির নামের তিনটি এরকম : নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন, এমএ মালেক খান উজ্জ্বল ও মোয়াজ্জেম হোসেন মানিক। এরকম এন্তার নাম এখন সহজপ্রাপ্য। যেগুলোকে আরবি বলছি, স্বীয় অজ্ঞতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, সেগুলো ফারসি, তুর্কি, এমনকি অর্বাচীন উর্দু হবারও সমূহ সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেকটি নামের শেষে একটি করে বাংলা শব্দ (শাওন, উজ্জ্বল ও মানিক) নামের কিছুটা দীর্ঘ করে তুলেছে। নামের শব্দবিন্যাসের মধ্যে মুসলিম শাসনামলে প্রচলিত নীতি অবিমিশ্র অভারতীয়তা তথা অবাঙালিপনার ক্ষেত্রে এখানে 'চৌধুরী' উপাধি বা পদবিটি একেবারেই বাংলা, 'সৈয়দ' (< আ. সায়্যিদ) বা 'শেখ' (< আ. শায়খ্)-এর মতো আরবি নয়। 'এমএ'-কে ধরে নেয়া যায় আরবি 'মোহাম্মদ' ও 'আব্দুল'-এর ইংরেজি মু-মালের (abbreviation) প্রতিবর্ণীকরণের বাংলালিপ্যন্তর। এদিক

থেকে এ নামটি আরবি-ইংরেজি-বাংলা তিনটির খিচুড়ি অথবা ত্রিসঙ্করায়ণের মতো একটি জগাখিচুড়ি। এমন হতে পারে এখানে বাঙালিয়ানার অকৃত্রিম পরিচয় প্রকাশের মানসিকতা থেকে ডাকনামগুলোকেই হয় তো নামের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বাঙালি আর নামে অবাঙালি থাকতে চায় না, অন্তত নামে বাঙালি হয়ে ওঠাই তার অকৃত্রিম বাসনা। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তীকাল থেকে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে বাংলা শব্দে নামকরণের ভাষিক পদ্ধতিতে জাতিগত আত্মপরিচয় প্রকটনের প্রবণতা প্রকট হতে শুরু করে। সে কারণে ভাষাআন্দোলনকে কেউ কেউ যথার্থভাবেই এক অর্থে বিভ্রান্ত-মোহগ্রস্ত বাঙালির 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংগ্রাম' বলে বিবৃত করেছেন। বিশ শতকের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিককালের শুরুতেই জাতিগত আত্মপরিচয় সন্ধানে ব্যাকুল বাঙালি মুসলমান আত্মজাগৃতির গভীর প্রণোদনা থেকে তৎকালের পূর্ববাংলায় যে ঐতিহাসিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিখ্যাত চিন্তক বদরুদ্দীন উমর তাঁর একটি প্রবন্ধে উপর্যুক্ত স্বীকার্যকে প্রতিভাত করেন। তিনি বলেন– "১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম তাই অনেকাংশে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম। যে মধ্যবিত্ত মুসলমান নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বিগ্ন হত এর পর থেকে তার সে উদ্বেগের অবসান হতে শুরু করল। বাঙালি পরিচয়ে সে আর লজ্জিত হল না। যে চিত্ত ছিল পরবাসী, সে চিত্ত সচেষ্ট হল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে।" (বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮০, পৃষ্ঠা : ৩০।) তাই বলি, বাঙালি মুসলমানের বাংলা নামায়নের দিকে এই টান প্রকৃত প্রস্তাবে তার নামপরিচয়ে পারভাষিক বাতাবরণের খোলস বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসে আদি-অকৃত্রিম বাঙালির বিশ্বসভায় পদার্পণের মতো একটি যুগান্তকর ঘটনা।

এ ছাড়া উক্ত দু'প্রকার (আরবি ও আরবি-বাংলা) নামের চেয়ে একটু আলাদা বাংরবি (বাংলা-আরবি), বাংরসি (বাংলা+ফারসি), ও অবিমিশ্র বাংলা নামও আছে। যেমন বাংরবি নাম সুস্মিতা রহমান (<আ. রাহ্মান), ত্রপা মজুমদার (<আ. মজ্মুআহদার); বারংসি নাম মৌলি আজাদ (<ফা. আজাদ), ও প্রজ্ঞা লাবণী (<সংস্কৃত)। বাংলা নামের দেদার প্রচলন লক্ষ করা যায় অপেক্ষাকৃত আধুনিকতাবঞ্চিত গ্রামীণ সমাজে। শহর থেকে দূরে সে সমাজে পুরুষের কালু, কালা, ধলা, লাল, রাঙ্গা, ময়না, চান, সুরুজ প্রভৃতি এবং নারীদের পরিবানু, ফুলবানু, তারাবানু, চানবিবি, রূপবান, জয়তারা, জয়ফুল ও নয়নতারা প্রভৃতি হরেক রকম নাম সহজপ্রাপ্য। আমার এক ফুফুর নাম ছিল চন্দ্রবান, তার জন্ম হয়েছিল আজ থেকে কম করে হলেও প্রায় এক শ' বছর আগে। তা ছাড়া গ্রাম-গঞ্জের দুইক্ষেত্রেই ইশিতা, ঈশা, এষা, ঐশী, কথা, কান্তা, কুয়াশা, চুমকি, চামেলি, জুই, জ্যোৎস্না, ত্বিষা, তূর্ণা, নিলীমা, পরি, পান্না, পারুল, প্রভা, প্রজ্ঞা, প্রিমা, প্রিয়া, বন্যা, বৃষ্টি, ভাষা, ময়না, মিতা, মুক্তি, মৌরি, রিক্তা, শমী, শান্তা, শান্তি, শাপলা,

শিল্পী, শেফালি, সীমা, সুমনা, স্বস্থি, স্বাতি প্রভৃতি এন্তার সুন্দর-সুশ্রাব্য শব্দে মেয়েদের নাম রাখা হয় এবং ছেলেদের নাম রাখা হয় অন্তর, অনন্ত, অর্পণ, অপূর্ব, আকাশ, খোকন, চঞ্চল, চয়ন, চপল, তপন, পলাশ, শিমুল, পল্লব, প্রতীক, প্রিয়, মানিক, মুকুল, মুকুট, রাজা, রাজীব, রূপম, লাল, শাওন, শুভ, সাক্ষাৎ, সাগর, স্বজন, সুবাস, সুজন, সুমন, সোহাগ, হৃদয় প্রভৃতি এই ধরনের সহজ, সরল নাম।

বিশেষ কোনো আনুষ্ঠানিক দরকারে গ্রামের লোকেরা নামের শেষে পুরুষের বেলায় ফারসি মিয়া অথবা অন্য কোনো পদবি এবং নারীদের বেলায় ফারসি বিবি, তুর্কি বেগম বা অন্য একটা কিছু, যেমন ফারসি বানু, যোগ করে দিয়ে তখনকার মতো কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। নামের প্রথমাংশের বিভাষা-বিজাতীয়তার নামগন্ধহীন স্বদেশি বা যাকে বলে আদি অকৃত্রিম বাংলা নামেই লোকেরা চিহ্নিত হয় সামাজিক যোগাযোগের অষ্টপ্রহর ব্যাপী প্রাত্যহিক কর্মকা-ের সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক বাস্তবতায়। বাংলাদেশের গ্রামগ্রামান্তরে, শহরে-বন্দরে এমন বাংলা নামের কোনো অভাব পড়বে না। এ সম্পর্কে ভাষাবিশেষজ্ঞ হুমায়ুন আজাদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন– "...তবে গ্রামগঞ্জে এখনো এমন নাম– কালু মিয়া বা সোনা বিবি– পাওয়া যায়, যাতে বোঝা যায় মুসলমান নিজের নামের জন্য সব সময় মধ্যপ্রাচ্যে যায়নি। ডাকনাম রাখার এই রীতি আছে আমাদের, যাতে বাংলা নাম– মানিক, নীলু– প্রিয় নামরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে অনেকদিন ধরেই। পাকিস্তানকালের প্রথম দিকে ডাকনামেও ঢুকে পড়ে উর্দু ও ইংরেজি; যেমন : নাজ, শেলি। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের পরে ডাকনামে ব্যাপকভাবে বাংলা ব্যবহৃত হতে থাকে; এখন সম্পূর্ণ বাংলা নামেও পাওয়া যায়।" (হুমায়ুন আজাদ, *বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র*, আগামী প্রকাশনী, দ্বি. স. ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৫)।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয় এখানে অবতারণা করা অসমীচীন হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান আমলেই, ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ডাকনামে ব্যাপকভাবে বাংলা শব্দের ব্যবহারই কেবল প্রসার লাভ করেনি, তার সঙ্গে বারংবি (<বাংলা+আরবি) বা বারংসি (<বাংলা+ফারসি) নামকরণের সাহসী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল এক লেখকের পক্ষ থেকে। লেখক আবদুল হক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রহমান হাবিব লিখেছেন : "তিনি ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা নামের পক্ষপাতী। যেমন, অনুপম, সুপ্রিয়, প্রণতি, সুমিত্রা ইত্যাদি। তিনি এগুলোকে বাংলা নাম বললেও এগুলো সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত শব্দও গভীরভাবে বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত, তাই আমরাও উপর্যুক্ত নাম ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য বিধায় সে-নামায়নের সঙ্গে একমত। মুসলমানদের সব নামেই মোহাম্মদ থাকতে হবে, এমন তিনি মনে করেন না। তিনি অনুপম মোহাম্মদ, নির্মল আহমদ প্রভৃতি সংকর সাংস্কৃতিক নামের প্রস্তাব করেন।" (রহমান হাবিব, আবদুল হক : সমাজদর্শন, *কালি ও কলম*, দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪১২, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২২)। আবদুল হক সেদিন সমাজের সামনে 'সংকর সাংস্কৃতিক

নাম'-এর যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তা আজ সমাজের সর্বস্তরে সমাদৃত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে 'অনুপম মোহাম্মদ' বা 'মোহাম্মদ অনুপম'-এর আদর্শের বা আদল-অকারের নাম সচরাচর রাখা হচ্ছে। উদাহরণের জন্যে বেশি দূর যাবার দরকার নেই। *সপ্তাহের বাংলাদেশ* সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের নামের তালিকাটিতে একনজর চোখ বুলালেই চলবে। সেখানে চব্বিশটি নামের মধ্যে বাইশটি মুসলিম নাম আছে। তন্মধ্যে নয়জনের নাম আবদুল হক কথিত 'সংকর সাংস্কৃতিক' প্রকৃতির। যেমন : শুভ কিবরিয়া, স্বকৃত নোমান, শামীমা মিতু, কাজী বৃষ্টি রহমান, মাহমুদা তুলি, রহমান মনি, নিহার সিদ্দিকী, সাইমা চৌধুরী ও পলাশ রহমান। পত্রিকাটির এই সংখ্যারই (ঈদ সংখ্যা, ২৫ আগস্ট ২০১১, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৫) সূচিপত্রে চারজন কবি আছেন, যাঁদের নাম সংকর সাংস্কৃতিক। যেমন : সৈকত হাবিব, পিয়াস মজিদ, মাসুদ পথিক ও শিমুল সালাহ্উদ্দিন। উদাহরণস্বরূপ আরো চারজন লেখকের নাম, যেমন : তুহিন তৌহিদ, প্রত্যয় জসীম, মনি হায়দার ও সমীর আহমেদ। একটু অনুসন্ধিৎসু হলেই এরকম বারংবি বা বারংসি নাম এন্তার মিলবে, যা আজ থেকে চার দশক আগে ছিল কল্পনাতীত।

'পথরেখা' একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম। এটির সম্পাদক নূহ-উল-আলম লেনিন। তাঁর নামটিতে বাংলার ছিঁটেফোঁটাও নেই, আরবি ও রুশি মিলে পুরোপুরি বিভাষী। রুশ ভাষার শব্দ লেনিন তাঁর ডাকনাম। এরকম কোনও কোনও বাঙালি মুসলমানের নামের সঙ্গে তাঁর ডাকনাম যুক্ত থাকে, কারও কারও থাকে না। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী প্রয়াত কাজী হাসান হাবিবের ডাকনাম তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত নেই। অথবা এমন হতে পারে যে, তাঁর ডাকনামই ছিল না। তাঁর ডাকনাম জানতে দেশের আরেক প্রখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষের খুব ইচ্ছে। তিনি লিখেছেন : "অনন্ত ও জ্যোৎস্না ভাবীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। না হলে তাদের ফোন করে দেখতাম। ক'দিন ধরে এই ব্যাপারটায় পেয়েছে। কাজী হাসান হাবিবের ডাক নাম কী? কেন? কেন আমি বলতে পারব না। কিংবা এই চিন্তা কাজ করে হয় তো, কখনও তাঁকে না দেখলেও আমি নিশ্চয়ই তাঁর আত্মীয় হই। তবে তাঁর ডাকনাম কেন জানব না? সবচেয়ে ভালো হত এখন মানুষটা থাকলে।" [ধ্রুব এষ, কাজী হাসান হাবিব শীতকালের এই সন্ধ্যায়, *সমকাল, কালের খেয়া* (শুক্রবারের সাময়িকী), ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা : ৩০ (শেষ পাতা)]। একজন মানুষের ডাকনাম জানার জন্যে আর একজন মানুষের অন্তরে অনাবিল অনন্ত আকুলতা। ধ্রুব এষের আত্মার আত্মীয় কাজী হাসান হাবিবের ডাকনাম যদি অজানার ওপারে থেকে যায়, তবে তিনি কাছের মানুষটিকে কী নামে ডাকবেন? কাছের মানুষকে ডাকার জন্যে তো পোশাকি নাম মানায় না, তার জন্যে এমন একটা নাম চাই তাঁর, যে নামে স্বান্তরের অনন্ত হৃদ্যতার প্রকাশ থাকবে, সে অন্তরঙ্গতা কোনও বৈদেশি ভাষার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে না। বাংলাদেশ এমন একটা

দেশ যে দেশের প্রায় প্রত্যেক মানুষের, তিনি হতে পারেন খ্যাত বা অখ্যাত, একটা করে ডাকনাম থাকেই, তাঁরা শহুরে বা গ্রামুরে যা-ই হোক না কেন। কাজী হাসান হাবিব নামটা শ্রীএষের কাছে অনেকটা বারোয়ারি বারোয়ারি, তেমন আপন ঠেকে না, তাই তাঁর একান্ত স্বাজনিক একটি নাম চাই।

সুনামগঞ্জের একজন দেশদশে বিখ্যাত মানুষ, কমরেড প্রসূনকান্তি রায়, তাঁর ডাকনাম ছিল বরুণ, তাঁকে লোকেরা চেনে বরুণ রায় নামে। তাঁর একান্ত প্রিয় স্বজনরা তাঁকে ডাকতেন বরুণ বলে, রাজনীতির বলয় ও পরিচিত মহলে সর্বজনের কাছে, সকল সম্পর্ক নির্বিশেষে, ছিলেন একডাকে বরুণদা। একদা এ শহরের বিখ্যাত শিক্ষায়তন জুবিলি'র ছাত্ররা হয়তো একজন শিক্ষককে ডাকত 'বাম্বু স্যার' আর একজনকে 'ভীম স্যার'। অন্যদিকে এইচএমপি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষক ধূর্জটিকুমার বসু সাধারণ্যে হয়ে উঠলেন 'রাখাল স্যার'। তেমনি ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আন্দোলনের বাঙালি নেতা মির নিসার আলির ডাকনাম ছিল তিতুমির (পিতামহী প্রদত্ত নাম তিতামিয়া থেকে উদ্ভূত)। বোধ করি পৃথিবীর সবখানে সব ভাষাতেই কম-বেশি এই ডাকনামের প্রচলন আছে। একজন আরবীয় মনীষীর নাম আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বেরুনি, তিনি 'আল বেরুনি' নামেই বিশ্বে সমধিক পরিচিত অথবা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নেতা লেনিনের পুরো নাম ছিল ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, বিশ্বজুড়ে লোকেরা তাঁকে 'লেনিন' নামেই চেনে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আরবেও ছিল ডাকনামের রীতি। হযরত মুহম্মদকে (স.) আরবের লোকেরা ডাকত 'আল আমিন' (বিশ্বাসী), খোলাফায়ে রাশেদিনের তৃতীয় খলিফার জামাতা মারওয়ান ইবনে হাকামের ডাকনাম ছিল 'খায়ত বাতিল' এবং আরব ইতিহাসের খল চরিত্র আমর ইবনে আস-এর ডাকনাম ছিল 'ইবনে নাবিগাহ'। মারওয়ান ইবনে হাকাম ও আমর ইবনে আস সম্পর্কে এ কালে এক বাঙালি লেখকের বর্ণনা যথাক্রমে : "তার শরীরের পাতলা গড়ন ও তার কর্মকা-ের জন্য মারওয়ানকে ডাকা হত 'খায়ত বাতিল' বা 'অন্যায়ের সুতা' বলে।" এবং "আমরকে ডাকা হত তার মায়ের নামে ইবনে নাবিগাহ বলে।" (জাকির হোসেন, *মুসলমানমঙ্গল*, রোদেলা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা : যথাক্রমে ৯৩ ও ১০৬)। 'খায়ত বাতিল' নামটা একজন মানুষের চরিত্রের নেতিবাচকতাকে প্রকটিত করছে ও 'ইবনে নাবিগাহ' নামটি নামধারী ব্যক্তিরকে গৌণ করে দিয়ে তার মায়ের স্মারকতাকে সংরক্ষণ করেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ডাকনাম মানুষের স্বভাব-চরিত্র-আচার-ব্যবহার বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বহুমাত্রিক পরিচয়কেই কেবল প্রস্ফুটিত করে না, এক মানুষের অন্য মানুষের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসাসহ মানুষের মহৎ-অমহৎ কর্মের ঐতিহাসিকতাকেও শব্দপ্রতীকের ভাষিকাঙ্গে মুদ্রিত করে থাকে। তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কবিসার্বভৌম, কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি, সুভাষ ভট্টাচার্যকে কিশোর কবি, জীবনানন্দ দাশকে রূপসী বাংলার কবি বা শুদ্ধতম কবি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ছন্দের যাদুকর,

জসীমউদ্‌দীনকে পল্লিকবি, জয়নুল আবেদিনকে শিল্পাচার্য, শেখ মজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু, আবুল কাসেম ফজলুল হককে শেরেবাংলা, জাহানারা ইমামকে শহিদজননী, মতিয়া চৌধুরীকে 'অগ্নিকন্যা' বলে ডাকি। ব্যক্তিবিশেষকে এই রকম জনবন্দনার বিপরীতে জননিন্দার প্রকাশরূপে কেউ কেউ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন 'বিশ্ববেহায়া', 'ইয়াবাকন্যা' কিংবা 'বজ্জাৎ হাসান', 'বেকার বাদশা', 'কসাই কাদের মোল্লা' কিংবা 'গো আজম' নামে। এমনকি কোনও এক তিলোত্তমা সুন্দরী যুবতী পাড়ার যুবকদের কাছে হয়ে উঠতে পারেন 'নমিতার মাসি' কিংবা 'নিমকি'।

গ্রামের যে কোনো মানুষের একসঙ্গে দুটি নাম থাকতেই পারে। একটি ভোটার তালিকা বা সরকারি-বেসরকারি কিংবা সামাজিক কোনো কাজেকর্মে কালেভদ্রে অনেকটা দালিলিক-আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের জন্য, এটি নাকি ভালোনাম, যে নামটি হয়তো অতি ঘনিষ্ঠজনও জানে না। কারও কারও ভালো নামের পাশাপাশি আর একটি আটপৌরে নাম থাকে, যেটি নিত্যদিনে যখন তখন ব্যবহারের, সেটি তার ডাকনাম, সমাজের সকলেই এ নামে তাকে চেনে। আরবি নামগুলোর বেলায় একটি সতঃসিদ্ধ বিষয় হল গ্রামের লোকের স্বাভাবিক উচ্চারণে নামটিতে বিকৃতির প্রলেপ পড়বেই, নাম বিকৃত করার প্রতিযোগিতায় তাদের জুড়ি মেলা ভার। বাংলা একাডেমি লোকসংস্কৃতি সমীক্ষা দলের সঙ্গে আলাপচারিতায় দেশবিখ্যাত কদ্দুস বয়াতি সম্পর্কে মাষকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তমিজ উদ্দিন ভূঁইয়ার অনুতাপদগ্ধ মন্তব্য– "...কেন্দুয়ার কদ্দুস বয়াতিকে আপনারা স্বীকৃতি দিয়ে জাতির কাছে পরিচিত করেছেন আর আমরা বলি 'কদ্দুইসা'। এই অবজ্ঞা কেন?" [শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত সমীক্ষা* (কেন্দুয়া অঞ্চল), বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্র. প্র. জুন ১৯৯৩, পৃষ্ঠা : ৪]। প্রকৃতপ্রস্তাবে গ্রামের মানুষের মুখে নামবিকৃতির পেছনে ক্ষেত্রবিশেষে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতা থাকলেও বলতে গেলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোনও অবজ্ঞাসূচক বা হীনতাপ্রকাশক অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করে না। বলা ভালো এটা তাদের বাকভঙ্গির স্বাভাবিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা অনায়াসে সোবহানকে সুবান্যা, বোরহানকে বুর্‌কান, রহমানকে রক্‌মান, রহমতকে রক্‌মত, নিয়ামতকে নিয়ামত্যা, আবুলকে আবুল্যা বা আবদুলকে আবদুল্যা করে তুলবেই, উচ্চারণের শুদ্ধতার ধার তারা ধারতে কখনো অভ্যস্ত নয়, শব্দটি ইংরেজি-বাংলা-আরবি-ফার্সি যে ভাষারই হোক না কেন, তাতে কিছু যায়-আসে না। এ রকম উদাহরণের কোনও লেখাজোখা নেই, তাই বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামান্তরে যত আরবি নাম, উচ্চারণে ততো তার বিকৃতি। ভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলে, স্থানিক ব্যবধানের প্রেক্ষিতে, সে ভাষার শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটে প্রতিনিয়ত। গ্রাম থেকে গ্রামে বা এলাকা থেকে এলাকায় শব্দোচ্চারণভঙ্গির এই তারতম্যের কারণে আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ঘটে। যে কারণে বৈদিক ভাষাকে বদলে যাওয়া থেকে রক্ষাকল্পে সংস্কার করতে হয়েছিল এবং পাণিনি প্রণয়ন করেছিলেন ভাষাশাসনের সংবিধান সংস্কৃত ব্যাকরণ। সংস্কার করা

ভাষাটির নাম হয়েছিল সংস্কৃত। ভাষা প্রতিনিয়ত বদলে যায়, রূপান্তর ঘটে। একটি ভাষায় অন্য একটি ভাষায় প্রবসিত শব্দের উচ্চারণও অবিকৃত থাকে না, বিকৃতি ঘটেই। যেমন ব্রাহ্মণ থেকে বামুন, নিমন্ত্রণ থেকে নেমতন্ন বা কৃষ্ণ থেকে কেষ্ট, কানাই কিংবা কানু হয়ে পড়ে। এই রকম উচ্চারণ বদলে যাওয়ার এন্তার উদাহরণ আছে। যে কোনও ভাষায় প্রবসিত শব্দের উচ্চারণবিকৃতি ঘটে, এটাই ভাষার একটি স্বাভাবিক রীতি। বাংলা অবতার ইংরেজিতে হয়ে গেছে 'আভাটার' (avatar), ইংরেজি ট্যাবল্ (table) বাংলায় হয়ে গেছে টেবিল। এটাই স্বাভাবিক। বাগ্‌রীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন ভাষা-বিশেষজ্ঞ বলেন– "এই বাগ্‌রীতির উপর গড়ে উঠে ছন্দ। বাঙালির ছন্দ বাঙালির বাগ্‌রীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাগ্‌রীতির ক্ষমতা অনেকখানি গভীর এবং প্রায় অপরিবর্তনীয়। আমরা অন্য একটি ভাষার শব্দ গ্রহণ করতে পারি কিন্তু ওই শব্দের যথাযথ উচ্চারণ করতে পারি না। যেমন ধরা যাক 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান'– এতে যে ছন্দ প্রকাশিত হয়েছে, তা বাঙালির স্বাভাবিক বাগ্‌রীতির দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু উড়িয়া ভাষাভাষী কোনো ব্যক্তি এটি পাঠ করলে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-অ টুপুর-অ নদেয়-অ এলো বান-অ' এইভাবে উচ্চারিত হবে ও ছন্দ ভিন্ন পথগামী হবে।" (বাংলা ভাষা গঠনে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভূমিকা, সুহৃদয় ভৌমিক, *বাংলাদেশের হৃদয় হতে*, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা-৩১)। এ কারণে ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের নামের শেষের ঠাকুর 'ঠেগুর' ও মোহাম্মদিয়ান হয়ে পড়েছে 'মহামেডান'। ইংরেজি হস্‌পিটাল্-কে আমরা করে নিয়েছি 'হাসপাতাল'। এমন অনেকানেক উদাহরণ দেয়া সম্ভব।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের জনপ্রিয় দুজন মানুষ সুবর্ণা মুস্তাফা বা শিমুল ইউসুফ। তাঁদের নাম দুটিই বারংবি (বাংলা+আরবি) নাম। মুসলমানদের মধ্যে ইদানিং এমন বারংবি নাম রাখার প্রবণতা বেড়েছে, এমনকি খাঁটি বাংলা নাম রাখার প্রবণতার প্রসারতাও একেবারে পিছিয়ে নেই। আর গ্রামের শিক্ষিত-অর্ধঅশিক্ষিত-অশিক্ষিত সাধারণ মানুষেরা তো বাংলা নাম রাখার ক্ষেত্রে সেই আদি অকৃত্রিম প্রাগৈতিহাসিক কৌমসমাজের বাঙালিই রয়ে গেছেন। তাঁরা নামকরণের ক্ষেত্রে আরবি-ফারসির ধার ধারেন না। নাম রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষেরা আরবি নামের শেষে বাংলা শব্দ তো জুড়ে দেন, এমনকি অনায়াসে ইংরেজি শব্দ বসিয়ে দিতে কোনো দ্বিধায় ভোগেন না। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা একজন কণ্ঠশিল্পী ও ইমদাদুল হক মিলন একজন কথাশিল্পী, দুজনই বর্তমান সময়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে জনপ্রিয়। অথবা কোনো এক দম্পতি মেয়ের নাম প্রসন্নচিত্তে রেখে ফেলেন ফাতেমা বেগম বিউটি অথবা সালমা আক্তার সুইটি। আরবি-ফারসি নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া বন্যা, মিলন প্রভৃতি নাম আরবি-ফারসি-তুর্কি নয়। বন্যা বা মিলন তাই ইসলামি নাম নয়, একবারেই বাংলা নাম, এগুলোর কোনো ধর্মীয় পরিচয় নেই। ইসলামি নাম হতে গেলে প্রথমেই তাকে ভাষার দিক থেকে আরবি হতে

হবে। অন্যথায় আরবি না হলেও আপত্তি নেই তবে ফারসি, তুর্কি অথবা উর্দু হতেই হবে, অর্থ তার যা-ই হোক। একবার এক মহিলার আরবি নামের অর্থ খুঁজতে গিয়ে তার নামের অর্থপ্রাপ্তি ঘটল 'কানির মা'। বাংলাদেশে কারও কারও নাম 'জামাল', আরবিতে এই শব্দটির অর্থ উট। কোথায় যেন পড়েছিলাম 'সেলিম' শব্দটির অর্থ কুকুর, আর 'জনাবা' শব্দের অর্থ বেশ্যা। অথচ আমরা এই 'জনাবা' শব্দটি 'জনাব' শব্দের স্ত্রীবাচক অর্থে বড় বেশি তৃপ্তির সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। আক্কেলগুড়ুম অবস্থা আর কাকে বলে! তবে 'কানির মা'র আরবি প্রতিশব্দটা শুনতে মন্দ কিন্তু লাগে না। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে আরবি জনাব শব্দটির বাংলা করা হয়েছে : দেবপাদ, প্রভু, মহারাজ।

নামকরণের ক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালির বিভাষমুখী এই বিশেষ মানসতার কারণ কী? মুসলমান বাঙালির মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক (কেবল আরবি নয়, অন্যান্য ভাষা ফারসি, তুর্কি, উর্দুসহ) এই ভাষাপ্রীতির মূলে আছে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ধাঁচের মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ, যে সংস্কৃতিকে কোরআন-হাদিসের যৌক্তিক বিচারে ইসলামি সংস্কৃতিরূপে সংজ্ঞায়িত করার কোনও যৌক্তিকতা আছে বলে আদৌ মনে হয় না। ভারতে এই ভিন্ন ধাঁচের সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিন্তক বলেন– "প্রথমত, ভারতে ইসলাম প্রচারে মধ্যপ্রাচ্যের সুফি দরবেশদের একটা গৌণ ভূমিকা ছিল বটে, কিন্তু লোদী, খিলজী এবং চেঙ্গিস খানের বংশধরদের সাম্রাজ্য বিস্তারই ইসলামের প্রসারের যে মুখ্য কারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পাঠান মোগলদের ইসলাম এবং আরবদের ইসলাম ঠিক এক বস্তু ছিল না। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বাগদাদে, ফাতেমীয় খলিফাদের আমলে উত্তর আফ্রিকায় এবং উমাইয়া খলিফাদের আমলে স্পেনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল, ভারতবর্ষে তা কোনোদিন প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। মুসলমান বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের যে অপ্রতিহত প্রভাব ইউরোপীয় রেনেসাঁকে সম্ভাবিত করে তুলেছিল ভারতের মাটিতে সে যুক্তিবাদী জ্ঞানচর্চা একেবারেই শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। খাওয়া-দাওয়া, সংগীতকলা, স্থাপত্যশিল্প, উদ্যান রচনা এবং ইরান, তুর্কিস্তান ইত্যাদি দেশের শাসনপদ্ধতি এবং দরবারি আদব-কায়দা ছাড়া অন্য কিছু ভারতবর্ষ গ্রহণ করেনি।" (আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, এপ্রিল ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৭)। অর্থাৎ ভারতবর্ষ মধ্যপ্রাচ্যের বিজ্ঞানের নির্যাসে কখনও স্নাত হয়নি, বরং যাবতীয় সাংস্কৃতিক ইহলৌকিকতার প্রবল জোয়ারে সয়লাব হয়েছে প্রতিনিয়ত। এ উপমহাদেশের উর্বর মাটিতে ইসলাম-ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা বা পারলৌকিতার শিকড় যতটা-না গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে তার চেয়ে বেশি গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে, মূর্ত নির্দিষ্ট বৈশ্বিক সমাজবাস্তবতায় আদপেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এমন একটি চিন্তার বীজমন্ত্রজ বৃক্ষ 'বিশ্বইসলামি ভ্রাতৃত্ব'-ও রাজনীতিক শিকড় এবং এই অবান্তর চিন্তার একটি বিশেষ উপজনন হল বাঙালি মুসলমানের নামকরণে মধ্যপ্রাচ্যীয় ভাষা

কতিপয়ের 'ইসলামি ভাষা' রূপে তথাকথিত রূপ পরিগ্রহ করা। প্রকারান্তরে এটি একটি ঔপনিবেশিক আক্রমণ। যার ফলে ভারতের সকল মুসলমানের আত্মপরিচয়ের প্রাথমিক নিয়ামক হয়ে ওঠে 'ইসলামি ভাষা'র কোনও না কোনও শব্দ বা ব্যক্তিবিশেষের ইসলামি নাম।

উৎস: গ্রন্থ: বাঙালি মুসলমানের নামায়ন।

[লেখক: প্রাবন্ধিক।]

বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ

সৈয়দ আবুল মকসুদ

মরহুম কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসখানা সম্প্রতি ঢাকা ইন্টারের পাঠ্য হয়েছে আর তাতে কিছু মুসলমানী শব্দের মিশ্রণ আছে। এই বইখানার বিরুদ্ধে কোনো কোনো হিন্দু-পরিচালিত পত্রিকা না-কি আক্রমণ চালিয়েছে। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তো বলতে হবে, বাংলাদেশের একখানা শ্রেষ্ঠ পুস্তকের বিরুদ্ধে অনর্থক আক্রমণ করা হয়েছে। বইখানা বাংলার মুসলমানসমাজের একখানা নিখুঁত ছবি; সে-হিসেবে তাতে কিছু পরিমাণ মুসলমানী শব্দ থাকবে, এ-স্বাভাবিক। এ কথা স্বীকার না করা গোঁড়ামি ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রত্যেক সমাজের আত্মপ্রকাশের কতগুলো ধরন আছে এবং সেগুলো প্রকাশের জন্য কতগুলো বিশিষ্ট শব্দ আছে। সেই শব্দগুলোকে ইডিয়ম বলা যায়। সেই ইডিয়মগুলো বাদ দিলে সমাজের রূপটি ঠিকভাবে ফুটে না এবং সাহিত্যসৃষ্টিও

সার্থক হয় না। কারণ সাহিত্য মানে শুধু ভাব নয় রূপও, এবং রূপ মানে সমাজ বা আধারের রূপ।

একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার নানা আনুষ্ঠানিক দিক আছে এবং সেই দিকগুলোর বিশিষ্ট নাম আছে। সেই বিশিষ্ট নামগুলোর পরিবর্তে যদি একটা সাধারণ নাম ব্যবহার করা যায় তো উদ্দেশ্য সার্থক হয় না পাঠকের কাছে, এক-একটা বিশেষ অবস্থা রূপ ধরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তেমনি নামাজের পরিবর্তে 'প্রার্থনা' রোজার পরিবর্তে 'উপবাস' ঈদের পরিবর্তে 'আনন্দোৎসব' সার্থক প্রয়োগ হবে না। কারণ প্রথমগুলো বিশেষ নাম, পরেরগুলো সাধারণ নাম—ইংরেজি করে বলতে গেলে proper noun ও common noun. রাম বা রহিমের নাম ধরে না ডেকে মানুষ বলে ডাকলে যে-ত্রুটি হয় পূর্বোক্ত বিশেষ ব্যাপারগুলোকে সাধারণ নামে ডাকলে সেই ত্রুটি হবে। এ-সব কথা সপ্তম শ্রেণির ছেলেরাও বুঝবে (অন্তত আমি যে ভাবে বুঝিয়েছি সেভাবে বুঝালে), তবু বিজ্ঞ সম্পাদকগণ কেন যে বোঝেন না, বোঝা মুশকিল। হয় বিদ্বেষপ্রসূত গোঁয়ার্তুমির ফলে তাঁরা সত্য জেনেও তা স্বীকার করেন না, নয় অতিরিক্ত diplomacy চর্চার দরুন তাঁদের ভিতরের সত্যবোধই ক্ষয়ে যাচ্ছে। এ-দুটি কারণের কোন্‌টি যে তাঁরা গ্রহণ করবেন, জানিনে। তবে কোনোটি যে তাঁদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়, তা বলাবাহুল্য।

'আবদুল্লাহ' বইখানা সম্বন্ধে আমি নিজে কোনো রায় না দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও-সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাই উদ্ধৃত করছি। কাজী আবদুল ওদুদের 'নিজাম বক্তৃতা'র সময় তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন : "বুলবুলে তোমার (কাজী আবদুল ওদুদ) সমালোচনা পড়ে আমি বইখানা (আবদুল্লাহ) এনে পড়েছি, এবং পড়ে খুশি হয়েছি। মুসলমানসমাজকে জানার ব্যাপারে বইখানা আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছে। লেখকের চিত্রণ-ক্ষমতা চমৎকার। মাঝে মাঝে আরবি ফার্সি শব্দ আছে; তা ঠিকই আছে। তা না থাকলে মুসলমানসমাজের চিত্র পড়ছি, তা কি করে টের পেতুম? মুসলমানসমাজে যে একটা বিশেষ ইডিয়ম আছে, তা মুসলমানী শব্দের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। মাঝে মাঝে আমিও আরবি-ফার্সি শব্দ-প্রয়োগের বিরুদ্ধে লিখেছি। কিন্তু theory-তে যা-ই বলিনে কেন, বাস্তবে দেখে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করে পারিনে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, মহাপুরুষ অর্থাৎ সত্য ও প্রেম-পরায়ণ মানুষ। নিজের অভিরুচি ও স্বভাবজাত সংস্কারের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যের নিকট নতশির না হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের জীবনে গোঁয়ার্তুমির স্থান স্বল্প; এই জন্যে সত্যের বাহন রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরাও নতশির।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে হিন্দুসমাজের খুদে নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকদের নিয়ে। তাঁদের তো আর সত্য-মিথ্যার বালাই নেই; তাঁদের দেবতা হচ্ছে 'পলিসি' আর

'গুপ্ত অভিসন্ধি'। এই দুই দেবতা ছাড়া অন্য দেবতার পায়ে অর্থাৎ সত্য ও সৌন্দর্য দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেওয়া এঁরা স্রেফ আহমকি মনে করেন। কিন্তু যে দেবতার পূজাই করুন না কেন, দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের উপর এঁদের কথার প্রভাব যথেষ্ট। তাই দেশপ্রেমের তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এঁদের কথার প্রতিবাদ করতে হয়। নইলে এঁদের বাজারে-কথার প্রতিবাদ করবার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। অন্ধজনেও হয়তো আলো দেওয়া যায়। কিন্তু ইচ্ছা করে যাঁরা চোখ 'বুজে' থাকেন, তাঁদের চোখ ফুটাবে কে? অথবা চোখ এত বেশি ফুটেছে যে তাঁদের কাছে সত্য-মিথ্যার ভেদরেখাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাঁদের সত্য-মিথ্যা বুঝাতে যাওয়ার বিড়ম্বনা কে গ্রহণ করবে?

প্রসঙ্গত 'আদাব' সম্বন্ধে বলছি। মুসলমান যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদানের জন্য কয়েকটি নিঃসাম্প্রদায়িক আদব-কায়দা সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলো হিন্দু-মুসলমানের উভয়ের আক্রোশের ফলে লয়প্রাপ্ত হবার পথে। মুসলমানরা এঁদের উপর বিরূপ অনৈসলামিক বলে, আর হিন্দুরা বিরূপ ইসলামিক বলে। দুই দিকের ঘা খেয়ে খেয়ে তাদের বেশির ভাগই চলৎ-শক্তি রহিত-পঙ্গু; শুধু কোনোপ্রকারে টিকে আছে 'আদাব'। তার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলছে। মুসলমান ধর্মনেতাগণ 'আদাবে'র প্রতি খুব প্রসন্ন নয়, কারণ তা ইসলামসম্মত নয়। তাঁদের মতে, ওটা আশীর্বাদহীন শিষ্টাচার, অতএব মুসলমানে মুসলমানে ওটার বিনিময় না হওয়াই ভালো। হিন্দু খুদে নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকগণ মনে করেন ওটা ইসলামি ও অভারতীয়, অতএব ওটার পরিবর্তে ভারতীয় নমস্কারের প্রচলনই ন্যায়সঙ্গত। সাম্প্রতিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফলে হিন্দুসমাজে এই মনোভাব দিন দিন দৃঢ়নিবদ্ধ হচ্ছে। নতুবা পূর্বে দেখেছি—আমাদের ছেলেবেলার কথা বলছি—আমাদের মুরুব্বি ও তাঁদের হিন্দু বন্ধুদের মধ্যে আদাব-বিনিময় হত। কিন্তু হিন্দুসমাজে শিবাজী-জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আদাবের প্রচলন ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু তা যে একেবারে লোপ পেয়েছে, তা নয়। এখনো কোনো কোনো রাজনীতি-অস্পৃষ্ট আত্মভোলা হিন্দু (হিন্দুসমাজের নেতা ও পত্রিকার সম্পাদকের মতে হয়তো সমাজের কুলাঙ্গার, কিন্তু আমার মতে সুন্দর মানুষ) আমাদের আদাব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগই আজকাল নমস্কার করেন, এবং আমরাও প্রতিদানে আদাব দিয়ে জানিয়ে দিই যে, আমরা দুটো ভিন্ন জাতি পাশাপাশি বাস করছি।

হিন্দুরা যে মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার হেতু মুসলিম-বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ তাঁদের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপারে তাঁদের নেতা ও পত্রিকা সম্পাদকগণ সহায়তা করছেন। বিদ্বেষের হাতে ক্রীড়ানক বলে তাঁরা বুঝতে পারছেন না তথাকথিত নেতা ও সম্পাদকগণ তাঁদের মিত্র নন, শত্রু।

নতুবা হিতকামী ছদ্মবেশধারী অনিষ্টকারীদের শায়েস্তা করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হতেন।

আমি যে 'মুসলিম-বিদ্বেষ' কথাটা বলেছি, তা অকারণ নয় : তার যুক্তি-দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে। কিছুদিন আগেও অভিজাত কবি মোহিতলাল মজুমদার ও ছন্দ-সম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিগণ বাংলাকাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরবি-ফার্সি শব্দের মিশাল দিয়ে রচনায় মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে তখন কোনো প্রতিবাদ হয়নি, এবং বর্তমানে বিষ্ণু দে প্রমুখ লেখকগণ যে ইংরেজি শব্দ গ্রিক দেবদেবীর নাম ব্যবহার করে কবিতা লিখছেন, তার বিরুদ্ধেও কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না; দোষ কেবল বেচারী মুসলমান লেখকদের বেলা। আমি হলফ করে বলতে পারি, বাংলাদেশে যদি মুসলমান না থাকত, মুসলমানশাসনের পরে আবার যদি সকলেই হিন্দু হয়ে যেত, তাহলে বাংলা ভাষায় আজ যত পারসেন্ট মুসলমানী শব্দ আছে, তার চেয়ে কিছু কম থাকত না, এবং সেগুলো প্রয়োগ তখন মুসলমানী শব্দ না হয়ে বঙ্গভাষায় অঙ্গীকৃত আরবি-ফারসি শব্দ হয়ে দেখা দিত। শুধু তা-ই নয়, যাঁরা আরবি-ফার্সি মিশ্রিত কবিতা লিখতেন, তাঁরা একটা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে গর্ব অনুভব করতেন এবং তাদের নিয়ে একটা 'স্কুল' বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হত। এখন যে তা হচ্ছে না, তার হেতু মুসলমানরা এদেশে রয়েছে এবং মুসলমানদের হিন্দুরা দেখতে পারেন না– সোজা কথায় মুসলিম-বিদ্বেষ।

(তেমনি, কথাটা এখানে বলে রাখা ভালো, ভারতবর্ষে যদি হিন্দু না থেকে শুধু মুসলমান থাকত তো আমরা সম্প্রদায় হিসেবে বর্তমানের মতো একটা আত্মসচেতন থাকতাম না; আমাদের সমাজে বহু হিন্দু তথা দেশি আচার ঢুকে যেত, আমরা টের পেতাম না এবং এখনকার মতো আপত্তি করতাম না। অর্থাৎ আমরা 'ফুল' মুসলমান না হয়ে 'হাফ' মুসলমান এবং হিন্দুর এপিকগুলো মুসলমান রঙে ঢালাই করে আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদ- করতাম। তা যে হয়নি, অর্থাৎ আমরা যে পাকা মুসলমান হতে চাচ্ছি, তার হেতু ভারতবর্ষে হিন্দুদের অবস্থিতি, অর্থাৎ আমরা পাছে হিন্দু হয়ে যাই এই ভয়। সেজন্য হিন্দুদের আমাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান উচিত।)

সাহিত্য ব্যাপারে মুসলিম-বিদ্বেষের নমুনাটা নয়া নয়; পূর্বেও তা বহুবার পাওয়া গেছে। *প্রবাসী*-র বিবিধ প্রসঙ্গে 'ঢাকাই প্রশ্নের' মারফত একবার তা প্রকাশ পায়। ঢাকা বোর্ডের বাংলা পরীক্ষায় (আইএ, না ম্যাট্রিক ঠিক মনে নেই) একবার কতগুলো মুসলমানী শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গ দিতে বলা হয়েছিল। (শব্দগুলো সাহেব, নবাব, গোলাম এই ধরনের বলে মনে হয়) এই জন্য বিজ্ঞ ও দেশহিতকামী *প্রবাসী* সম্পাদক চটে যান এবং প্রশ্নকর্তাটি মুসলমান, এই মনে করে (কারণ ঢাকায় তখন

দু-একজন মুসলমান বাংলার অধ্যাপক ছিলেন) মন্দোক্তি করেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের দুর্ভাগ্যবশত প্রশ্নকর্তাটি প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্মণ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চারুবাবু তখন যে প্রতিবাদপত্রটি প্রেরণ করেন তা তাঁর মতো প্রেম ও সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিকের উপযুক্ত হয়েছিল। তিনি সম্পাদক মহাশয়কে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন প্রতিপন্ন করেছিলেন, এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতে হলে যে বাংলা ভাষায় অঙ্গীকৃত আরবি-ফার্সি শব্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন, জোরের সাথে এ-মত প্রচার করেছিলেন। পুরাতন *প্রবাসী*'র পাতা ওল্টালে বোধ হয় প্রতিবাদলিপিখানা পাওয়া যাবে। সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায়নিষ্ঠাকে ধন্যবাদ, তিনি চিঠিখানা *প্রবাসী*তে ছাপিয়েছিলেন। না ছাপলে কেউ তাঁকে কিছু বলতে পারতেন না।

যাক, আমরা Jealousy complex-এ জড়িয়ে গেছি, আমাদের ভিতরের সত্যবোধ মন্দীভূত, হয়তো একেবারে তিরোহিত। আমরা যা করি, আমাদের কথা তার প্রতিবাদ করে; আর যা প্রতিবাদ করি, আমাদের কাজ তা সমর্থন করে। দেশের সম্পাদক ও নেতা সকলেই এই জালে জড়িয়ে পড়েছেন— কেউই তা থেকে রক্ষা পাননি।

তাই মুসলমান যখন হিন্দুকে বলে সঙ্কীর্ণ অনুদার; তখন সে গোপনে গোপনে মুসলমানের দোকান বয়কট করে ও অন্যান্য উপায়ে মুসলমানকে জব্দ করে প্রমাণ করে দেয় যে, সে সত্য সত্যই তা-ই, অথচ এদিকে মুসলমানের উক্তির প্রতিবাদ করে বুদ্ধিমান দর্শকের নিকট নিজেকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করে। আর মুসলমানকে যখন বলা হয় গোঁয়ার, ধর্মান্ধ, পরমত-অসহিষ্ণু; তখন লাঠি মেরে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে জানিয়ে দেয় যে, তার প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই, তার বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে সব সত্য।

কথা ও কাজের গরমিলের জন্য আমাদের জীবনে যে দুঃখ সৃষ্টি হচ্ছে তা-ই আমাদের জাতীয় জীবনের tragedy, বুদ্ধিহীনের মতো আমরা এই tragedy বাড়িয়েই চলেছি—তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো পথ বের করছিনে। এই দুঃখসৃষ্টির ব্যাপারে নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকদের দান কম নয়। তাঁরা জাতিকে চালনা করছেন বটে, তবে জীবনের দিকে না মৃত্যুর দিকে, সেটাই প্রশ্ন। হিন্দুসমাজের খুদে-নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকগণ 'পাকিস্তান' আন্দোলনের জন্য মি. জিন্নাহ প্রমুখ মুসলমান নেতাদের আক্রমণ করে থাকেন, এবং তাঁদের প্রতি অভব্য ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত কাজ যে 'পাকিস্তান' আন্দোলনের সমর্থক এবং এক্ষেত্রে তাঁরা যে মিস্টার জিন্নাহ'র পরম মিত্র, এ তাঁরা টের পান না। কারণ টের পেতে হলে যে আত্মবিশ্লেষণ-ক্ষমতার প্রয়োজন, তা থেকে তাঁরা শোচনীয়রূপে বঞ্চিত।

হিন্দুসমাজের নেতা ও পত্রিকা সম্পাদকদের এই মনোভাব নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। সুতরাং মন্দ নেতার খপ্পরে পড়ে আমরা যেন তা অনুকরণ করতে প্রবৃত্ত না হই।

হিন্দুসমাজের এই মনোভাবের তিনটি কারণ সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আমরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারব। নইলে আমরাও চটে-মটে তাঁদের মতো নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করবার উপক্রম করব।

প্রথম কারণ, পরাজিতের প্রতিশোধ-প্রয়াসী আক্রোশ—বহুদিন হিন্দুদের মুসলমানদের অধীন থাকতে হয়েছিল, এ কথা তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই ছলে-বলে মুসলমানদের জব্দ করে কিছুটা আক্রোশ মেটাবার প্রেরণা তাঁদের মজ্জাগত। দ্বিতীয় কারণ, দখলিস্বার্থ-মনোভাব (vested interest), বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা একলা ইংরেজ প্রভুর প্রসাদরূপ উচ্ছিষ্ট ভোগ করেছিলেন, সেখানে এখন শরিক এসে জুটেছে। এটা তাঁদের মনে কাঁটা ফুটছে। তৃতীয় কারণ, আপন সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তাঁরা অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রাখতে চান; তাই তার গায়ে আঘাত পড়লে তাঁদের আঁতে গিয়ে বাজে। আঘাত যে কল্যাণের জন্যও হতে পারে, কারণ তাতে সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়ে সৃষ্টি উদারতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা, এ তাঁরা উপলব্ধি করতে অপারগ। এই ব্যাপারে আঘাতকারীদের দোষও কম নয়; কারণ মোটের উপর স্বার্থান্ধ ও অপ্রেমিক বলে তাঁদের কথায় আঘাতপ্রাপ্তদের চোখ ফোটে না, জিদ বাড়ে। মজার ব্যাপার এই যে, যে-বৈশিষ্ট্যপ্রীতির জন্য মুসলমানরা হিন্দুদের আঘাত করে সে-বৈশিষ্ট্যপ্রীতি মুসলমানদের কম নয়। মুসলমানরা মূর্তিপূজক নয়; কিন্তু বৈশিষ্ট্যের মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের সঙ্গে সমান অগ্রসর।

এই তিনটি মনোভাব মিলে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং তাঁরা ক্ষমার যোগ্য। ভ্রান্তের সঙ্গে ভ্রান্তির প্রতিযোগিতা করে আমরা যেন একটা কা- করে না বসি। মূঢ়তা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে : বর্তমানে হিন্দুদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার যুগ, আর পাওয়ার যুগ মুসলমানদের— ন্যায়ত হোক আর না-ই হোক। হারানোর যুগে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না, এ-ই সাধারণ নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হলে ভালো, না হলে দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু পাওয়ার যুগে আমাদের মাথা ঠিক রাখা চাই, এবং এ কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, যে-অভিযোগ আমরা বারবার হিন্দুদের প্রতি আরোপ করেছি, সে-অভিযোগে যেন আমরা নিজেরা অভিযুক্ত না হই— বোলতা হয়ে মধুকরের দুর্নাম গাওয়ার অপবাদ থেকে যেন আমরা রক্ষা পাই।

হিন্দু-সৃষ্টির ত্রুটিগুলো থেকে আমাদের যথেষ্ট শিখবার আছে। সেগুলো যে বর্জনীয়, অনুকরণীয় বা গ্রহণীয় নয়, এ বোধ আমাদের ভিতরে তীব্রভাবে থাকা চাই। কারণ, মনীষী সাদী বলেছেন; আদব কোত্থেকে শিখেছ? – বে-আদবের কাছ থেকে। কেননা, তাদের যা অসুন্দর ও বর্জনীয় দেখেছি, তা বর্জন করেছি। – মহাপুরুষের বাণী শুধু সভা-সমিতিতে আওড়ানোর জন্য নয়, হৃদয়ে রাখবার জন্য– রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য। সাদী'র এই বাণীটি যেন আমরা জীবনে সার্থক করে তুলি।

ভালো কথা। বাংলাভাষা থেকে আরবি ফার্সি বিতাড়ন-ষড়যন্ত্র আজকের সৃষ্টি নয়। বহুপূর্বেই মিশনারিদের সহায়তায় বাংলা গদ্য সৃষ্টির কালে তার উৎপত্তি। তখন Long প্রভৃতি পাদ্রি আরবি-ফার্সি শব্দ দূর করে বাংলা ভাষাকে শুদ্ধি করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁদের মতলবটা ধরতে পারা তখন হিন্দু নেতাদের সাধ্য হয়নি। তাঁরা সরলভাবে মনে করেছিলেন ওটা হিন্দুপ্রেম ও মুসলিম-বিদ্বেষপ্রসূত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা যে খাঁটি আত্মপ্রেমসঞ্জাত– বহু পূর্বেই দূরদর্শী ইংরেজ দেশের মধ্যে যে সকল আত্মকলহের বীজ উপ্ত করেছিলেন, ওটি যে তাদেরই অন্যতম, এ-সত্যটি হিন্দুনেতাগণ তখনো বুঝতে পারেননি, এখনো বুঝতে পারছেন না।

আমাদের মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সমস্যা রস ও রূপের সমস্যা– শব্দ ও ব্যাকরণের সমস্যা নয়। আরবি-ফার্সি শব্দবহুল হয়েও যদি রচনা রস ও রূপের দিক দিয়ে নিখুঁত হয়, তবে তা সার্থক রচনা, আর সংস্কৃতশব্দবহুল হয়েও যদি তাতে রস ও রূপের দৈন্য থাকে, তবে তা মূল্যহীন। এই মনোভাব নিয়ে সাহিত্য-বিচারে ব্রতী হলে অনেক গোলমালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং সাহিত্যের আসর মল্লভূমিতে পরিণত না হয়ে মিলনভূমিতে পরিণত হবে।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক, সম্পাদক। বার্তা সম্পাদক, বাসস (প্রাক্তন)।]

বাঙালি মুসলমান: কিছু কথা

আ ব দু ল আ উ য়া ল

বাংলাদেশ এখন স্বাধীন একটি দেশ। এই স্বাধীনতা আমাদের জন্য বিশাল এক সুযোগ। স্বাধীনতার কারণে এখন আমরা আনেক কিছু নিজেদের মতো করে করতে পারি। তবে আমরা কতটুকু কী করতে পেরেছি এবং পারছি সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো ইতিহাসে পাওয়া যাবে আরও অনেক পরে। সেই অর্জন বা ব্যর্থতার বিচার করার সময় বোধ হয় এখনো আসেনি। দূরবর্তী কোনো ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে বোঝা যাবে একটি স্বাধীন দেশ পাওয়ার পরেও কতটা কী করা সম্ভব হয়েছে।

একথা তো ঠিক, বাঙালি মুসলমানের একসময় স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র ছিল না। মোগল-সুলতান এবং আরও যত বহিরাগত মুসলমান বাংলায় রাজত্ব করে গেছেন তাঁরা আর যাই হোক বাঙালি ছিলেন না। একইসঙ্গে বাঙালি বলতে আমরা কাদেরকে বুঝব সেটিও একটি বড় প্রশ্ন। বাংলাভাষায় ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে খুব বেশি দিন আগে থেকে নয়। মাত্র একশ কি দেড়শ বছর ধরে বাঙালি ইতিহাস লিখতে শুরু করেছে। এবং যারা ইতিহাস লেখক তাদের প্রায় সবাই উচ্চবিত্তের হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিলেন। সে কারণেই হয়তো বাঙালি বলতে তাঁদের চোখে উচ্চবিত্তের হিন্দুরাই কেবল বাঙালি হিসেবে ধরা দিয়েছে। লিখিত সে-সব বাঙালির ইতিহাসে মুসলমানকে যেমন বাঙালি হিসেবে ধরা হয়নি একইভাবে নিম্নবর্গের হিন্দুদেরকেও সেই সব ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়নি। বাঙালি মুসলমানের রয়েছে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মতো গৌরবময় অধ্যায়। এছাড়া আরও নানা চড়াই-উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে এই জনগোষ্ঠী বর্তমান অবস্থানে এসেছে। ফলে ইতিহাসে এদের রয়েছে বিভিন্ন উজ্জ্বল সব অধ্যায়। সুতরাং 'বাঙালি মুসলমান' নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও তার মানবীয় সকল সংগ্রাম ও অর্জন নিয়ে স্বতন্ত্র্য ইতিহাস লেখার আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

উচ্চবিত্তের হিন্দুরা ব্রিটিশদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব ধরনের সুবিধা গ্রহণ করেছিল। সেদিক থেকে বাঙালি মুসলমান ব্রিটিশ-শাসনকে ঘৃণার চোখে দেখে তাদের থেকে বহুকাল দূরে থেকেছিল এমনকি গোঁড়ামির কারণে ইংরেজি ভাষা শেখাকেও তারা ভীষণ খারাপ চোখে দেখে থাকত, সে কারনেও বাঙালি মুসলমান অনেকখানি পেছনে পড়ে গিয়েছিল।

আমার সুযোগ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার। অনেক মুসলিম দেশেও আমি গিয়েছি। বাঙালি মুসলমানদের সাথে সে-সব দেশের মুসলমানদের আচারগত পার্থক্য আমি লক্ষ্য করেছি। যেমন হজ্জের সময় দেখেছি বিভিন্ন দেশের মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নামাজে দাঁড়ান; কেউ নাভির কাছে হাত বাঁধেন, কেউ বুকের কাছে হাত বাঁধেন আবার কেউ হাত না বেঁধে সোজা দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখা গেল, কেউ কেউ মাগরিবের আগে সুন্নত পড়েন যদিও আমরা সুন্নত পড়ি মাগরিবের পরে। এরকম ধর্মীয় আচারের ব্যাপারে বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। যেমন নাভির কাছে হাত বাঁধার পক্ষে একটি যুক্তি হল, আমাদের সমাজে এখন যেমন লুঙ্গি পড়ার প্রচলন রয়েছে একইভাবে সে-আমলেও মক্কায় লুঙ্গি পড়ার প্রচলন ছিল। এর কারণ হল, সে-সময় নামাজে দাঁড়ালে কাফেররা পেছন থেকে এসে টান দিয়ে লুঙ্গি খুলে ফেলত; যাতে টান মেরে লুঙ্গি খুলে ফেলতে না পারে সে-কারণে নাভির কাছে লুঙ্গির গিঁট বরাবর হাত বাঁধা হত। আবার যেমন কোরআন তেলোয়াতের সময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ তেলোয়াতের মাঝে আমীন বলে। এখন কথা হল আমীন বললে তো চুপ থাকা হল না!

আমরা যদি বাঙালি মুসলমানের সততা নিয়ে কথা বলি- যেমন কথা দিয়ে কথা রাখা, দুর্নীতি না করা– এগুলোর দিক দিয়ে অন্য মুসলিম দেশের মানুষের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের তুলনা করি, তাহলে আমার মনে হয় পৃথিবীতে এত দুর্বল দেশ আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জীবনে সৎ হতে হবে– এমন করে আমরা যেন ভাবতেই ভুলে গেছি। আর কথা দিয়ে কথা রাখাকে এরা যেন মনে করে, সেটি আবার কী জিনিস! আসলে কথা না- রাখাই যেন আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। এবং সবচেয়ে ভয়ংকর দিকটি হল, দুর্নীতি না করলে যেন আমরা ধ্বংসই হয়ে যাব এমন একটা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কাজেই সমাজে যে যত বেশি দুর্নীতি করবে তার জন্য যেন ততোই মঙ্গল! আমি বলব বিশেষ করে দুর্নীতি বিষয়টি আমাদের দুর্বল রাষ্ট্র পরিচালনারই পরিচায়ক।

আমরা একটি রাষ্ট্র অর্জন করেছি বটে কিন্তু সেটি পরিচালনায় আমার ধারণা দক্ষতার পরিচয় দিতে এখনো আমরা পারিনি।

এই যে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়া নারী কর্মীরা নিপীড়নের শিকার হয়ে ফিরে এল, এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটল? কথা হল মুসলমান হলেই তো হবে না– কাজে মুসলমান না হয়ে কেবল নামে মুসলমান হলেই এটা ঘটবার কথা। দেখা যায় সৌদি আরব রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে সে-দেশের নাগরিকদের অনেক কিছু মানাতে বা করাতে হয়তো পারছে কিন্তু ধর্ম তো শুধু ফরমান দিয়ে হওয়ার বিষয় নয়– ধর্ম তো আসলে মনের ব্যাপার।

অতীতে বাংলা শাসন করেছে যে মোগল, সুলতান তথা বহিরাগত মুসলমান শাসকেরা– সেখানেও নারীকে তারা যেভাবে দেখেছেন এবং রেখেছেন, ইসলামে সেভাবে নারীকে দেখা বা রাখার কথা বলা নেই! সুতরাং যত বড় মুসলিম সাম্রাজ্যই হোক না কেন, সেখানে প্রকৃত ইসলাম না থাকলে তার ভেতর থেকে নিপীড়নমূলক কিছু যে ঘটতে পারে, সেটি স্বাভাবিক।

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর প্রায় দেড় শত বছর পরে ৮শ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথম মুসলমানরা আসেন বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের জন্য। ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন মূলত পীর-আউলিয়ারা। আমার ধারণা, এই পীর-আউলিয়ারাই ইসলামের মূল কাজটা করে গেছেন। ১২শ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি প্রথম মুসলিম শাসক বাংলায় রাজনৈতিকভাবে প্রবেশ করেন। এবং অবাঙালি মুসলমান হিসেবে খলজির আগমনের ভেতর দিয়ে বাংলায় মুসলমানদের প্রথম শাসন কায়েম হয়েছিল। সেই মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে শেষ নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতনের মধ্যদিয়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এর পর প্রায় ২০০ বছর ইংরেজ শাসন এবং ২৪ বছর পাকিস্তানের শাসনের পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালি মুসলমান প্রথম একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনভার অর্জন করেন।

আমার কাছে মনে হয়েছে বাঙালি মুসলমানরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের তুলনায় ধর্মভীরু। এবং পীর বা ওলি-আউলিয়াদের ওপর এদের দুর্বলতা বা আস্থা অনেক বেশি। যার কারণও আছে। কারণটা হল, এই অঞ্চলে পীর-আউলিয়ারাই প্রথম ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন।

এবং এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে পীর-আউলিয়ারা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষারও প্রমাণ দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে যে মুসলমানরা এখানে রাজনৈতিক কারণে বা দখলের মধ্য দিয়ে এসেছেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার ছিল না; তারা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং তারা এক ধরনের বিলাসী জীবন-যাপনও করতেন। সে কারণেই এ অঞ্চলের মুসলমানরা পীর-আউলিয়াদের প্রতি অন্যান্য দেশের মুসলমানদের তুলনায় বেশি শ্রদ্ধাশীল। ধরা যাক, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, খান জাহান আলী, মখদুম শাহ, শাহ জালাল, শাহ পরাণ– এরকম অনেক পীর-আউলিয়াদের নাম নেয়া যায়– যারা এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে এক ধরনের স্থায়ী জায়গা করে আছেন।

[লেখক: পুরকৌশলী। প্রবন্ধ-নিবন্ধকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লি.]

তৎকালীন পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের রোকেয়া
আজকের নারী-আদর্শের সৈনিক

ফে র দৌ সী সু ল তা না

ছেলেবেলায় আষাঢ়ে শ্রাবণে চারদিক আঁধার করে যখন বৃষ্টি পড়ত, থামার কোনো লক্ষণই নেই, অবিরাম ঝরছে তো ঝরছেই... কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক কাজ থেমে থাকত না, স্কুলে যেতে হবে, কিন্তু কাঁথার নিচ থেকে যে উঠতেই ইচ্ছে করত না, তখন অনেক বিরক্ত লাগত। মনে হত, কী দরকার ছিল বেগম রোকেয়ার নারীজাগরণের ডাক দেয়ার, নারীশিক্ষার জন্য অন্দোলন করার? অথবা যখন চৈত্রের খরতাপে গায়ে লাগত আগুনের হলকা তখনও একই অনুভূতি কাজ করত মনে। শুধু আমি না, আমার সমবয়সী অনেক বালিকাই রসিকতা করে বা প্রকৃতির বৈরীতা রোধে কোনো উপায় না দেখে বেগম রোকেয়ার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতাম। কারণ, ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ে বাংলা পাঠে বেগম রোকেয়া সম্পর্কে একটি নিবন্ধ আমাদের সবার পড়া হয়ে গেছে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পর্দাপ্রথার কারণে বিদ্যালয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর বড় ভাই সাবের এবং পরবর্তীকালে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের অনুপ্রেরণায় তিনি লেখাপড়া শেখেন। এই বিদুষী নারী পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে এবং নারীশিক্ষার জন্য কাজ করে গেছেন— লেখাটি ছিল এ-জাতীয়, যা কখনোই আমাদের মন ছুঁয়ে যায়নি। অথবা লেখার অন্তর্নিহিত ভাবগাম্ভীর্য বুঝতেই আমরা ব্যর্থ হয়েছি। পর্দাপ্রথা বলতে বুঝেছি বোরখা পড়া ইত্যাদি। যখন বড় হতে থাকলাম, নারী-পুরুষের বৈষম্য, নারীদের ওপর সামাজিক বিধিনিষেধের খড়গ নেমে আসতে দেখে চিত্ত বড়ই অস্থির হত। কখনো কখনো ক্রোধান্ধ হয়ে গিয়েছি। নারীদের পক্ষে, নারীর বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কখনো নারীবাদী হিসেবে উপহাসের পাত্রীও হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার পর চাকরিজীবনেও অনেক অসম প্রতিযোগিতা বা মহিলাদের প্রতি অন্যায় আচরণ দেখে মনে হত এ কোন জগৎ!

এই সময়ে, এই পরিণত বয়সে, মনের মধ্যে যখন রোষানল, দ্রোহ, তখন এই সামাজিক অসঙ্গতির মূলে যাওয়ার তাগিদে নতুন করে অধ্যয়ন শুরু করলাম। বাংলার সমাজব্যবস্থা, বাঙালির আচার-আচরণ, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে গিয়ে বাঙালি নারীদের অবস্থানের যে চিত্র উঠে এল তা জেনে আমি বিবশ হয়ে গেলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসহ ভারতবর্ষের মহিলাদের জন্য ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিভীষিকাময় বিচ্ছিন্ন জগৎ। মহিলারা এসময় অবজ্ঞায়-অবহেলায় এক মানবেতর জীবন যাপন করছিল।

বেগম রোকেয়ার রচনাবলিতে এসময়কার বাস্তব ঘটনাবলি খুব নির্মোহভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। বিশেষ করে *অবরোধবাসিনী* আমার স্নায়ুকে এবং চিন্তাধারাকে বিকলাঙ্গ করে দিল। তিনি পর্দাপ্রথার ভয়াবহ চিত্র *অবরোধবাসিনী*তে তুলে ধরেছেন সেলুলয়েডের পর্দায় যেমন জীবনের কাহিনী ফুটে ওঠে তেমনিভাবে। *অবরোধ-বাসিনী*র কয়েকটি অধ্যায় আলোচনার সুবিধার্থে তুলে ধরা হল। তার আগে *অবরোধ- বাসিনী*র ভূমিকায় বেগম রোকেয়া কী বলেছেন তা তুলে ধরলাম।

অবরোধবাসিনী

আমরা বহু কাল হইতে অবরোধ থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের— বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?"— সে কি উত্তর দিবে?

এস্থলে আমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদেরকে উপহার দিব— আশা করি, তাহাদের ভাল লাগিবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরাণী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না।

বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দ্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যতবেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ।

শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম ত মেম—সাড়ী পরিহিতা খ্রীষ্টান বা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।

এখন আমি *অবরোধবাসিনী* থেকে নির্বাচিত কয়েকটি অধ্যায় তুলে ধরছি।

অবরোধবাসিনী ১

১। সে অনেক দিনের কথা— রংপুর জিলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমীদার বাড়ীতে বেলা আন্দাজ ১টা-২টার সময় জমীদার-কন্যাগণ জোহরের নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। সকলের ওজু শেষ হইয়াছে কেবল "ধা" খাতুন নাম্নী সাহেবজাদী তখনও আঙ্গিনায় ওজু করিতেছিলেন। আলতার মা বদনা হাতে তাঁহাকে ওজুর জন্য পানি ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় এক মস্ত লম্বাচৌড়া কাবুলী স্ত্রীলোক আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত! হায়, হায়, সে কি বিপদ! আলতার মা'র হাত হইতে বদনা পড়িয়া গেল— সে চেঁচাইতে লাগিল- "আউ আউ! মরদটা কেন আইল" সে স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "হেঁ মরদানা! হাম্ মরদানা হায়?" সেইটুকু শুনিয়াই "আ" সাহেবজাদী প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার চাচীআম্মার নিকট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "চাচী আম্মা! পায়জামা পরা একটা মেয়েমানুষ আসিয়াছে!!" কর্ত্রী সাহেবা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমাকে দেখিয়াছে?" "আ" সরোদনে বলিলেন "হাঁ"! আপর মেয়েরা নামাজ ভাঙ্গিয়া শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন— যাহাতে সে কাবুলী স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ-ভালুকের ভয়েও বোধ হয় অমন কপাট বন্ধ করে না।

'অর্থাৎ যেসব স্ত্রীলোকেরা সেসময় পর্দা না করে কাজ করত তারাও পর্দানশীন মহিলাদের কাছে অস্পৃশ্য ছিল।'

অবরোধবাসিনী ৭

৭। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের জনৈক জমীদারের বাড়ীতে বিবাহ হইতেছিল। অতিথি অভ্যাগতে বাড়ী গম্‌গম্ করিতেছে। খাওয়া দাওয়ায় রাত্রি ২টা বাজিয়া গিয়াছে, এখন সকলের ঘুমাইবার পালা। কিন্তু চোর চোট্টা ত ঘুমাইবে না— এই সুযোগ তাহাদের চুরি করার।

সিঁধ কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একজন চৌকিদার চোরের সাড়া পাইয়া বাড়ীর কর্ত্তাদিগকে সংবাদ দিয়াছে। কর্তারা ছিলেন, পাঁচ-ছয় ভাই। তাঁহারা প্রত্যেকে কুঠার হস্তে সে ঘরটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন চোরের সন্ধানে। চোরকে পাইলে সে-সময় তাঁহারা কুঠার দিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেন। হুঁ— চোরের এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ঘরের ভিতর বিবিরা চোরকে দেখিয়া আরও জড়সড় হইয়া চাদর গায়ে দিয়া শুইলেন, —একেবারে নীরব, যেন নিশ্বাস ফেলিবারও সাহস নাই।

বিশেষতঃ "বেগানা মরদটা" যেন তাঁহাদের নিশ্বাসের শব্দও না শুনে। চোর নিঃশঙ্কচিত্তে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও গহনা পত্র বাহির করিয়া লইল। পরে একে একে প্রত্যেক- হাত পায়ের গহনা খুলিয়া লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিবিরা তাড়াতাড়ি নাক, কান ও গলার অলঙ্কার খুলিয়া শিয়রে রাখিতে লাগিলেন। ইহাতে চোরের বেশ সুবিধাই হইল— সে আর অনর্থক বেগম খানমদের নাক, কান বা গলা স্পর্শ করিবে কেন? সেই ঘরে একটি ছিলেন নূতন বউ— সে বেচারী নাকের নথটী ত খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কানের ঝুমকা প্রভৃতি গহনাগুলি পরস্পরে জড়াইয়া বড় জটীল হইয়া পড়িল— কিছুতেই খোলা গেল না। চোর মহাশয় ভদ্রতার অনুরোধে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করার পর কলম-তারাশ ছুরী দিয়া বউ বিবির উভয় কান কাটিয়া লইয়া গহনার পুঁটলিতে সেই সিঁধ-পথে পলায়ন করিল।

'কান যায় যাক, মান তো থাকলো!'

অবরোধবাসিনী ৮

৮। এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাত বাক্সে পূরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছে। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটী হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নীচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য! কুল-কামিনীর অবরোধ!

'এই ধরনের মৃত্যুকে তখন স্বাগত জানানো হত। এটি যে একটি অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য ঘটনা তা কারো মনেই হত না। কেননা মহিলারা সে সময় মানুষের মর্যাদা পাননি।'

অবরোধবাসিনী ১১

১১। গত ১৯২৪ সনে আমি আরায় গিয়েছিলাম। আমার দুই নাতিনীর বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছিল, সেই বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। নাতিনীদের ডাক নাম মজু ও সবু। বেচারীরা তখন "মাইয়াখানায়" ছিল। কলিকাতায় ত বিবাহের মাত্র ৫/৬ দিন পূর্ব্বে "মাইয়াখানা" নামক বন্দীখানায় মেয়েকে রাখে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে ৬/৭ মাস পর্য্যন্ত এইরূপ নির্জ্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েদের আধমরা করে।

আমি মজু'র জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না— সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। শেষে এক দিন একটা জানালা একটু খুলিয়া দিলাম। দুই মিনিট পরেই এক মাতব্বর বিবি, "দুলহিনকো হাওয়া লাগেগী"

বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলাম। আমি সবুদের জেলখানায় গিয়া মোটেই বসিতে পারিতাম না। কিন্তু সে বেচারী ছয় মাস হইতে সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে সবু'র হিষ্টিরিয়া রোগ হইয়া গেল। এইরূপে আমাদের অবরোধে বাস করিতে অভ্যস্ত করা হয়।

'সে সময় মহিলারাও এরকম কারাবাসে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তারা মানুষ, তাদেরও এই পৃথিবীর আলো হাওয়া ভোগ করার অধিকার রয়েছে একথা তারা ভুলেই গিয়েছিলেন।'

অবরোধবাসিনী ১৪

১৪। প্রায় ২১/২২ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। আমার দূর-সম্পর্কীয়া এক মামীশাশুড়ী ভাগলপুল হইতে পাটনা যাইতেছিলেন; সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা ছিল। কিউল ষ্টেশনে ট্রেণ বদল করিতে হয়। মামানী সাহেবা অপর ট্রেণে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকা- বোরকায় জড়াইয়া ট্রেণ ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। ষ্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরাণী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরাণী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল— "খবরদার! কেহ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিও না।" সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেণ ছাড়িয়া দিল!

ট্রেণের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ভিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন, —কোথায় তাঁহার "বোরকা" —আর কোথায় তিনি! ষ্টেশন ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষক ব্যাপার দেখিল, —কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল; তাঁহার চাকরাণী প্রাণপণে বিনাইয়া কাঁদিল, আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় ১১ (এগার) ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন! কি ভীষণ মৃত্যু!

'এরকম বীভৎস ঘটনা সেসময় হরহামেশাই ঘটত। কেননা আগে পর্দা তারপরে জীবন। যদি পর্দাই না থাকল তাহলে এ জীবনই তো বৃথা। সুতরাং পর্দা থাকল আর জীবন গেল।'

অবরোধবাসিনী ১৮

১৮। লাহোরের জনৈক ভুক্তভোগী ডাক্তার সাহেবের রোগিনী দর্শনের বর্ণনা এই:

সচরাচর ডাক্তার আসিলে দুইজন চাকরাণী রোগিণীর পালঙ্কের শিয়রে ও পায়ের দিকে একটা মোটা বড় দোলাই ধরিয়া দাঁড়ায়। ডাক্তার সেই দোলাইয়ের একটু ফাঁকের ভিতর হাত দিয়া রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করেন।*

এক বেগম সাহেবা নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। আমি বলিলাম ফেফড়ার অবস্থা দেখা দরকার; আমি পিঠের দিক হইতে দেখিয়া লইব। হুকুম হইল, "ষ্টেথিসকোপের নল যেখানে বলেন, চাকরাণী রাখিয়া দিবে!" সকলেই জানেন, ফেফড়া বিভিন্ন স্থান হইতে পরীক্ষা করিলে পর রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমি অগত্যা কর্ত্তার হুকুমে রাজী হইলাম। চাকরাণী নলটা দোলাইয়েরা ভিতরে বেগম সাহেবার কোমরে নেফার (পায়জামার উপরাংশের) কিছু উপরে রাখিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে কোন শব্দ শুনিতে পাই না কেন? দুঃসাহসে ভর দিয়া দোলাই একটু উঠাইয়া দেখিলাম, —দেখি কি নলটা কোমরে লাগান হইয়াছে! আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।**

'তবু তো ডাক্তার এসেছিলো! মহিলাদের মর্যাদা দেয়া হয় বলেই তো ডাক্তার ডাকা হয়েছিলো!! বেগানা ডাক্তারকে পর্দা ভেঙ্গে রোগিনী দেখানো তো সম্ভব নয়। তাহলে যে আভিজাত্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়।'

অবরোধবাসিনী ২২

২২। শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফরম ভরা সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোকে ট্রেণের অপেক্ষায় পায়চারী করিতেছিলেন। কিছু দূরে আর একজন দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার পার্শ্বে এক গাদা বিছানা ইত্যাদি ছিল। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করায় উক্ত গাদার উপর বসিতে গেলেন। তিনি বসিবা মাত্র বিছানা নড়িয়া উঠিল—তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেই দ-ায়মান ভদ্রলোক দৌড়িয়া আসিয়া সক্রোধে বলিলেন, —"মশায়, করেন কি? আপনি স্ত্রীলোকদের মাথার উপর বসিতে গেলেন কেন?" বেচারা হতভম্ব হইয়া বলিলেন, "মাফ করিবেন, মশায়! সন্ধ্যার আঁধারে ভালমত দেখিতে পাই নাই, তাই বিছানার গাদা মনে করিয়া বসিয়াছিলাম। বিছানা নড়িয়া উঠায় আমি ভয় পাইয়াছিলাম যে, এ কি ব্যাপার!

'মহিলারা মালপত্রের মতোই ব্যবহৃত হত। সে সময় এরকম ঘটনা একটি স্বাভাবিকচিত্র বৈ আর কিছু নয়।'

অবরোধবাসিনী ২৪

২৪। বেহার অঞ্চলে শরীফ ঘরানার মহিলাগণ সচরাচর রেলপথে ভ্রমণের পথে ট্রেণে উঠেন না। তাঁহাদিগকে বনাতের পর্দ্দা ঢাকা পাল্কীকে পুরিয়া, সেই পাল্কীকে ট্রেণের মালগাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়। ফল কথা, বিবিরা পথের দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা ব্রুকব- চায়ের মত Vacuum টিনে প্যাক হইয়া দেশ ভ্রমণ করেন। কিন্তু এই কলিকাতার এক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবার উহার উপরও টেক্কা

দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীর বিবিদের রেলপথে কোথাও যাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাদের প্রত্যেককে, পাল্কীতে বিছানা পাতিয়া, একটা তালপাতার হাত পাখা, এক কুঁজা পানি এবং একটা গ্লাস সহ বন্ধ করা হয়। পরে সেই পাল্কীগুলি তাঁহাদের পিতা কিম্বা পুত্রের সম্মুখে চাকরেরা যথাক্রমে— (১) বনাতের পর্দ্দা দ্বারা প্যাক করে; (২) তাহার উপর মোম-জমা কাপড় দ্বারা সেলাই করে; (৩) তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে; (৪) তাহার পর বোম্বাই চাদরের দ্বারা সেলাই করে; (৫) অতঃপর সর্ব্বোপরে চট মোড়াই করিয়া সেলাই করে। এই সেলাই ব্যাপার তিন-চারি ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়— আর সেই চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাড়ীর কর্ত্তা ঠায় উপস্থিত থাকিয়া কড়া পাহাড়া দেন। পরে বেহারা ডাকিয়া পাল্কীগুলি বনাতের পর্দ্দা ঢাকা অবস্থায় রাখিয়া চাকরেরা সরিয়া যায়। পরে কর্ত্তা স্বয়ং বন্দিনীদের অজ্ঞান অবস্থায় বাহির করিয়া যথারীতি মাথায় গোলাপজল ও বরফ দিয়া, মুখে চামচ দিয়া পানি দিয়া, চোখে মুখে পানির ছিটা দিয়া বাতাস করিতে থাকেন। দুই ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ের শুশ্রূষার পর বিবিরা সুস্থ হন।

'তবুতো ভ্রমণ!'

অবরোধবাসিনী ২৭

২৭। প্রায় ১০/১১ বৎসরের ঘটনা। বলিয়াছি ত বেহার অঞ্চলে বিবাহের তিন মাস পূর্ব্বে "মাইয়া-খানায়" বন্দী করিয়া মেয়েদের আধমরা করা হয়। ও তখনও ঐ বন্দিশালায় বসিবার মেয়াদ, —যদি বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা হইয়া বিবাহের তারিখ পিছাইয়া যায় তবে—বৎসর কালও হয়; এক বেচারী সেইরূপ ছয়মাস পর্য্যন্ত বন্দিনী ছিল। তাহার স্নান, আহার প্রভৃতির বিষয়েও যথাবিধি যত্ন লওয়া হইত না। একেই ত বেহারী লোকেরা স্নান করিতে চায় না, তাহাতে আবার "মাইয়াখানা"র বন্দিনী মেয়েকে কে ঘন ঘন স্নান করাইবে? ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না— প্রয়োজনমত তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন মাথা গুঁজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়; রাত্রিকালে সেইখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়, অপরে "আবখোয়া" ধরিয়া পানি খাওয়াইয়া দেয়। মাথার চুলে জটা হয়, হউক— সে নিজে মাথা আঁচড়াইতে পাইবে না— ফল কথা, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাহাকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যাহা হউক, ছয় মাস অন্তর সেই মেয়েটীর বিবাহ হইলে দেখা গেল, সর্ব্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটী চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

'নারী তো অসূর্যম্পর্শা। চক্ষু থাকিলে ভালো। না থাকিলে ক্ষতি কী!!'

৩৮। আমার পরিচিতা জনৈকা শি-ডাক্তার মিস শরৎকুমারী মিত্র বলিয়াছেন, "বাবা! আপনাদের—মুসলমানদের বাড়ী গেলে আমাদের যা নাকাল হতে হয়! না পাওয়া যায় সময়মত একটু গরম জল; না পাওয়া যায় একখ- ন্যাকড়া!"

একবার তাঁহাকে বহুদূর হইতে একজন ডাকিতে আসিয়া জানাইল যে বউবেগমের দাঁতে ব্যথা হইয়াছে। তিনি যথাসম্ভব দাঁতের ঔষধ এবং প্রয়োজন বোধ করিলে দাঁত তুলিয়া ফেলিবার জন্য যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখেন, দাঁতের বেদনা নহে, —প্রসব বেদনা! তিনি এখন কি করেন? ভাগলপুর শহর হইতে জমগাঁও চারি ক্রোশ পথ। এত দূর হইতে আবার সেই একই ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব; কারণ ঘোড়া ক্লান্ত হইয়াছে। জমগাঁও শহরতলী, —পাড়া গ্রামের মত স্থান, সেখানে ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা পাল্কী পাওয়া যায় না।

কোন প্রকারে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া তৎকালীন উপযোগী যন্ত্রপাতি লইয়া পুনরায় জমগাঁও যাইতে যাইতে রোগিনীর দফা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। মিস মিত্র সে বাড়ীর কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে অনর্থক ডাকা হইল কেন? উত্তরে কর্ত্রী বলিলেন, "পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারনীকে ডাকিতে হইল, সুতরাং তাহাকে দাঁতে ব্যথা না বলিয়া আর কি বলিতাম? তোবা ছিয়া! মর্দ্দুয়াকে ও কথা বলিতাম কি করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারণী যে, লোকের কথা বুঝেন না।?"

'মহিলা ডাক্তারও তো বেগানা! সে লেখাপড়া শিখেছে, তাই সে বেপর্দা। সে পরপুরুষের সমতুল্য।

যাঁরা *অবরোধবাসিনী* আগে পড়েছেন, তাঁরা মার্জনা করবেন, যাঁরা পড়েননি তাদের জন্যই এই অনুচ্ছেদগুলো উপস্থাপন করা হল।'

এই খ-চিত্রগুলো থেকে আমরা অর্থাৎ ১৮৮০-১৯৩২ সালের মুসলিম বাঙালি মহিলাদের অবস্থান খুব ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। পর্দাপ্রথার ভয়াবহ প্রয়োগে মুসলিম নারীদের নিজস্ব কোনো চিন্তা-চেতনার অবকাশ ছিল না। জড় পদার্থের মতো জীবন নির্বাহ করাই তাদের ভবিতব্য ছিল। এসময়ে হিন্দু সমাজের নারীরা কিন্তু অনেক এগিয়ে ছিলেন— তার প্রমাণ *অবরোধবাসিনী* অধ্যায় ৩৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

বেগম রোকেয়ার পারিবারিক অবস্থান থেকেও সে সময়ের বাঙালি মুসলিম নারীদের দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে। ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। জহিরুদ্দিন আবু আলি হায়দার সাবের ছিলেন তাঁর বাবা। আর মায়ের নাম রাহাতুন্নেছা চৌধুরী। রোকেয়ার পূর্বপুরুষগণ

মোগল রাজত্বকালে সামরিক ও বিচার বিভাগে কর্মরত ছিলেন। রোকেয়ার বাবা আরবি, উর্দু, ফার্সি, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তবে বাড়িতে তিনি উর্দুতে কথা বলতেন। বাংলা ভাষা সাধারণের আর উর্দু অভিজাতদের ভাষা বলে সেসময় অনেকেই মনে করতেন। যাহোক, এরকম একজন আলোকিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নারীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। সমাজের আর সব পুরুষদের মতোই তিনিও এ ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিলেন। আর সবার মতো তিনিও মনে করতেন ঘরের বাইরে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গিয়ে মহিলাদের লেখাপড়া করা উচিত নয়। সাবের সাহেব রোকেয়ার দুই বড় ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবু আসাদ সাবের এবং আবু জায়গম খলিলুর রহমান সাবেরকে লেখাপড়ার জন্য কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠান। কিন্তু রোকেয়া ও তাঁর বড় বোন করিমুন্নেছা বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি পাননি। তবে আশার কথা এই যে, রোকেয়া তাঁর দুই ভাইয়ের আনুকূল্যে ও উৎসাহে ঘরে বসেই বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করতে পেরেছিলেন। রোকেয়ার ভাইবোনেরা তাঁকে শিক্ষার পাশাপাশি লেখালেখি করার জন্যও অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

১৮৯৮ সালে বিহারের ভাগলপুরের উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন রোকেয়া। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াত একজন উদারপন্থী লোক ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষায় শুধু সমর্থনই দেননি, তাঁর স্ত্রী রোকেয়াকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হতেও সাহায্য করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকী এনে রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা মেটাতেও সহায়তা করেছেন। রোকেয়া স্বামীর অনুপ্রেরণার এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে সমৃদ্ধই শুধু হননি, একইসাথে লেখালেখির কাজও শুরু করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রোকেয়ার দাম্পত্যজীবন ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৯০৯ সালের ৩ মে সাখাওয়াত হোসেন মারা যান।

ভাগ্যের কাছে রোকেয়া নতিস্বীকার করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নারীশিক্ষার বিস্তার হলেই কেবল নারী শেকল ভেঙে বেরিয়ে আসবে। শিক্ষার মাধ্যমে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীও হয়ে উঠবে। ১৯০৯ সালের অক্টোবরে কেবলমাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' নামে মুসলমানদের জন্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পারিবারিক কারণে ভাগলপুরে তিনি স্থায়ী হতে না পারার কারণে বিদ্যালয়টি কলকাতায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯১১ সালের ১৬ মার্চ ৮জন ছাত্রী নিয়ে কলকাতার ওয়ালিউল্লাহ লেনে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' পুনঃস্থাপন করেন। পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়টি ১৯১৭ সালে মাধ্যমিক ইংলিশ এবং ১৯৩১ সালে উচ্চমাধ্যমিক ইংলিশ

বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। রোকেয়ার অবিরাম ও অক্লান্ত চেষ্টায় বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বড় পরিসরে কয়েকবার স্কুলটি সরিয়ে নিতে হয়। ১৯৩১ সালে ১৩ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, ১৯৩২ সালে ১৫২ লোয়ার সার্কুলার রোড এবং ১৯৩৮ সালে ১৭ লর্ড সিনহা রোডে কখনো সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে, কখনো কুসংস্কারের বেড়াজাল প্রতিরোধ করে দীর্ঘ ২৪ বছরে নানা সমালোচনার মুখে ছাই দিয়ে অন্যতম ভালো মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে কেবল অবাঙালি মুসলিম বালিকারাই ছাত্রী ছিল। রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে অভিভাবকদের নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাতে থাকেন। তিনি নিশ্চয়তা দেন মেয়েরা কঠিন পর্দার মধ্য দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করবে। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত পরিবারের বরফ গলতে শুরু করে। তিনি ছাত্রীদের জন্য প্রথমে ঘোড়া গাড়ি এবং পরে বাসে পর্দা টানিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। তাঁর স্কুলে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফার্সি ভাষার পাশাপাশি সেলাইশিক্ষা, রান্নাশিক্ষা, গৃহসেবিকা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সংগীত ও শারীরিক চর্চা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল।

রোকেয়া আশেপাশের বিদ্যালয়গুলোতে কিভাবে পড়ানো হয় তা পর্যবেক্ষণে যেতেন এবং সেভাবে নিজের স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণও দিতেন। তৎকালীন সরকারকে ক্রমাগত তাগিদ দেওয়ার ফলে ১৯১৯ সালে মুসলিম শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সরকারি মুসলিম স্কুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

বেগম রোকেয়ার জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা ওই সময়ে ভারতবর্ষে মুসলিম বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করতে পারি। সেকালে মহিলারা এতটাই নির্বোধ এবং জড় পদার্থ ছিলেন যে, তাঁরা পুরুষের সাথে সাথে নিজেরাও ভাবতেন যে, কেবলমাত্র পুরুষ সঙ্গীর মনোরঞ্জন এবং সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্যই তাঁদের জন্ম হয়েছে। এই ধরনের চিন্তা-চেতনা থেকে তাঁদের বের করে এনে নারীশিক্ষার মাধ্যমে তাঁদের শৃংখলমুক্ত করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ ছিল।

বেগম রোকেয়ার নিরলস প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠা নারীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় আজ বাঙালি মুসলিম নারীরা নিজেদের শ্রম ও মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

রোকেয়া শুধু শিক্ষাবিস্তার করে নয়, তাঁর লেখনী দিয়ে সমাজের কুসংস্কার ও কূপমু-কতাকেও ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছিলেন।

বেগম রোকেয়া তাঁর 'মতিচুর' গ্রন্থের 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে মহিলাদের দাসত্ব থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছেন। তিনি অলংকার তথা শৃংখলে জড়িয়ে পুরুষের

বিত্ত-বৈভব প্রচারে অংশ না নিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করতে আহ্বান জানান। শিক্ষার মাধ্যমে দাসত্ব তথা পরাধীনতা ঘুচবে এবং নিজেদের মনোজগৎ ও মেধাকে শাণিত করলে সমাজে পৃথক সত্তা হিসেবে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভব হবে। তিনি 'জাগো ভগিনি জাগো' বলে মহিলাদের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেন।

'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে তিনি নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি তুলে আনেন। পুরুষের সঙ্গী হিসেবে নারীকে যদি শিক্ষিত না করা হয় তবে সমাজে পুরুষেরাও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবে না। সহধর্মিণীকে সমান যোগ্য না করলে এক পর্যায়ে পুরুষ সঙ্গীও একাকী হয়ে পড়ে। কারণ এক পায়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ফলে গোটা সমাজব্যবস্থাটা শ্লথ হয়ে পড়ে।

'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে গৃহকর্মে নিপুণ হওয়ার জন্যও যে শিক্ষার প্রয়োজন একথাটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ঘরসংসারের কাজ হল মূলত ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা, ঘরের সামগ্রীগুলো পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা, পরিমিত ব্যয়ে সংসার চালানো, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পুষ্টিকর খাবার তৈরি এবং তা পরিবেশন করা, সন্তান পরিপালন করা, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের যত্ন নেয়া, সেলাই, বুনন ইত্যাদি কাজ জানা। এর প্রতিটি কাজই সঠিকভাবে করতে গেলে শিক্ষিত নারীর প্রয়োজন। যদি গৃহিণী হিসাব না জানেন তবে তিনি কিভাবে মিতব্যয়ী হবেন, যদি সুষম খাদ্য সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকে তবে কী করে পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করবেন? সন্তান লালনপালনের জন্যও চাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যজ্ঞান। শিশুদের বেড়ে ওঠার সময় তাদের কী ধরনের খাবার প্রয়োজন, তার মানসিক বিকাশে কী রকম আচরণ করা দরকার অথবা শিশুর অসুখে-বিসুখে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং শিশু পরিচর্যা সম্পর্কে সুগৃহিণীকে জানতে হবে বলে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ তিনি খুব কৌশলে নারীর পুরুষ সঙ্গীকে তাকে শিক্ষিত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

এভাবে রোকেয়া তাঁর প্রতিটি লেখায় কখনো তার পুরুষ সঙ্গীকে তার সহধর্মিণীকে যোগ্য করে তোলার আহ্বান জানান, কখনো সরাসরি নারীকেই জেগে ওঠার জন্য ডাক দেন। সমাজ-সংসারে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিও তিনি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেন।

রোকেয়ার ইংরেজিতে লিখিত 'Sultana's Dream'পরে বাংলায় অনুবাদ করা হয় 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে — এতে তিনি স্বপ্ন দেখেন সেই নারীস্থানের যেখানে রাজ্য পরিচালনা করবেন নারীরা এবং পুরুষেরা থাকবে অন্তঃপুরে বন্দি। তারা সন্তান প্রতিপালন করবে এবং গৃহকাজ পরিচালনা করবে। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি পুরুষ পাঠকদের মনোজগতের নিভৃত কোঠায় আঘাত করেছিলেন। অন্তঃপুরের বন্দিদশার ভয়াবহতা যা পুরুষরা নারীদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন তাতে যদি তারা বন্দি হন তা তাদের জন্য কতখানি বিভীষিকাময় হতে পারে তা

অনুভব করানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। একই সাথে শিক্ষিত ও পারদর্শী নারী অর্থনৈতিক কাজে অংশ নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও যে সক্ষম তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

রোকেয়া তাঁর রচনায় নারীদের জেগে ওঠার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাতে থাকেন। একই সঙ্গে পুরুষের সঙ্গিনী হিসেবে শিক্ষিত নারীর প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন। গৃহকর্ম প্রতিপালনে, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে বা পরিবারের কারো রোগশয্যায় নারী সেবিকা হিসেবে কতখানি নির্ভরযোগ্য তা তিনি তাঁর লেখনীতে বার বার তুলে ধরেন।

সামাজিক অবিচার ও অন্যায় এবং অতিরিক্ত দাসপ্রথার প্রভাবে বাঙালি মুসলিম মহিলারা অসহায় এবং অনগ্রসর ছিলেন। রোকেয়া অনুভব করেন নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের মনোভাব পরিবর্তন করা জরুরি। এই মিশনকে সামনে নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীশিক্ষা ও নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কলম ধরেন। সামাজিক বৈষম্য, ধর্মান্ধতা এবং মহিলাদের পক্ষে সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি কখনও কৌতুক করে, কখনও বিদ্রূপ করে, কখনও যুক্তি উপস্থাপন করে লিখে গেছেন। তিনি নবারুণ, নবপ্রভা, সওগাত, মোহাম্মদী, মহিলা, ভারত মহিলা, আল ইসলাম, নওরোজ, মাহে নও, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, দ্য মুসলমান, ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে ক্রমাগত লিখতে থাকেন।

অবরোধবাসিনী, মতিচুর, পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, তাঁর লিখিত 'Sultana's Dream' গদ্য রচনা।

আজ পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্যই এ দিনটিকে প্রতীক হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে তথা বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন যে মহিয়সী নারী তিনি বেগম রোকেয়া। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় মাত্র অর্ধশতকের মধ্যে নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বেড়াজাল ভেঙে নারীরা সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশীদার হয়ে ওঠে।

বেগম রোকেয়া ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সম্মেলনে বলেন, "আমি বিগত ২০ বছর ধরে ভারতবর্ষের সবচাইতে নিকৃষ্ট জীবদের জন্য ক্রন্দন করে যাচ্ছি। আপনারা কি জানেন সেই নিকৃষ্ট জীব কারা? তারা হলেন ভারতবর্ষের নারী...। এদেশে অনেক মানুষই আছেন যারা প্রাণীদের জন্য সহানুভূতিশীল। প্রাণীরক্ষা অধিকার গ্রুপও আছে সব জায়গায়।

যদি কোনো কুকুর মোটরগাড়ির আঘাতে আহত হয় তাহলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজে এবং গণমাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোথাও এমন কেউ নেই, যারা এই উপমহাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের জন্য শোকগ্রস্ত বা সহানুভূতিশীল হন।"

তিনি বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সম্মেলনে যারা ধর্মের নামে নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছেন তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ জানান। তিনি দৃঢ়তার সাথেই উচ্চারণ করেন, ইসলাম কখনোই নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেনি। মুসলমান সমাজের পুরুষেরা নারীকে সমান মর্যাদা না দেয়ায় তিনি ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উদাহরণ টেনে বলেন, আরবে যখন অন্ধকার যুগ বিরাজ করছিল সে সময় কন্যাসন্তান জন্ম হলে তাদের হত্যা করা হত। সেই সময়ে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি কন্যাসন্তান আল্লাহ্তাআলার নিয়ামত বলে উল্লেখ করেন এবং নিজের কন্যাসন্তান ফাতেমা (রা.)-কে আপত্যস্নেহে এবং মর্যাদায় লালন করেন যা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। রোকেয়া বলেন, আমাদেরকেও আমাদের প্রিয় নবীর পথ অনুসরণ করে কন্যাসন্তানকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

রোকেয়ার জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হল, তিনি কেবলমাত্র নারীদের মুক্তির জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েই থেমে থাকেননি, এটি বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য নিজেই সংগ্রামে নেমেছেন। ভারতবর্ষের তথা বঙ্গীয় মুসলিম নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীঅধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি স্ত্রী ও পুরুষের বৈষম্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এই সমাজে অর্ধেক হচ্ছে নারী — আর অর্ধেক পুরুষ। পুরুষেরা শিক্ষায়-দীক্ষায় শৌর্যে-বীর্যে বলশালী হয়ে এগিয়ে গেলে আর নারীরা পশ্চাদপদ থাকলে সে সমাজ কখনও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং নারীকেও পুরুষের মতো শিক্ষার অধিকার দিলে সমান বুদ্ধিমত্তায় ও স্বকীয় পারদর্শিতায় সে-ও তার স্থান করে নেবে পরিবারে ও সমাজে।

১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়া 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনি ইসলাম' বা 'মুসলিম ওম্যান সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। নারীশিক্ষা আন্দোলন, মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং মহিলাদের আইনগত অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় এই প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিষ্ঠান বিপুলসংখ্যক মেয়ের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করত। এছাড়া নিম্নবিত্ত মেয়েদের বিয়ের আয়োজন করা, এতিমদের আশ্রয় দেয়া ও বিধবাদের আর্থিক সহায়তাও এই প্রতিষ্ঠান থেকে করা হত। মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান কিছু ব্যবসায়ও পরিচালনা করত।

বেগম রোকেয়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। তিনি ইংরেজি, বাংলা, উর্দু এবং ফার্সিতে সমান ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি একই সাথে ছিলেন কর্মী, সংগঠক এবং মনস্তাত্ত্বিক।

নারীজাগরণে আর নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদানের ফলেই বাঙালি নারীরা শিক্ষার মুখ দেখেছিলেন। খুব ধীরে ধীরে হলেও অর্গল ভেঙে নারীরা আলোকবর্তিকা হাতে নিয়েছিলেন। এজন্যই বেগম রোকেয়া আজকের নারীর আদর্শের সৈনিক।

[লেখক: শিশু-কিশোর সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। ব্যাংকার (অবসরপ্রাপ্ত)।]

বেগম রোকেয়া

কা ম রু ল হা সা ন সো হা গ

বেগম রোকেয়া তুমি
নারী জাগরনের পরশমনি
ভুলিনি তোমাকে মোরা

বাংলার শত নারী
অন্দরমহলের সীমা ছেড়ে
আজ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া
শত বাঙ্গালী নারী

তুমি মহান নেত্রী
জাগরনের মধ্যমনি তুমি
দেখ শত নারী
সোনার বাংলার কারিগর

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী
দেশ প্রতিরক্ষায় শত নারী
পুলিশ, আমলা, বিচারপতি,
দেশ গড়ার ব্রত নিয়ে
শত নারী তৈরী পোশাক
করেছে এই অর্থনীতি

[লেখক: উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজউক, ঢাকা ।]